KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩০৮/২, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 18/1 18/2 18/4 19/2	Year of Publication : Sep - 1995 Jan - March 1996 Feb - 1997 Oct - 1997 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অবর্ত সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ শীতকালীন সংখ্যা ১৪০৩

বিভাব

প্রধান সম্পাদক ।। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক ।। আরতি সেনগুপ্ত

বিভাব

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বই

নট সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী	গণেশ মুখোপাধ্যায়	৯.০০ টাকা
সফদর হাশমি নাটা সংগ্রহ		১৫.০০ টাকা
ঋষি নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	কুমার রায়	২.০০ টাকা
কলকাতার নাটাচর্চা	রথীন চক্রবর্তী	১০০.০০ টাকা
নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	কুমার রায়	২৩.০০ টাকা
গেরাসিস লিয়েবেদেফ	ডঃ হায়াৎ মামুদ	১৮.০০ টাকা
বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান	ডঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর	৩৫.০০ টাকা
নাটা আকাদেমি পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা		২০.০০ টাকা
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা		৪০.০০ টাকা
নট-নাট্যকার		৮০.০০ টাকা
নির্দেশক: বিজন ভট্টাচার্য		
লেখা: সজল রায় চৌধুরী		
সম্পাদনা: নৃপেন্দ্র সাহা		
নাট্যাচার্য শিশির কুমার	শংকর ভট্টাচার্য	৪০.০০ টাকা
স্টার থিয়েটারের কথা	দেবনারায়ণ গুপ্ত	৮.০০ টাকা
বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯০১-১৯০৯)	শংকর ভট্টাচার্য	৬০.০০ টাকা
শরৎ-সরোজিনী সুরেন্দ্র বিনোদিনী	ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা	৪০.০০ টাকা
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	ডঃ অজিতকুমার ঘোষ	১৫.০০
আশার ছলনে ভুলি (২য় সংস্করণ)	উৎপল দত্ত	৩৫.০০ টাকা
বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯১০-১৯১৯)	শংকর ভট্টাচার্য	৮০.০০ টাকা
সম্পাদনা: অভিজিৎভট্টাচার্য		
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	কিরণ চন্দ্র দত্ত	৮০.০০ টাকা
সম্পাদনা: প্রভাত কুমার দাস		
বাংলার নট-নটী (৪র্থ খণ্ড) সমগ্র	দেবনারায়ণ গুপ্ত	
নীলদর্পন (ইংরেজি) সম্পাদনা-সুধী প্রধান		

প্রাপ্তিস্থান

নাট্য আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথা কেন্দ্র, ১।১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০। টেলিফোন - ২৪৮-৪২১৪
ইউনিভার্সিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
দে বুক এজেন্সি, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার,
১১৮, হেমেন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
শীতকালীন সংখ্যা ১৪০৩ বিংশ বর্ষ

প্রবন্ধ

উন্নয়নের রাজনীতি ও উদারনীতি বিষয়ক প্রস্তাব — ১ — সৌরীন ভট্টাচার্য

অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রমাঁ্যা রলাঁর একটি ব্যক্তিগত চিঠি — ১৩ — চিন্ময় গুহ

পুরাতনী

সে যুগের দাসীদিদিরা — ৩৪ — কল্যাণী দত্ত

গল্প

প্রতীক্ষা — ২৩ — কুররাতুলআইন হায়দার
দাফন — ৩৭ — রঙিলী বিশ্বাস
দুধ সমুদ্দুর — ৬০ — শেখর আহ্‌মেদ
বিয়ের ফাঁদে — ৭৬ — বীরেন্দ্র গুপ্ত
উৎসব — ১০৭ — আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

ক্রোড়পত্র: চিত্রনাট্য

নয়নতারা — ১১৯ — রাজা মিত্র

বিশেষ ক্রোড়পত্র:

চিঠিপত্র — ১৭৩ — সুভাষচন্দ্র বসু

সম্পাদকমণ্ডলী :

পবিত্র সরকার প্রদীপ দাশগুপ্ত চন্দ্রশেখর বসু বন্দনা সান্যাল
দেবীপ্রসাদ মজুমদার সাধন সরকার ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

প্রধান সম্পাদক :

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক :

আরতি সেনগুপ্ত

প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা :

সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলকাতা ৬৮

প্রচ্ছদ :

রনেন আয়ন দত্ত

দাম : কুড়ি টাকা

সডাক : তিরিশ টাকা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা ৬৮ থেকে প্রকাশিত এবং টেকনোপ্রিন্ট, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত।

॥ সম্পাদকীয় ॥

বিভাব সাতষট্টিতম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। গ্রন্থমেলার সময় প্রকাশিত হচ্ছে বলে সংখ্যাটিকে বিশেষ সংখ্যা হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে। গত শারদীয় সংখ্যাটি অনেকেই সংগ্রহ করতে পারেননি বলে ক্ষোভ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। তাদের প্রত্যেকের কাছেই আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। কাগজ প্রকাশের আনুষাঙ্গিক ব্যয় এতই বেড়েছে যে যথেষ্ট প্রচার ও গ্রাহকসংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও যারা গ্রাহক নন তাদের জন্য মুদ্রণসংখ্যা এই মুহূর্তে আমরা আর বাড়াতে পারছি না।

সিনেমার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত আমাদের বিশেষ ফিল্ম সংখ্যাটির চাহিদা এখনো বিপুল। অনেকেই সংখ্যাটি সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। একটি দূতাবাসের জন্য আমরা কিছু কপি আলাদা করে রেখেছিলাম। নানা নিয়ন্ত্রণ-অসাধ্য কারণে তা পাঠানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেই একশো কপি এবারের বইমেলার মাঠে বিক্রি করা হবে। সঙ্গে বিভাবের কিছু কিছু আগের সংখ্যাও পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে বিভাব প্রকাশিত চিত্রনাট্য। শুধু গত শারদীয় সংখ্যাটিই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত।

অন্যান্য সংখ্যার মতো এবারেও আমাদের সাধ্যমত বিভাবকে প্রবন্ধে, গল্পে, ভারতীয় প্যানেরোমার জন্য নির্বাচিত চিত্রনাট্যে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছি।

এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ নেতাজীর জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র। নেতাজীর একটি অপ্রকাশিত চিঠি যা রাশিয়ার কে. জি. বি. দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা, এ সংখ্যার নিঃসন্দেহে এক অমূল্য সংযোজন।

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। বাংলাদেশে এত বড় মাপের লেখক খুব কমই ছিলেন। এ বঙ্গেও তাঁর সমতুল্য লেখক বিরল। যাকে ক্লাসিক্যাল বলি আখতারুজ্জামান ছিলেন তারই সার্থক প্রতিভূ। ইলিয়াসের পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাই। এ সংখ্যায় তাঁর একটি গল্প পুনর্মুদ্রিত হলো।

এবারের জ্ঞানপীঠ পেলেন বিভাবের অত্যন্ত কাছের মানুষ মহাশ্বেতাদি। আমরা দুহাত তুলে তাকে তিন-উল্লাস জানাই। বিভাবে তার একাধিক উল্লেখ-যোগ্য গল্প প্রকাশিত হয়েছে। আমরা লেখিকার দীর্ঘ সৃজনশীল জীবন প্রার্থনা করি।

এ বছর সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন অশোক মিত্র। বক্তব্য ও ভাষার

অপূর্ব মেলবন্ধনে তার প্রতিটি রচনাপাঠ আমাদের কাছে এক মুগ্ধ অভিজ্ঞতা। তাকেও জানাই অভিনন্দন।

আমাদের ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ এখন এক টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। অবশ্য শুধু 'এখন' নয়, যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে স্বাধীনতার পর থেকেই এই দেশ কম বেশি শঙ্কা উদ্রেককারী ঘটনার অবিরত মুখোমুখি হয়ে চলেছি। বোফর্স নিয়ে আমরা সাহকাহন আলোচনা করেছিলাম। এখনতো কোটি টাকার গুণিতকের হিসাব ছাড়া ঘুষের হিসাব রাখাই যাচ্ছে না! এই সব চোর-জোচ্চোরদের যারা নির্বাচন করেছিল তারা, অর্থাৎ তাদের যারা ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেয় সেইসব ভোটদাতারা কোন উচ্ছন্ন মানসিকতার মানুষ! ভাবলে সত্যিই ভয় হয়। আসলে স্বাধীনতা যত পুরানো হচ্ছে ততই আমরা নতুন নতুন অসাধুতায় পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছি। পলিটিক্সের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা যে এখনো রাজনীতিকেই মেনে নিয়েছি তাও কতটা নীতিদর্শী ও যুক্তিযুক্ত, এখন ভাবার সময় এসেছে।

পরিশেষ সমস্ত গ্রাহক, পাঠক, সমালোচক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

সৌরীন ভট্টাচার্য

—

উন্নয়নের রাজনীতি ও উদারনীতি বিষয়ক প্রস্তাব

১

এই প্রস্তাবের দুটি অংশ—এক অংশে উন্নয়নের রাজনীতি নিয়ে কিছু আলোচনা হবে আর অন্য অংশে আমাদের বর্তমান উদারনীতির যে পর্ব চলছে তা নিয়ে কিছু কথা থাকবে। সবটাই হবে খানিকটা সূত্রাকারে, অর্থাৎ আমার প্রতিপাদ্য বা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার বলার কথার যে-ঝোঁক তা যতটা সম্ভব পরিষ্কারভাবে বলার চেষ্টা করব। কিন্তু প্রতিপাদ্য সব জায়গায় হয়তো পুরোপুরি প্রতিপন্ন করে ওঠা যাবে না। এই পদ্ধতির যে আশ্রয় নিচ্ছি সে সম্বন্ধে দুটো কথা বলা দরকার। এক, সব প্রতিপাদ্য প্রতিপন্ন করার মতো মালমশলা যুক্তি তথ্য এসব আমার হাতে সর্বদা মজুত না থাকতে পারে। অনেকেই বলতে পারেন, তাহলে আদৌ প্রতিপাদ্যটা নিয়ে কথা বলার দরকার বা গরজ কী। আমিও এই কথাটা তুলতে চাই। অনেক সময়েই আমরা অনেক ধারণা পোষণ করি, অনেক কথা বলার ঝোঁক নিজেদের মধ্যে তৈরি হয়, অথচ তার যুক্তি তথ্য সব সময়ে আমার সাজানো গোছানো না থাকতে পারে। আমার প্রশ্ন : এরকম অবস্থায় আমরা কী তবে কথা বলা থেকে বিরত থাকব? বস্তুত আমরা কি বিরত থাকি? না কি কথা চলে, অনেক সময়ে তা নিয়ে এলোমেলো তর্কও গড়ে ওঠে, মূল প্রতিপাদ্য থেকে কথা কাটাকাটি করতে করতে অনেক দূরে সরেও যেতে হয় অনেক সময়ে, এসব অভিজ্ঞতা তো সামাজিক মানুষের অনেকেরই আছে। তা বাস্তব পরিস্থিতিটা যদি এই হয়, তাহলে আমাদের পোশাকি আলোচনাতেই বা সে-পদ্ধতি আমরা চালু করতে পারব না কেন? পোশাকি আলোচনা, প্রবন্ধ লেখা, আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার বেলায় যে আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলায় অভ্যস্ত তাতে আমাদের মনের কথা অনেক সময়েই মনে চেপে রাখতে হয়। এতে কার কী লাভ হয় জানিনা। দুই, এরকম পদ্ধতিতে আলোচনায় অন্য লোকের ঢুকে পড়ার সম্ভাবনাও বেশি আর অবকাশও বেশি। সব প্রতিপাদ্যই তো আর আমি নিজে, প্রতিপন্ন করছি না বা করতে পারছি না, কিন্তু বলার ঝোঁকটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। এইবার যাঁরা এই ঝোঁকের সঙ্গে কিছুটা শামিল, তাঁরা নিজেদের হাতে যেসব মালমশলা আছে

সেগুলো সব ব্যবহার করতে পারেন। তাতে প্রতিপাদ্য জোরালো হতে পারে। আর যাঁরা ঐ ঝোঁকের শরিক নন তাঁরাও তাঁদের মতো যুক্তি তথ্য শানাবেন। ফলে এ তরফেও নতুন কোনো কথা আচমকা দেখা দিতেই পারে। আলোচনাটা এগোতে থাকবে এবং তা হয়তো খানিকটা সমৃদ্ধও হবে। মাইক হাতে এক তরফা একজনেই সব কথা বলে যাচ্ছেন, এ পদ্ধতি কি খুব ভালো? আর সেই একজনকেই একের পর এক সব অকাট্য যুক্তি পেশ করতে হবে, এও কি ঠিক প্রত্যাশিত, আর খুব স্বাভাবিক? ফলে যৌথতার একটা মেজাজ তৈরি করতে পারলে বা তৈরি করতে চাইলে এ পদ্ধতি বোধ হয় খানিকটা উপকারী। আর যৌথতার মেজাজ তৈরি করবার কিন্তু খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে কথা তো এখন হবার নয়।

বলেছি বটে যে বর্তমান প্রস্তাবের দুটি অংশ, কিন্তু অংশ দুটিকে আমি আসলে একটাই বক্তব্য হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করব। আমি যেভাবে এগোবার কথা ভাবছি সেটা খোলামেলাভাবে বলে ফেলি। উন্নয়নের রাজনীতি নিয়ে আমি প্রথমে একটা যুক্তি সাজাব। উন্নয়নের প্রশ্নে রাজনীতির প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে এবং কীভাবে, এ কথাটাই প্রথমে বুঝতে চাইব। তারপরে এই রাজনীতি থেকেই, অর্থাৎ রাজনীতির অবকাশ থেকে বিশেষ বিশেষ রাজনীতি উৎসারিত হতে পারে। ভারতীয় অর্থনীতির সাম্প্রতিক পর্বের যে-উদারনীতি তা এইরকমই এক বিশেষ ধাঁচের রাজনীতির ফল। মোটামুটি এই হবে আমার প্রতিপাদ্য। দেখা যাক এই প্রতিপাদ্যে পৌঁছবার দিকে কতটুকু এগোনো যায়।

২

উন্নয়নের প্রসঙ্গে রাজনীতির কোনো অবকাশে পৌঁছতে গেলে প্রথমেই একটা খুব জোরালো ধারণা সরাতে হবে। এই ধারণাটা যেমন সবল তেমনই প্রভাবশালী। দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধারণাটির প্রতিপত্তি বেড়ে উঠেছে। এই ধারণা অনুসারে উন্নয়ন এক সরলরৈখিক প্রত্যয়। উন্নয়ন যেন এমন একটা কিছু যা সোজা পথ বরাবর এগিয়ে চলে, কোথায় গিয়ে পৌঁছতে হবে আর কেমন করে তা স্পষ্ট করে যেন আমাদের জানাই আছে। শুধুমাত্র দেখতে হবে যে মাঝে মাঝে নানারকম উটকো অন্তরায়ের জন্য যেন উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়। অন্তরায় উঠতেই পারে, সে-অন্তরায়কে 'উটকো' বলছি এই কারণে যে বর্তমান ধারণা অনুসারে (যে-ধারণাটাকে সরাবার চেষ্টা করতে হবে বলে বলেছি) ওসব অসুবিধা নিতান্তই বহিরাগত। অর্থাৎ এই সরলরৈখিক উন্নয়ন-ধারণায় উন্নয়ন-প্রক্রিয়া থেকেই অভ্যন্তরীণ চাপে উঠে আসা অন্তরায়ের কথা ঠিক তেমন করে ভাবা হয় না। আর সেই কারণেই এইসব অসুবিধা-অন্তরায় উটকো বলে প্রতীয়মান হয়।

সোজা পথ বরাবর এগিয়ে চলার চিন্তা থেকেই এটা বেরিয়ে আসে যে 'উন্নত' ও 'উন্নয়নশীল' বলে পরিচিত যে-সব দেশ বা সমাজ, তারাও যেন মিছিল করে ঐ একই পথে চলেছে। শুধু কেবল কেউ একটু এগিয়ে আছে আর কেউ একটু পিছিয়ে। যারা আজ পিছিয়ে আছে তারাও যারা আজ এগিয়ে আছে তাদের অনুবর্তী হয়ে একদিন এগিয়ে যাবে। উন্নয়নের নিশানা সবার জন্য একইরকমভাবে ঠিক করাই আছে, সেদিকে কেবল ঠিকমতো এগিয়ে যেতে হবে। এই যে একই লক্ষ্যে সবাই ধাবমান, এই ধারণাটাকে বলছিলাম উন্নয়নের সরলরৈখিক ধারণা। একটা নির্দিষ্ট সরলরেখার ওপরেই যেন সব সাজানো আছে।

ভাবলে দেখা যাবে যে এই সরলরৈখিকতা প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নচিন্তায় এক ধরনের বৈজ্ঞানিকতার ফল। এবং সেই বৈজ্ঞানিকতা বিষয়ে আমাদের সাবধান হবার দরকার আছে। 'বৈজ্ঞানিকতা' শব্দটা নিশ্চয়ই 'বিজ্ঞান' এই শব্দ থেকে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তৈরি করবার বা তৈরি হবার প্রক্রিয়ায় শব্দ তার ব্যবহারে প্রয়োগে অনুষঙ্গে এমন সব জিনিস জড়িয়ে নেয় যে মূল উৎসারবিন্দু থেকে অনেক দূর সরে যায়, অন্তত অনেক সময়েই সেরকম সম্ভাবনা থাকে। 'বৈজ্ঞানিকতা' বিষয়ে এখানে যা বলা হচ্ছে তা কিন্তু 'বিজ্ঞান' বিষয়ে বলা হচ্ছে তা নয়। এই ব্যাপারটা গোড়া থেকে পরিষ্কার না রাখলে বড়োই ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থেকে যাবে। 'বিজ্ঞান' বলে যেটা প্রচলিত তা হল মানুষেরই আচরিত এক কর্মপদ্ধতি। সেই পদ্ধতির নানা উপাদান, নানা উপাদানে গড়ে ওঠে তার এক-একটা অঙ্গ, সেইসব বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট সব অঙ্গসংস্থান, আর সেই অঙ্গসংস্থান দিয়ে চিহ্নিত হয় এক একটা কাঠামো। 'বৈজ্ঞানিকতা' হল 'বিজ্ঞান' নামক প্রচলিত কর্মপদ্ধতি বিষয়ে আমাদের এক বিশেষ মনোভঙ্গি। এই মনোভঙ্গিও সমাজবিকাশের পর্বে পর্বে ইতিহাসের ধাপে ধাপে এক রকমভাবে গড়ে উঠেছে। এই মনোভঙ্গিতে 'বিজ্ঞান' নামের ঐ বিশেষ কর্মপদ্ধতিকে একটা বাড়তি মর্যাদা আরোপ করা হয়, অন্যান্য সব কর্মপদ্ধতির এক নিয়ামক আদর্শ হিসেবে একে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়, 'বৈজ্ঞানিক' কর্মপদ্ধতির এক চরম সিদ্ধির যেন সন্ধান করা হয়। বিজ্ঞানের কাজ আর বিজ্ঞান নিয়ে কাজ, এ দুটোকে যদি আলাদা করে চিনতে পারি, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে 'বৈজ্ঞানিকতা' বিজ্ঞানের কোনো কাজ নয়, বিজ্ঞান নিয়ে কাজ, বিজ্ঞান বিষয়ে এক মনোভঙ্গি।

৩

উন্নয়নচিন্তার বৈজ্ঞানিকতায় নৈতিকতা মূলত নির্বাসিত। নৈতিকতার প্রশ্ন তো ভালো-মন্দের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। কীসে ভালো কীসে মন্দ, কার ভালো কার মন্দ, কার স্বার্থের অনুকূল আর কারই বা স্বার্থের প্রতিকূল, এসব প্রশ্ন তো উন্নয়ন

প্রসঙ্গে বর্জনীয় হতে পারে না। উন্নয়নের ধারা সমাজের সর্বস্তরে যদি সমভাবাপন্ন না হয়, তাহলেই এসব প্রশ্ন উঠবে। এক বিশেষ পন্থার উন্নয়ন সমাজের এক বিশেষ অংশের পক্ষে সুবিধাজনক, আর অন্য আর এক পন্থা আর এক অংশের পক্ষে কল্যাণকর, এ অবস্থা তো একান্ত স্বাভাবিক এবং আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। এক ধরনের উন্নয়নপন্থায় শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে হকার উচ্ছেদ করতে হয়। ঠিক এই বিশেষ উন্নয়নপন্থা হকারদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল নাও হতে পারে। আবার অন্য আর এক রকমের উন্নয়নপন্থা হয়তো সম্ভব যেখানে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করা হবে একেবারে অন্যভাবে। হয়তো সে পথে হকারের স্বার্থ বনাম শিল্পোন্নয়নের স্বার্থ তেমন করে মুখোমুখি সংঘর্ষের পথে এসে দাঁড়াবেই না। এসব জল্পনা থেকে এই কথাটাই বলতে চাই যে উন্নয়নপন্থার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে একধরনের ভালো-মন্দের প্রশ্ন, নৈতিকতার প্রশ্ন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকতার প্রশ্রয়ে আমাদের উন্নয়নচিন্তা এসব প্রশ্নকে তেমন আমল দেয় না। কারণ, ঐ বৈজ্ঞানিকতায় লালিত সংস্কার মনে করে যে নৈতিকতার বিচার বিজ্ঞানের বিচার নয়, বিজ্ঞানের বিচার বর্ণনাত্মক। অর্থাৎ, যা ঘটছে বা ঘটে বা ঘটতে পারে তাকেই নিরাসক্তভাবে বর্ণনা করাই যেন বিজ্ঞানের কাজ। যেন শুধু অমোঘ সূত্রশাসনই বিজ্ঞানের নিয়তি। সূত্রগুলি কোথাও যেন অলক্ষ্যে সাজানো আছে, বিজ্ঞানীর কাজ কেবল নিখুঁতভাবে তাদের তুলে আনা। নৈতিকতার প্রশ্নে বিজ্ঞান যেন কুণ্ঠিত। প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞানের মেজাজের সঙ্গে জড়িত এই কুণ্ঠা। বৈজ্ঞানিকতার আদল যখন গড়ে ওঠে, ঐ কুণ্ঠা তখন সেই আদলে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায়। সমাজবিজ্ঞানে নানা জায়গায় এর জন্য অনেক দাম দিতে হয়।

৪

নৈতিকতা বিষয়ে কুণ্ঠার মেজাজ দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল। ঐ সময়টা ছিল তত্ত্বের জগতে ন্যায়তাত্ত্বিক প্রত্যক্ষবাদের রীতিমতো আধিপত্যের দিন। ভিয়েনা গোষ্ঠীর দার্শনিকদের প্রভাবে একীভূত বিজ্ঞানের প্রকল্প তখন যেভাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল তাতে নৈতিকতার প্রশ্নকে নানা মহল থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। সব বিজ্ঞানকেই একই আদলে গড়ে তোলা সম্ভব, এরকম এক প্রত্যয় থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ঐ প্রকল্পের। আর এই একই আদল সবার ওপরে চাপানোর চেষ্টায় এক ধরনের জুলুমও নিশ্চয়ই ছিল। যে-আদলটা চাপানোর চেষ্টা চলছিল সেটা মূলত প্রকৃতিবিজ্ঞান থেকে পাওয়া। প্রকৃতি-বিজ্ঞানেরও এক বিশেষ অঙ্গ থেকে পাওয়া ঐ আদল। তার মধ্যে মেকানিক্স-এর প্রভাব ছিল খুব প্রবল। বিপুলভাবে কাজ করেছিল নির্ধারণবাদ। বস্তুত ঐ

সময়েরও বিজ্ঞানের নানা কাজে আরো নানা উপাদানের সাক্ষাৎ যে একেবারে মিলছিল না তা হয়তো নয়। ক্রমে ক্রমে আসছিল অনিশ্চয়তার কথা, নির্ধারণ-সম্ভাব্যতার অসুবিধার কথা, এরকম নানা ধারণা। বিজ্ঞানের কাজের স্তরে জীব-বিজ্ঞানকে, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে মূলত মেকানিক্স-প্রভাবিত এক বিজ্ঞানের আদলে গড়ে তোলার একটা চেষ্টা লক্ষণীয় ছিল। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে তার চেয়েও যেটা জরুরি তা হল এই যে, বৈজ্ঞানিকতার স্তরে ঐ নির্ধারণবাদী ধারণা একেবারে গেড়ে বসল। একীভূত বিজ্ঞান প্রকল্পের চেষ্টা থেকে তা আরো অনুপ্রেরণা লাভ করল। ফলে ঐ সময়ের বৈজ্ঞানিকতার যে-মেজাজে অর্থনীতির মতো বিদ্যাচর্চার এক শাখা যেভাবে গড়ে উঠছিল তাতে নৈতিকতার জায়গা প্রায় ছিল না। বিজ্ঞান এসব অন্য উপাদানকে তবু বা যেটুকু প্রশ্রয় দিতে পারত, বৈজ্ঞানিকতা সেটুকুও দিল না।

দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী এই পর্বে উন্নয়নসমস্যা অবশ্য মোটেই মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল না। ইউরোপ-বহির্ভূত দুনিয়া তখনো পর্যন্ত মতাদর্শগত স্তরে কিংবা রাজনীতির স্তরে তেমন করে জানান দিতে শুরু করেনি। এ ব্যাপারটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনা। ঐ পর্যায়ে প্রাক্তন উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতার সূচনা হচ্ছে। ভারতীয় স্বাধীনতা এই পর্বের গোড়ার দিককার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ষাটের দশকে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ অপসারণ শুরু। আর ইউরোপের অবস্থাও এই দ্বিতীয় যুদ্ধ-পরবর্তী পর্বে তেমন সুবিধার নয়। তার তখন যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পালা। ফলে ঠিক উন্নয়নে তো তখন তার মনোযোগ থাকার কথা নয়। কিন্তু উন্নয়নচিন্তা একটু আধটু শুরু হয়েছে সেও ঐ দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে। তাও প্রধানত পূর্ব ইউরোপের সূত্রে। পশ্চিম 'উন্নত', পূর্ব পিছিয়ে পড়া, এই রকমের এক বোধ থেকে উন্নয়নের তত্ত্বচিন্তার শুরু। এই সূত্রপাতও ছিল বেশ সরলরৈখিক এবং বৈজ্ঞানিকতায় আচ্ছন্ন। সোভিয়েত সমস্যাপট পশ্চিমের দৃষ্টিতে কখনোই ঠিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিভাত হয়নি। ঐ অন্তর্বর্তী কালে সোভিয়েত শিবির থেকে যে অন্য ধরনের বিকাশ-প্রকল্প গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল পশ্চিমি উন্নয়নচিন্তা তাকে উন্নয়ন-ক্ষেত্রে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেনি। রাজনীতি সমরনীতি ও কূটনীতির সামগ্রিক লড়াইয়ে পশ্চিমি উন্নয়ন-আদল ছিল শুধু অন্যতম এক অস্ত্র মাত্র। সোভিয়েত শিবিরের বিকল্পও শেষ বিচারে বৈজ্ঞানিকতায় আক্রান্ত ছিল কিনা সে-প্রশ্নও অবান্তর নয়। উন্নয়নচিন্তায় নৈতিকতার সন্ধানে আমরা সোভিয়েত প্রকল্প থেকে হয়তো ঈষৎ ভিন্ন রকমের এক সরলরেখাই পাব।

৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্ব একদিকে উন্নয়ন-সমস্যাপটের পর্ব, অন্যদিকে তীব্র-ভাবে সোভিয়েত শিবিরের সঙ্গে পশ্চিমি দুনিয়ার স্নায়ুযুদ্ধের পর্ব। এই পর্বেই 'স্বাধীনতা' নামক প্রত্যয়ের বিজয়ঘোষণার যুগ। 'স্বাধীনতা'-র জমানা কার্যত পশ্চিমি জমানায় অঙ্গীভূত। মনে রাখতে হবে এই পর্বের অব্যবহিত পূর্বে ইউরোপের সভ্যতা নাৎসিবাদ ও ফাশিবাদের অভিজ্ঞতা টের পেয়েছে। পৃথিবী যেন সবে সেই পর্ব থেকে মুক্তিলাভ করছে। 'স্বাধীনতা'-য় এই উত্তরণের মুহূর্তে তেমন করে খেয়াল থাকেনি যে ঐ মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েতেরও ছিল অগ্রণী ভূমিকা। আস্তে আস্তে প্রত্যয় হিসেবে স্বাধীনতা পশ্চিমি সমাজের চরিত্রলক্ষণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকল। স্বাধীনতা-ভাবনার টানে যে কোনো রকমের সামূহিকতন্ত্রকে সন্দেহের ও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা হল। পশ্চিমি বোধে সোভিয়েততন্ত্রের 'সামূহিকতা' ক্রমশ ধিক্কারযোগ্য হয়ে উঠল। স্বাধীনতার এই ধারণা পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে একাত্ম হবার মুহূর্তে তা 'উন্নত' সমাজের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে গেল। উন্নয়ন-ইতিহাসে পশ্চিমি দুনিয়াই 'উন্নত' হিসেবে যে স্বীকৃতি পেয়ে গেল তা কিন্তু এরই আগে পর্বের কথা। ফলে স্বাধীনতা, উন্নয়ন এসব ধারণায় মেশামেশি হয়ে গেল। আগের পর্ব থেকেই সরলরৈখিক বৈজ্ঞানিকতার একটা আদর্শও স্থির হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে এখন স্বাধীনতার ধারণা মিলে গেল। বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে নৈতিক বিচারে বিকল্প সন্ধান প্রায় অবান্তর হয়ে উঠেছিল। অথচ মজা এই যে 'স্বাধীনতা' তো এক নৈতিক ধারণা বৈ কিছু নয়। এই বৈজ্ঞানিকতার পরিমণ্ডলে 'স্বাধীনতা'ও এক সরলরৈখিক মানে পেয়ে গেল। এবং একমাত্র উন্নয়নের বৈজ্ঞানিকতার আশ্রয়েই তা লাভ করা সম্ভব। অর্থাৎ স্বাধীনতা যদি কাক্ষ কাম্য হয়, তাহলে তাকে এই অবিকল্পসম্ভব এক উন্নয়নপন্থাই মেনে নিতে হবে। এরকমের এক প্রতিজ্ঞা প্রায় প্রতিষ্ঠা করে ফেলা গেল। 'উত্তর অতলান্তিক'-এর মতাদর্শগত গড়নে তা আরো শক্ত জমি পেল। সত্যি বলতে কী বোধের জগতের এই নতুন সঞ্চার ঠিক একেবারে নির্দোষভাবে সাধিত হয়নি। সামরিক জোটের সুরক্ষা এর পেছনে সাস্ত্রীর মতো কাজ করেছিল। উত্তর অতলান্তিক সন্ধি সংগঠন (নাটো) গড়ে তোলার প্রতিক্রিয়ায় এবং ইউরোপ মহাদেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে তার দীর্ঘদিনের কার্যকলাপ ও আনুষঙ্গিক বিপুল ব্যয়ে তবে এই মতাদর্শগত গাঁথুনি গড়ে তুলতে হয়েছিল। মতাদর্শ বিনামূল্যে গজায়নি। বৈজ্ঞানিকতা প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট দাম দিতে হয়েছিল। বস্তুত অধুনা যে মার্কিন অর্থনীতি ঘাটতির চাপে নিদারুণভাবে পীড়িত তার পেছনে এসব ইতিহাসের কি কোনো ভূমিকা নেই? পদ্ধতিও তো সামাজিক অর্জন, ইতিহাসেরই অঙ্গ, একেবারে বিনামূল্যে কি তা পাওয়া যায়?

৬

যুদ্ধোত্তর যে-পর্বে উন্নয়ন-প্রকল্পের এক বিশেষ আদল গড়ে উঠছিল সেই পর্বে অন্য দুটি ধারণাতন্ত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর একটি তন্ত্র কার্ল পপার-এর নামের সঙ্গে জড়িত। এই তন্ত্রের দুটি বিশেষ ধারণার কথা এখানে উল্লেখ করব—সীমারেখার সমস্যা ও মিথ্যাসম্ভাব্যতা। কার্ল পপারের এক জরুরি দায় ছিল 'বিজ্ঞান'-কে 'অবিজ্ঞান' থেকে তফাত করা। আমাদের আলাপ-আলোচনা কথাবার্তার তো নানা ধরন সম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সব রকম কথাবার্তাই কি এক ধরনের? তাই যদি হবে তাহলে বিজ্ঞান বলে যা বুঝি তার কি কোনো বৈশিষ্ট্য নেই? থাকলে সেই বৈশিষ্ট্য কোথায়? কার্ল পপার তার সীমারেখার সমস্যায় এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। সীমারেখা চিহ্নিত করা হচ্ছে মিথ্যাসম্ভাব্যতার ধারণা দিয়ে। বিজ্ঞানের দায়িত্ব হল এমন বাক্য প্রণয়ন করা যা বাস্তব পৃথিবীর নিরিখে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা সম্ভব। তাহলে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কোন বাক্য গ্রহণযোগ্য আর কোন বাক্য বর্জনীয় তার একটা হদিশ মিলে যায়। আর বাক্যটি যদি এমনভাবে প্রণীত হয় যা কোনোদিনই, অর্থাৎ কোনো অবস্থায় মিথ্যা বলে প্রমাণ করা কখনোই সম্ভব হবে না, তাহলে সে-বাক্যের গ্রহণ বর্জনের ওরকম কোনো নৈর্ব্যক্তিক নিরিখ আর সম্ভব হবে না। পপারীয় বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধির দাবিদার। বিজ্ঞানের সীমারেখা সমস্যার এই বিশেষ সমাধানে এক ধরনের স্বাধীনতার অঙ্গীকার পাওয়া যাচ্ছে। এই বিচারে যা অ-বিজ্ঞান তার গ্রহণ বর্জন, কর্তৃত্ব আনুগত্য বিশ্বাস সংস্কার ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, ব্যক্তির স্বাধীনতা এক অর্থে সেখানে সীমাবদ্ধ, ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব অন্তত খণ্ডিত।

অন্য যে-তন্ত্রের কথা ভাবছি তা হল অস্তিত্ববাদ। এই তন্ত্রেরও দুটি ধারণা আমাদের আলোচ্য পর্বে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধারণাদুটি হল 'স্বাধীনতা' ও 'উদ্‌বেগ'। অস্তিত্ববাদী স্বাধীনতা ও উদ্‌বেগের ধারণাতেও প্রবলভাবে ব্যক্তি-মাত্রা বর্তমান। ব্যক্তি কতটা স্বাধীন, সেই স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত উদ্‌বেগের স্বরূপ কী এসব প্রশ্ন এক স্তরে যেমন ব্যক্তির সীমায় আবদ্ধ, অন্য আর এক স্তরে তেমনি এদের সামাজিক-ঐতিহাসিক মাত্রাও লক্ষণীয়। একথা তো ভুললে চলবে না যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাৎসি-পর্ব, ফরাসি দেশের অবরোধ, সামাজিক পীড়ন-শোষণ ও স্বৈরাচারী স্বাধিকারপ্রমত্ততা, এ সবই ছিল ফরাসি মননের অস্তিত্ববাদী পর্বের অনিবার্য ও প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ। এই অনুষঙ্গেই তো এত দূরে বসেও এক বাঙালি কবিকে উদ্‌বেগে উচ্চারণ করতে হয়েছিল 'কবন্ধ ফরাসি দেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কি না, তা সুদ্ধ জানিনা'। লক্ষণীয় যে স্বাধীনতার ধারণা এই দুই তন্ত্রেরই অন্যতম প্রধান প্রত্যয়। তবে পপারীয় ধারণা নৈর্ব্যক্তিকতার মোহে যেন কিছুটা ইতিহাসচ্যুত, আর অস্তিত্ববাদ অনেক অন্তরঙ্গভাবে ইতিহাসে লগ্ন।

৭

কার্ল পপারের স্ববিখ্যাত গ্রন্থ **"দি ওপ্‌ন সোসাইটি অ্যাণ্ড ইট্‌স্ এনিমিজ"** (২ খণ্ড) প্লাতো, হেগেল ও মার্ক্সের তত্ত্বকাঠামোর নিবিষ্ট সমালোচনা। এই সমালোচনার মধ্য থেকে বৃহৎ অঙ্কের সাবিক তত্ত্বকাঠামোর খুব মৌলিক সমালোচন গড়ে উঠছে। এমনিতেই উনিশ শতকী মনীষীর তত্ত্বচিন্তার ব্যাপক বিস্তার বিশ শতকে নানা কারণে সংকীর্ণতর হয়ে আসছিল। এরও ছিল অনেক ঐতিহাসিক সংযোগ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পপারের সমালোচনা এই ধরনের মহাতত্ত্বকাঠামোর গায়ে বড়ো রকমের ধাক্কা দিল। যে প্রক্রিয়ায় আজ ইতিহাসের মহাকাহিনীর নিশ্চিন্ত যাত্রা যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখা হয়, সেই প্রক্রিয়ারই আর এক অঙ্গ মহাতত্ত্বকাঠামোর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকানো। অনেকেরই অনেক ভূমিকা আছে এই প্রক্রিয়ায়, পপারের ভূমিকাও অরণীয়। এই প্রসঙ্গে পপারের 'টুকটাক সামাজিক কারিগরি'র ধারণাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজরূপান্তরের মহাকাহিনী রচনা করা যাবে এই আশ্বাস আজ হয়তো অনেকটা ভেঙে গেছে। কিন্তু পপারের দিনে এ ধারণা তো বেশ বলবৎ ছিল। পপার এই রূপান্তরের মহাকাহিনীর মধ্যে বিপদের লক্ষণ দেখেছিলেন। তাঁর বিচারে এরকমের ব্যাপক বিস্তৃতির বড়ো মাপের কাঠামোর মধ্যে নিহিত আছে পিষ্ট ব্যক্তিসত্তা ও অবরুদ্ধ স্বাধীনতার উপাদান। তাই পপারের পরামর্শ সাবিক রূপান্তরের মোহে নিমগ্ন না থেকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যতটুকু সম্ভব টুকটাক মেরামতের চেষ্টা করে যাওয়া। সংক্ষেপে টুকটাক সামাজিক কারিগরির এই হল মর্মকথা। সন্দেহ নেই মহাকাঠামোর অন্তাচল সূচনায় পপারের বেশ বড়ো রকমের ভূমিকা ছিল।

৮

মহাতন্ত্রের অবসানের টানে মতাদর্শ বিষয়েই সন্দেহ দানা বাঁধল। মতাদর্শকে বিজ্ঞানের বিপরীতে দাঁড় করানো হল। বৈজ্ঞানিকতার মেজাজে ইতিমধ্যেই 'বিজ্ঞান' এক বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এই অবস্থায় যা কিছু সেই বিজ্ঞানের প্রতিস্পর্ধী তার সব কিছুকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হল। ঠিক এই রকম মেজাজেই গড়ে উঠল 'বিজ্ঞান' বনাম অন্যান্য নানা ধারণার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া। 'বিজ্ঞান' বনাম 'ধর্ম'-ও ঠিক এমনি মেজাজের ফসল। এতদূর যে ধর্মস্থানে ডারউইন অস্পৃশ্য। দু-একটি ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম বাদ দিলে এখনও এই অবস্থাই চলছে। আবার 'বিজ্ঞান'-ও অনেক সময়েই 'ধর্ম' বিষয়ে অকারণ অসহিষ্ণুতা পোষণ করে। 'বিজ্ঞান'ই চূড়ান্ত, তা রীতিমতো এক বিশেষ অর্থের বিশেষ জ্ঞান, এই আবহাওয়াতে ঐ বনাম-তালিকায় মতাদর্শও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। যে-কোনো উচ্চারণকে নস্যাৎ করতে গেলে তা যে কোনো-না-

কোনো মতাদর্শস্পৃষ্ট এটুকু প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট। কারণ মতাদর্শ হলে সে তো আর বিজ্ঞানের মর্যাদা দাবি করতে পারে না। বিজ্ঞানের আসন এ সবার ওপরে। বিজ্ঞান থেকে অবিজ্ঞানকে সযত্নে আলাদা করার ফল এইভাবে মিলতে থাকল। রিকার্ডো-মার্ক্সের মূল্যের শ্রমতত্ত্বও একদিন পক্ষপাতদুষ্ট মতাদর্শ এই অভিযোগে আক্রান্ত হয়েছিল। মার্ক্সের শ্রমতত্ত্ব যে মূলত বিজ্ঞান নয়, এক রকমের অধিবিজ্ঞান এ বক্তব্য তো বেশ সাম্প্রতিক কালেরই। যদিও 'বিজ্ঞান' বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই যে খানিকটা বাড়তি লাভ আদায় করা যাবে এরকম ভাবনা যাঁরা লালন করেন তাঁরাও কিন্তু প্রকৃত বিচারে বৈজ্ঞানিকতার সংস্কারে আচ্ছন্ন। তা সে যাই হোক, আপাতত আমার বলার কথাটা এই যে বিজ্ঞানের মর্যাদার চাপে, বিজ্ঞান-অবিজ্ঞানের সীমারেখা বিভাজনের সুযোগে মতাদর্শ দারুণভাবে মার খেল। বিজ্ঞান বনাম মতাদর্শ ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল প্রায় বিদ্যা আর অবিদ্যার অনুরূপ। বিজ্ঞানেরও পেছনে সহযোগী হিসেবে যে মতাদর্শের হাত থাকতে পারে এ কথাটা আর ঠিক তেমন করে তোলাই গেল না। বৈজ্ঞানিকতার চাপে এত সব কাণ্ডকারখানা ঘটে গেল। আর এই সুযোগে আদর্শ হিসেবে মূল্য-নিরপেক্ষতা আসর জাঁকিয়ে বসল। আমাদের উচ্চারণের মধ্যে যেন শুধুই 'বিজ্ঞান'-সমর্থিত তথ্যের ঠাঁই থাকে, মতাদর্শের অপদেবতা যেন তার ওপর ভর না করে।

৯

উন্নয়নের সমস্যাপট এই মূল্য-নিরপেক্ষতার মেজাজের অনুগামী। ফলটা হল এই যে উন্নয়ন-আলোচনায় ঐ 'বৈজ্ঞানিক' প্রকল্প এমন চেপে বসল যাতে করে অন্যান্য নানা সম্ভাবনা একেবারে পেছিয়ে গেল। ইতিহাসের লড়াইতে এরকম জয়-পরাজয় থাকেই। কিন্তু কথাটা পরিষ্কার করে বোধে থাকা দরকার যে ইতিহাসেরই একটা পর্বে বৈজ্ঞানিকতা জিতে গেল এবং অন্যান্য কোনো কোনো সম্ভাবনার ইতিহাস প্রায় অর্থনীতি বিদ্যারই সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও এ যাত্রায় অন্তত এঁটে উঠতে পারল না।

একটা সম্ভাবনা নিয়ে একটু জল্পনা করতে ইচ্ছে করে। জাতির সমৃদ্ধি, ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ তো অর্থনীতির সূচনালগ্ন থেকেই ছিল। ব্যক্তির বস্তুগত বিকাশের এই চিন্তাধারা থেকে যাত্রা শুরু করে অন্তত দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পর্বে অস্তিত্ববাদী স্বাধীনতার ধারণা থেকে কি কোনো সাহায্য নেওয়া যেত না? উন্নয়নের সমস্যাপট কিন্তু ঐ পর্বেই গড়ে উঠছিল। সেই মোড়েই বৈজ্ঞানিকতার আদল থেকে সরে আসবার একটা সুযোগ হয়তো পাওয়া যেত, যদি বিদ্যা হিসেবে অর্থনীতি মানবিকীবিদ্যা সমূহের সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠতা

অনুভব করত। নিখাদ বিজ্ঞানের এক মায়াবী টানে অর্থনীতি চর্চার যে-পর্বে ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য-আইনবিদ্যা প্রমুখ ক্ষেত্র মূলত অবহেলিত হয়ে রইল, উন্নয়ন-অর্থনীতি পদ্ধতিগত অর্থে সেই পর্বের ফসল। ফল দাঁড়াল এই যে প্রকরণগত স্তরের যে-প্রভাব বিজ্ঞান থেকে আত্মস্থ করা হল, বিজ্ঞানের দর্শন-মনন সে-স্তরে মূলত অনুপস্থিত রইল। এই দুর্ঘটনা এড়াতে পারলে অন্তত সময়-সামীপ্যের দৌলতে অস্তিত্ববাদী কোনো কোনো ধারণাকে উন্নয়নের বস্তুগত বিকাশের বয়ানের সঙ্গে হয়তো জুড়ে নেওয়া যেত। তাতে সরলরৈখিকতা থেকে যেমন মুক্তি পাওয়া যেত, তেমনি উন্নয়নের 'ঐতিহাসিকতা'-কেও হয়তো খানিকটা মর্যাদা দেওয়া যেত। প্রসঙ্গ হিসেবে উপনিবেশ-স্থাপন, যুদ্ধবিগ্রহ ও সমাজ-সংবর্ত ইত্যাদি যে উন্নয়ন অর্থনীতিতে উপেক্ষিত রয়ে গেল এতে আমাদের উন্নয়ন-প্রকল্প কি সত্যিই তেমন সমর্থ হয়ে উঠতে পারল? এরকম একটা জায়গায় পৌঁছতে পারলে উন্নয়ন-প্রসঙ্গে রাজনীতির একটা জায়গা খুঁজে বার করা সম্ভব। এরকম একটা জায়গা খুঁজে পেলে উন্নয়নক্ষেত্রে যা ঘটছে খানিকটা যেমন তার হদিশ মেলাতে পারব, তেমনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও সমস্যায় নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করতেও খানিকটা জোর পাব। ক্ষেত্র হিসেবে উন্নয়নকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বেশ বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছিল উন্নয়নের আদিপর্বেই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনেক অভিজ্ঞতা থেকেই এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রচুর উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। ১৯৫০-এর দশক থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাস আলোচনা করলেই এ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি খুলে যেতে পারে। নেহাত উল্লেখ করার জন্য পি এল ৪৮০-র কথাটা একবার এখানে স্মরণ করা যাক। আমাদের খাদ্যের সেই অনটনের দিনে ঐ প্রকল্পের গম-সাহায্য তো নেহাত শুভেচ্ছামণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার ফলাফল কিন্তু নানা অজুহাতে ও অছিলায় আমরা আজও টের পাই।

১০

উন্নয়নের 'রাজনীতি' যে কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়। আমরা যদি বৈজ্ঞানিকতা প্রভাবিত এককেন্দ্রিক ধারণা থেকে খানিকটা মুক্ত হতে পারি, তাহলে দেখব যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত বণ্টন সমস্যারও এক বিলক্ষণ রাজনৈতিক মাত্রা আছে। এক ধাঁচের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দেশের অভ্যন্তরে একচেটিয়া ব্যাবসা ও সংলগ্ন সম্পদ ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতার এমন পুঞ্জীভবন সম্ভব যে সামাজিক অসাম্য তাতে এক দুঃসহ পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। অথচ অর্থ নৈতিক বৃদ্ধির হার এতে করে যথেষ্ট বাড়বাড়ন্ত হতে পারে। আবার অন্য এক ধাঁচের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থ নৈতিক বৃদ্ধিকে খানিকটা শ্লথগতি রেখে অসাম্য ও বৈষম্য হয়তো কিছুটা সহনীয় অবস্থায় রাখা যায়। আর এইসব বিকল্প উন্নয়ন

প্রক্রিয়ার পন্থায় সমাজজীবনের সব কিছুর গায়েই ছোঁয়া লাগে। শিক্ষা সংস্কৃতি খেলাধুলো আমোদপ্রমোদ ও সহজ বিনোদন ইত্যাদি সবের চেহারাতেই এক এক বিকল্পের ছায়া ধরা পড়ে। বস্তুত উন্নয়নের রাজনীতির সঙ্গে বিভিন্ন বিকল্প ভাবনা ও তাদের সিদ্ধি একান্তভাবে জড়িত। বৈজ্ঞানিকতার মোহপুষ্ট সামাজিক সিদ্ধি সরলরৈখিক। সেখান থেকে সরে আসতে পারলে আমরা দেখব যে রাজনীতির বিভিন্ন বয়ানের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সমাজজীবনেরই বিভিন্ন বিন্যাস। কোন বিন্যাস আমি বেছে নিতে চাই তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই তবে সাজাতে হবে আমার রাজনীতি! কাজেই উন্নয়ন প্রশ্নে রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে আমাদের হাতে পড়ে থাকবে শুধুই সরলরৈখিক যান্ত্রিক এক সম্ভাবনা। রাজনীতি-স্পৃষ্ট বিকল্পভাবনায় যে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা তাকে হাতের নাগালে পেয়েও কি আমরা ছেড়ে দেব?

১১

ছেড়ে কিন্তু বস্তুত আমরা দিই না। হয়তো কিছুটা অগোচরে, কিন্তু এক এক রকমের রাজনীতিভাবনা থেকেই আমরা উন্নয়নের এক এক বিকল্প তুলে নিই। নির্বাচনটা যে মূলত রাজনীতিরই স্তরের নির্বাচন এ কথাটা তেমন করে সবসময়ে বুঝতে দিই না, হয়তো নিজেরাও তেমন করে মুখোমুখি হই না। আমাদের সাম্প্রতিক উদারনীতি কিন্তু এরকমই এক রাজনৈতিক নির্বাচন। সমাজজীবনের এক বিন্যাসের বদলে অন্য আর এক রকম বিন্যাসের প্রতি আমার সম্মতি। সমস্ত প্রক্রিয়াটার মধ্যে এক ধরনের অনিবার্যতার একটা আবরণ তৈরি করবার চেষ্টা থাকে। বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে সে চেষ্টা খুব সহজে সফলও হতে পারে। কারণ উন্নয়নচিন্তায় বৈজ্ঞানিকতা মূলত বৈচিত্র্য বর্জন করে চলে। ফলে এক রকমের একটাই ধরন তৈরি হয়ে যায়। সেই ধরনটাই যেহেতু প্রায় একমাত্র তাই সে ধরনটা অনিবার্যও বটে। ইতিহাসের যোগসাজশে ঐ 'অনিবার্য' ধরন শ্রেষ্ঠত্বের দাবিও করে। উদারনীতি আমাদের এখানে আজ এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়েই উপস্থিত। আজ সকলকেই উদারনীতির শিবিরে জড়ো করবার জিগির তোলা হয়েছে। এই জিগিরে 'স্বাধীনতা' এক রণহুঙ্কারের চেহারায় হাজির। আমাদের দেশে অর্থ-নীতিতে এবং সমাজেও রাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন ধরে বড়ো বেশি জায়গা দখল করতে দেওয়া হয়েছে। তাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, বেসরকারি পুঁজি আহত হচ্ছে, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যম নষ্ট হচ্ছে এবং এ সবের মিলিত ফল অর্থ-নীতির রুদ্ধ গতি। সেই গতি ফিরিয়ে আনতে গেলে রাষ্ট্রের হাতকে খাটো করে দিতে হবে, পুঁজিকে প্রশ্রয় দিতে হবে, লগ্নির বন্দোবস্ত সহজ ও ছিমছাম করতে হবে ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় অর্থনীতির উদারনীতি পর্বে প্রবেশ।

অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তার জন্যও চাই পুঁজি ও প্রযুক্তি। তা আসবে আন্তর্জাতিক শিল্পমহল থেকে। তাতে আমাদের কর্মসংস্থানেরও নাকি বৃদ্ধি হবে। শিল্পের প্রসার হলে কর্মসংস্থানের সুরাহা হবে এতো সাবেকি জ্ঞান। সেই সাবেকি জ্ঞানের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে কথাটা তোলা হল। খেয়াল করা হল না যে পুঁজি ও প্রযুক্তির আধুনিকতার সঙ্গে কর্মসংস্থানের বায়না ঠিক খাপ খায় না। খাপ যে খায় না তা আজকের 'উন্নত' পশ্চিমি অর্থ-নীতির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যাবে। এসব কথা অবশ্য মূলত অগোচরেই রইল। কিন্তু নতুন পুঁজি ও প্রযুক্তির টানে আমরা প্রায় রাতারাতি বিশ্বায়নের শামিল হয়ে গেলাম। আমাদের পুণ্য ও পুঁজির সঙ্গে বিশ্বের পণ্য ও পুঁজির মেলামেশা হয়ে গেল। আমাদের মূলধনের বাজার আন্তর্জাতিক মূলধনের বাজারের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। আমাদের শেয়ার বাজারের ওঠানামা এখন অনেকটাই নির্ভর করে বাইরের লগ্নিদারদের আচার আচরণের ওপর। এতে এবং অন্যান্য আরো পাঁচটা ব্যাপারে আমাদের সার্বভৌমত্বে ঘা লাগছে কিনা সে তো এই নতুন হাওয়ার নতুন রাজনীতির বোধের কথা। তেমন প্রয়োজনে সার্বভৌমত্বের সেকেলে ধারণাকে কিছুটা হয়তো ধুয়ে মুছেও নিতে হবে। প্রয়োজনে সবই সম্ভব। আর মানুষের সমাজের কোনোকিছুই তো অমন অনড় নয়। কাজেই কোনো একটা ওরকম নির্দিষ্ট অর্থ আঁকড়ে গোঁ ধরে থাকলেই বা চলবে কেন।

'স্বাধীনতা'র ধারণা এ-পর্বেও জরুরি হয়ে দেখা দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতা। লক্ষ করা চাই যে স্বাধীনতার ধারণার একালেই আরো অনুষঙ্গ আছে। ঐ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসবার যে স্বাধীনতা, সে-প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ শতকের ইতিহাসে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে সোভিয়েত তন্ত্রের ভাঙনের দিনের স্বাধীনতার মুখর শ্লোগান। এই স্বাধীনতার কথা তো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পর্বেও পেয়েছিলাম একবার। তখন ছিল ফাশিবাদের আতঙ্ক থেকে মুক্তির স্বাধীনতা। লক্ষ করা দরকার দুই পর্বের স্বাধীনতার মুখভঙ্গিতে কী বিরাট তফাত। তখন তা ছিল আতঙ্কগ্রস্ত, রক্ষাকবচের সন্ধানে ব্যস্ত, আর আজ তা রীতিমতো মারমুখি, স্বাধীনতার নামে নতুন নতুন জমি দখলে মত্ত। আজকের উদারনীতি তো এই স্বাধীনতার সহযোদ্ধা।

চিন্ময় গুহ

—

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রম্যাঁ রলাঁর একটি ব্যক্তিগত চিঠি

[শতাব্দী শেষ হয়ে এল। সত্তর বছর আগে কালিদাস নাগকে (১৮৯১-১৯৬৬) লেখা রম্যাঁ রলাঁর (১৮৬৬-১৯৪৪) এই 'একান্ত গোপনীয়' ('tout à fait confidentielle') চিঠিটি এবার বাংলায় প্রকাশ করা যেতে পারে। এই চিঠি রলাঁর আগে অনেক চিঠির সঙ্গে আয়ত্ব্য আগলে রেখেছিলেন কালিদাস। এই অপ্রকাশিত পত্রাবলি ইংরেজিতেও প্রথম প্রকাশিত হয়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে, যার নাম *The Tower and the Sea* (প্যাপিরাস, ১৯৯৬)।

এই চিঠির পশ্চাৎপটে ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের বিতর্কিত ইতালি-ভ্রমণ, যার অব্যবহিত পরেই সুইজারল্যাণ্ডের ভিলন্যভে গিয়ে পাশ্চাত্যে যাঁর সঙ্গে তাঁর 'মনের মিল সবচেয়ে বেশি' সেই রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে দেখা করলেন রবীন্দ্রনাথ। আগে কথা দিয়েও আসা হয়নি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে দেখা হল…

এই বহুস্তর চিঠিটি পড়তে পড়তে আমরা দেখব কী করে রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার চেষ্টা করছেন, ফলে এখানে ফুটে উঠছে আশ্চর্য কিছু মাত্রা। কঠোর যুক্তিনির্ভর নৈর্ব্যক্তিকতা ও শ্রদ্ধার সহাবস্থান তো আজও আমাদের অচেনা। এর তথ্য নির্যাসটুকু হয়তো আমাদের জানা হয়ে গেছে, 'ভারতবর্ষ' ডায়েরিতেও তো রয়েছে একথা। তবু বন্ধুকে লেখা এ চিঠির মূল্য একেবারেই আলাদা; রলাঁ যেমন বলেছেন, 'কিছু কিছু কথা তো কেবল দুজন মানুষের মধ্যেই বলা যায়!']

ভিলন্যভ (ভো), ভিলা অলগা,[১]
সোমবার ৫ই ও বুধবার ৭ই জুলাই ১৯২৬

প্রিয় বন্ধু,

গতকাল বিকেল পাঁচটায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে জুরিখ (২ দিন) ও ভিয়েনা রওনা হয়ে গেছেন। প্রায় দু সপ্তাহের মতো তাঁর সঙ্গলাভের আনন্দ পেয়েছিলাম আমরা।[২] এক দীর্ঘ ও কষ্টকর যাত্রায় তাঁকে রওনা হয়ে যেতে দেখে

পত্রটি মূল ফরাসী থেকে অনূদিত

—যা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে না জানি কতটা ক্ষতিকারক হতে চলেছে—আমাদের মন ভারাক্রান্ত।

মঙ্গলবার ২২শে জুন তিনি যখন তুরিণ থেকে এসে পৌঁছলেন, ভীষণ অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে। তিনি বদলে গেছেন মনে হচ্ছিল। ইতালিতে তাঁকে ব্যবহার করা হয়েছিল (সবার্থে : পরে বলছি কীভাবে তাঁকে ব্যবহার করা হয়েছে)। তাঁর হৃদয় ক্লান্ত, কথা বলতে পারছিলেন না, বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু আমাদের এই ছোট্ট দেশ সুইজারল্যাণ্ডের শান্তির আবহ, প্রায় জনশূন্য গ্র্যাণ্ড হোটেল, জানলা পর্যন্ত ছড়ানো সমুদ্রের মতো হ্রদটি···এসব তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলল। গোড়ার কটা দিন তিনি নৈঃশব্দ্য আর বাতাস, অজস্র ফুলের রাশি আর পাখির কূজনকে উপভোগ করেছেন মনে হল। (শুধু গোলাপ আর পর্বতরাজি! যে পনেরোটা দিন তিনি এখানে ছিলেন সেটাই ছিল এ বছরের সেরা সময়। ভাই রবিকে অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সূর্য।) রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষভাবে সুন্দর জায়গাটিকে ঈষৎ ঈর্ষান্বিতভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করলেন। শরীর সারানোর জন্য এখানে এক মাস বা তার বেশি থাকতেও রাজী ছিলেন তিনি।

কিন্তু দিন আষ্টেক যেতে না যেতেই বাংলাদেশের জন্য মন কেমন করতে লাগল তাঁর।— পথে নামার গোপন উত্তাল আকাঙ্ক্ষা, এক দীর্ঘ যাত্রার পরিকল্পনা, যার কোনো কথাই ছিল না। (তিনি জানিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই ১৫ই সেপ্টেম্বরের জাহাজে রিজার্ভেশন হয়ে গিয়েছিল তাঁর।) তিনি ভাবতে শুরু করলেন ভিয়েনা, প্রাগ, প্যারিস, লণ্ডনের পর আমেরিকা যাওয়ার কথা···প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে জাপানে পৌঁছনোর কথা, ভারতবর্ষে ফেরাটা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়ে।··আমি তোমার কাছে লুকোব না যে পরিকল্পনাটা আমার অস্বস্তিকর লেগেছিল। ঐরকম বিশ্রী মরশুমে ছ থেকে আট মাসের নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তি, আমেরিকা আর জাপানের শীত—এসব সহ্য করতে হলে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীসাথীদের ভেতর কেউই মুখ খুলতে সাহস পেলেন না। তাঁরা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, আর সেটা সত্যিই বিপজ্জনক!

আমার এই চিঠি একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয়, আমি তোমায় আর শ্রীমতী শান্তাকে অনুরোধ করব কঠোরভাবে এর গোপনীয়তা রক্ষা করতে।

আট দিনে এমন কী ঘটে থাকতে পারে যার ফলে কবির দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গেল? সন্দেহ নেই, তাঁর মনের গভীরে ছেয়ে আছে এক প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ, যা তাঁর হৃদরোগের একটি লক্ষণ হতে পারে—যা তাঁকে একটুও স্থির থাকতে দেয় না, এখানে ওখানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। হয়তো সেই সঙ্গে তাঁর সামাজিক প্রকৃতির

কাছে ভিলন্যভ একটু বেশি নির্জন ঠেকে থাকতে পারে (তিনি স্বীকার করলেন একা থাকলে তিনি এক গভীর উদ্বেগে ভোগেন)। কিন্তু আমার অনুমান, এর পেছনে আরো অন্য কারণ রয়েছে : সেটা হল তাঁর ইতালি-ভ্রমণকে কেন্দ্র করে ইউরোপের বন্ধুবান্ধবের মনে ভুল বোঝাবুঝি সম্পর্কে সূক্ষ্ম সচেতনতা।

আজ আমি তোমায় প্রথমে সেইটে নিয়েই কিছু বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ইউরোপে যে জ্যোতির্বলয় তা তাঁর সুন্দর কাব্যকৃতির জন্য ততটা নয় (সংখ্যায় অত্যন্ত কম ও বিশ্রীভাবে অনূদিত, বিশেষত ফ্রান্সে[৩]) যতটা তাঁর কথার ভাববাদী উচ্চতার জন্য, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়কার কিছু বক্তৃতায়, যখন তিনি পাশ্চাত্যসভ্যতার দোষত্রুটি, অপরাধগুলির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন! তাঁর সেইসব কথা পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে স্বচ্ছদৃষ্টি মানুষজনের অন্তরতম অনুভূতিকে স্পর্শ করেছিল।[৪] আর দূর থেকে উঁচু থেকে আসা সেইসব কথার সে যে কী প্রতিধ্বনি জেগেছিল তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সেই থেকে ইউরোপের এলিট তাঁকে ধ্রুবতারা হিসেবে—স্ববিচার ও মুক্তির প্রতিমূর্তি হিসেবে—স্বাগত জানিয়েছে। এঁদের চূড়ান্ত হতবুদ্ধি অবস্থার কথা একবার ভাবো যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে রবীন্দ্রনাথ এমন একজনের রাষ্ট্রীয় অতিথি হতে রাজী হয়েছেন যে ইওরোপে সবচেয়ে নিপীড়নকারী, বর্বর, মারাত্মক স্বৈরাচারের প্রতীক—আমেনদোলা[৫] ও মাত্তেয়ত্তির[৬] হত্যাকারী—মুসোলিনি··· আমি মহলানবিশের কাছে শুনেছি কীরকম ধূর্তভাবে পুরো পরিকল্পনাটা তৈরি করা হয়েছিল কয়েকজন বুদ্ধিজীবির সহায়তায় (ফ্রান্সেও যে কিছু অন্যরকম হত তা নয়, বুদ্ধিজীবীরা সর্বত্র একরকম)—ইতালিতে যারা নিজেদের ক্ষমতার দাসে পরিণত করেছিল। আমি জেনেছি কীভাবে ভারতবর্ষ ছাড়ার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সঙ্গীসাথীদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়,—ইতালিতে পৌঁছে তিনি জানতেই পারেননি তিনি কার অতিথি। আমি আরো জেনেছি যে সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর পক্ষে এমন একটি লোকের সঙ্গেও দেখা করা সম্ভব হয়নি যে ফ্যাসিবাদের তাঁবেদার নয়। অধ্যাপক ফরমিকি[৭] কবিকে মরিয়া হয়ে আগলে রেখেছিলেন এমন কী ডিউক স্কত্তর[৮] মতো বন্ধুদের থেকেও, যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ যদি জেদ করে (ভাগ্যের জোরেও, পরে আসছি সেকথায়) রোম রওনা হওয়ার দিন সকালে বেনেদিত্ত ক্রোচের[৯] সঙ্গে দেখা করতে পেরে থাকেন, ভীতু ও সাবধানী ক্রোচে সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলার সাহসই পাননি। এর ফল কী হতে পারে অনুমান করা কঠিন নয়। ইতালির ফ্যাসিস্ট প্রেস (অন্য কাগজপত্রের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল) সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিস্ট বানিয়ে তুলল, তাঁর মুখে নানা কথা আরোপ করা হল, বলা হল রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনিকেই ইতালির

মহনীয়তার কারণ বলে মনে করেন। আট বা পনেরো দিনের আগে রবীন্দ্রনাথ এসবের কিছুই জানতে পারেন নি।…

ইওরোপে এর কী প্রতিক্রিয়া হল বুঝতে পারছ! আমি ইতালির ফ্যাসিবাদ বিরোধী তরুণ ছাত্রদের কাছ থেকে উদ্বিগ্ন চিঠিপত্র পেয়েছি, অনেকে আমার সঙ্গে দেখাও করেছেন…প্যারিসে *L'Humanité*-র মতো কাগজ রবীন্দ্রনাথের মুখে আরোপিত কথাগুলি—যেন সেসব সত্যি—নতুন করে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথকে কড়াভাবে নিন্দে করার উদ্দেশ্যে তারা সেগুলিকে টেক্‌স্‌ট্‌ হিসেবে ব্যবহার করে।

তক্ষুনি এর একটা বিহিত করা দরকার ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন জানতে পারলেন কীভাবে ইতালিয় প্রেস তাঁর মুখে কথা বসাচ্ছে, তিনি নিজেই এর উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন; তিনি বললেন তিনি (ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কাগজে) একটি সাক্ষাৎকার দিতে চান যেখানে তিনি ফ্যাসিবাদ বিষয়ে তাঁর অভিমত জানানোর সুযোগ পাবেন।

আমি জর্জ দ্যুয়ামেলকে[১০] তার করি। ফ্রান্সে আমার পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে (যাদের বয়স চল্লিশ) তাঁর নামই সবচেয়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, বৃহত্তর মানবজাতির মুক্ত চিন্তার প্রতিনিধি তিনি। তাছাড়া তিনি মধ্যপন্থী, বাম বা দক্ষিণ কোনো রাজনীতিই করেন না। রবীন্দ্রচিন্তা বোঝা ও বোঝানোর জন্য তিনিই যোগ্য লোক। দ্যুয়ামেল পত্রপাঠ উপস্থিত হলেন, ঠিক হল তিনি একটি প্রশ্নমালা তৈরি করবেন, এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্রনাথ লিখিতভাবে সেটির উত্তর দেবেন। সেই রকমই হল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আমন্ত্রণ করলেন তাঁর উত্তর শোনানোর জন্য—মাদলেন যা আমাদের অনুবাদ করে দেবেন।

তিনি যা বললেন আমরা তা একেবারেই আশা করিনি। সত্যি কথা, রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের এক তাত্ত্বিক ও কিছুটা প্লেটোনিক সমালোচনা করেননি তা নয় (ওটা তিনি এক ফ্যাসিবাদী তাত্ত্বিকের সঙ্গে আলোচনা হিসেবে সাজিয়েছিলেন, যার তিনি নাম দেননি), কিন্তু তাঁর ইতালি-ভ্রমণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে ফ্যাসিবাদের নিয়মশৃঙ্খলা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, এবং তা নিয়ে তিনি তর্কে যেতে রাজী ছিলেন না। লেখাটির শেষে ছিল মুসোলিনির এক প্রশস্তিমূলক ছবি (যা তার সাথে দুটি সাক্ষাতের স্মৃতির ভিত্তিতে রচিত)। মুসোলিনিকে তিনি তুলনা করলেন নেপলিয়ন ও আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেটের সঙ্গে, যদিও সেইসঙ্গে কর্মবীরদের চেয়ে চিন্তানায়কদের প্রতি তাঁর নিজের পক্ষপাতের কথা জানাতে ভুললেন না। তিনি বললেন, 'আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না কারণ আমি আর কিছুই দেখিনি।'

সত্যি বলতে কি, ফ্যাসিবাদের ভণ্ডামি ছাড়া তাঁকে কিছুই দেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি। আমাদের খারাপ লাগছিল, কারণ ফ্যাসিবাদী প্রতারকেরা ঠিক এটাই চেয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ে কিছু তাত্ত্বিক আপত্তি সত্ত্বেও এরকম একটি লেখা ইওরোপে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে তুলতে একেবারেই সহায়ক ছিল না।

দ্যুয়ামেল সেটা ধরতে পেরেছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথকে তাঁর হতাশার কথা স্পষ্ট ভাষায় শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। দ্যুয়ামেল সোজা লোক, কিন্তু সূক্ষ্মতার বড় অভাব। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ভুল বোঝা বুঝির সৃষ্টি হল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার চেষ্টাই করলেন না, এবং রবীন্দ্র-মানসিকতা সম্পর্কে (অথবা যাকে তিনি সাত তাড়াতাড়ি রবীন্দ্র-মানসিকতা বলে ধরে নিলেন) এমন এক অনমনীয় কঠোরতা দেখালেন যা তাঁর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আমার খারাপ লাগছিল কিন্তু দুপক্ষের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে দেওয়ার পক্ষে তখন খুব বেশি দেরী হয়ে গেছে। আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটা কথাই আদায় করে নিতে পারলাম—সেটা হল লেখাটি প্রকাশ করার আগে ইতালির কয়েকজন নির্যাতিত ও নির্বাসিত প্রতিনিধির সঙ্গে আমরা দেখা করব। আমি এরকম বেশ কয়েকজনকে চিঠি লিখেছি বা তার করেছি, যাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুসোলিনি-বিরোধী প্রবল ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সালভেমিনি।[১১] এখন তিনি লণ্ডন-নিবাসী, *Manchester Guardian*-য়ে লেখেন। আশা করছি তিনি কবির সঙ্গে দেখা করবেন।

বুঝতে পারছ কবির কথায় দ্যুয়ামেলের প্রতিক্রিয়া তাঁর চরিত্রের সঙ্গে কীরকম খাপ খেয়ে যাচ্ছে! দ্যুয়ামেলের মতামত আমার চেয়ে অনেক কম উদার, অথচ তাঁকেই ফ্রান্সের সুস্থ, অনুভূতিশীল পরিমিতিবোধের প্রতিনিধি ঠাহর করা হয়।—কিন্তু এসব থেকে খুবই পরিষ্কার, কবির ওই ইতালি-ভ্রমণ কতখানি বিরক্তির উদ্রেক করেছে!

যারা এর বন্দোবস্ত করেছে, বা এমন ব্যাপার ঘটতে দিয়েছে, তারা জাহান্নামে যাক!

আমি তাঁর সাথে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি, যদিও তাতে একটি বিকেল ও সন্ধ্যার বেশি লাগেনি। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটা খুবই কষ্টের যে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের মিল হল না!—অথচ ঈশ্বর জানেন তাঁর প্রতি কতখানি ভালবাসা আমার! তাঁকে অসম্মান করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না! আমি তাঁকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি, তিনি তিনি বলেই আমি তাঁকে ভালবাসি!—দোষ তাদেরই যারা ইতালি-ভ্রমণের সময় তাঁকে ব্যবহার করে সেটার একটা অন্য চেহারা দিয়েছে! এবং আমার কোনো সন্দেহই নেই যে এত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও কবি তা বানচাল করতে সমর্থ হবেন, এবং সঠিক সময়ে

মহৎ ও অজেয় সত্যকে প্রকাশ করতে উঠে দাঁড়াবেন।

রাজনীতির কথা বাদ দিলে, কবির সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা ছিল স্নিগ্ধ ও মনোরম! আমার কেবল একটাই অনুতাপ রয়ে গেল : ইংরেজি বুঝতে বা বলতে না পারার দোষে ওঁর সঙ্গে একা মুখোমুখি বসা হল না। মাদলেন আমাদের যত ঘনিষ্ঠ ও যত বিচক্ষণই হোক না কেন, কিছু কিছু কথা তো কেবল দুজন মানুষের মধ্যেই বলা যায়!

আমাদের এখানে মধ্যাহ্নভোজন করতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে বাগানে গিয়ে ছবি তুললাম। ঐ চমৎকার ছবিগুলির একটি আমি তোমায় পাঠাব।—আমরা তাঁর সঙ্গে গাড়িতে একটা চক্কর দিয়ে এলাম তেরিতে, মঁরো আর ভাভে পর্যন্ত—সাভোয়ার উপকূল অবধি নৌকো চড়ে ঘুরলাম আমরা।—গ্লুক আর বেঠোফেন থেকে কয়েক পৃষ্ঠা তাঁকে বাজিয়ে শোনালাম আমি (গ্লুকের[১২] "অকিয়াস" শুনে তিনি চমৎকার কদর করতে পারলেন)। জেনিভার একদল তরুণ-তরুণী কবিকে গেয়ে শোনাল ষোড়শ শতকের কোরাস, যা তিনি বুঝতে পারছেন বলে মনে হল। —বেশ কিছু দর্শনপ্রার্থী এসেছিলেন তাঁর কাছে—স্যর জেম্‌স্ ফ্রেজার,[১৩] অধ্যাপক ফেরিয়ের,[১৪] শার্ল বদুয়্যাঁ[১৫] (রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা তাঁর একটি সুন্দর নাটক পড়া হল) এবং অর্ধেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙাস্ত ফোরেল,[১৬] যার আসাটা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল।—তাছাড়া, আমরা খেয়াল রেখেছিলাম যাতে তিনি যথেষ্ট বিশ্রাম পান। খবরের কাগজওলোকে জানানোই হয়নি, যেদিন তিনি রওনা হয়ে গেলেন সেদিনই সবেমাত্র তারা ব্যাপারটা আঁচ করতে শুরু করেছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, ভালমঁ-র প্রধান চিকিৎসক আমার সেই অসাধারণ ডাক্তার-বন্ধু ডাঃ এমেরলি[১৭]—যাঁর ওপর রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসার জন্য আমি এতখানি নির্ভর করেছিলাম যিনি গত দু বছর ধরে তাঁর ভার নেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছনোর দুসপ্তাহ আগে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে শেষ পর্যন্ত যে ডাক্তারদের ডাকতে হল তাঁরা নিঃসন্দেহে বেশ ভাল হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ডাঃ এমেরলির কর্তৃত্বময়, স্নিগ্ধ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব ছিল না, যার প্রয়োজন ছিল কবির। তাঁরা তাঁকে কীভাবে নির্দেশ দেবেন ঠাহর করে উঠতে পারছিলেন না, তাঁকে উৎসাহিত করতে পারলেন না আরো কিছুদিন থেকে যেতে। যাইহোক অন্তত তাঁদের রোগ নির্ণয়টা ঠিক হয়েছিল। সন্দেহ নেই, আর একটু যত্নআত্তিতে থাকলে এরকম সুন্দর আবহাওয়ায় তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা তো হওয়ার নয় : কাজের তৃষ্ণা তাঁকে টেনে নিয়ে গেল।

প্রতিমা ঠা. কে ভীষণ ভাল লেগেছে আমাদের। এই তরুণী নারীর ব্যবহার ও বুদ্ধিতে বেশ একটা নিজস্বতা আছে, এক বিষণ্ণ গাম্ভীর্য, যা আমাদের মুগ্ধ

করেছিল। তরুণী রাণী মহলানবিশও সুন্দর—তারুণ্যের পূর্ণতা ও আনন্দে ভরা। খুব শিগ্‌গির আমার বোনের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল তাঁর, বাগান থেকে তাঁর মিষ্টি হাসির শব্দ শোনা যেত।—মনে হল রবীন্দ্রনাথের ছেলে[১৮] খুবই পিতৃভক্ত, আড়ালে আড়ালে থাকতে চায়, একটু বেশি করমই যেন। শান্ত মানুষটি, একটু দুঃখই হয় তাকে বাবার ছায়ায় হারিয়ে যেতে দেখে।—কিন্তু একথা মোটেই মহলানবিশের ক্ষেত্রে খাটে না। ঐ বিশাল প্রতিভার প্রভাবেও সে কিছুতেই তার ব্যক্তিত্ব খোয়াতে রাজী নয়। তার ধীশক্তি রয়েছে, সে কাজের মানুষ, সে কথা বলে, প্রশ্ন করে। অবিশ্যি আমায় বিশ্বভারতীর সাংগঠনিক দিকটি ভাল করে বুঝিয়ে বলার আগেই তাকে চলে যেতে হল, বলা হল না ঠিক কী ধরনের সাহায্য সে আমার ও অন্যান্য ইউরোপীয় বন্ধুদের কাছে প্রত্যাশা করে···যদিও সেটাই ছিল আমাদের সাক্ষাৎকারের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সে রবীন্দ্রনাথের সরকারি ইতালি সফরের বিরোধী ছিল এবং, আমার মনে হয়, ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিচার আদায় করতে সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

মহলানবিশ ও রথীন্দ্রনাথ রণিগারের[১৯] সঙ্গেও আলোচনা করে; আমি তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। আশা করছি এর থেকে কিছু একটা হবে যদিও ঐ ফরাসি-জার্মান পুস্তক বিক্রেতার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

কবি খুব স্নেহভরে মাদলেনকে বেশ কয়েকদিন সকালে তাঁর ওখানে আসতে বলেছিলেন বাংলা শেখানোর জন্যে—আর কবিতা পড়ে শোনানোর জন্যে। একদিন কবিতা পড়ার মুহূর্তে মার্সেল মাতিনে সেখানে উপস্থিত ছিল। সে একটি শব্দও বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু ছন্দ ও ধ্বনিমাধুর্যে সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

'কবি'—যতই রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায় ততই বোঝা যায় কীভাবে এই অভিধাটি তাঁর সারসত্তাকে পরিস্ফুট করে। ঐ ঐশ্বর্যবান আলোকময় ব্যক্তিত্বের মধ্যে কবিরই প্রাধান্য। সেটাই তাঁর ব্যক্তিত্বের ভিত্তিভূমি, মনের অন্যান্য সমস্ত গুণই সেখানে গৌণ হয়ে যায়। আর তিনি সেটা পছন্দ করুন বা নাই করুন, তাঁর বাকি সমস্ত ক্রিয়াকর্মই তাঁর মনের এই দিকটির দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেইখানে তিনি রাজা—সর্বকালের মহত্তম কবিদের একজন।

আমরা তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসি, আমরা তাঁকে সুখী করতে চেয়েছি। তাঁর প্রাগ-যাত্রা সম্পর্কে আমি রাষ্ট্রপতি মাদারিককে লিখেছি। আশাকরি রবীন্দ্রনাথকে সরকারি অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করা হবে। আমি চাই ইওরোপের দেশনেতাদের মধ্যে নৈতিকভাবে সবচেয়ে বলশালী ব্যক্তিত্বটির সাথে কবির পরিচয় হোক।

কবির মনোরম ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশের মানুষকে কতখানি মুগ্ধ করেছে তা আর তোমায় বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। তাঁর হোটেলের সিঁড়ি

দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে নেমে আসতে দেখে একজন মহিলা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন : 'ঐ যে পরম কল্যাণময় ঈশ্বর এসে পৌঁছেছেন !' এ আমার নিজে চোখে দেখা।

কল্যাণময় তো তিনি নিশ্চয়ই, গভীরভাবে ! এই কল্যাণময়তা তাঁর সর্বসত্তা থেকে উৎসারিত হচ্ছে।

তবু আমি বলব, প্রিয় কালিদাস নাগ, তোমার মতো আরো কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে থাকলে ভাল হত। শুধু ভক্তিভাব (তার অভাব ছিল না) দেখানোর জন্য নয়, ব্যবহারিক ব্যাপারে তাঁকে সজাগ ও দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করার জন্যও ! কারণ আমার মনে হয়েছে এ ব্যাপারটাকে খানিকটা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর সময় ও শক্তির প্রচুর অপব্যয় করে—বিপদসংকুল পৃথিবী নিজস্ব স্বার্থে এই সুযোগগুলিকে কীভাবে কাজে লাগায় সেকথা নাহয় ছেড়েই দিলাম।

—সুইজারল্যাণ্ডে আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটা ঐ বিরাট বন্ধুটিকে কয়েক-দিনের জন্য পেয়ে ধন্য হয়েছে। তিনি চলে যাওয়ামাত্র আকাশ কালো হয়ে এল, ভিলন্যভে আছড়ে পড়ল ঝড়, আর সেই থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। তবু হৃদয়ের মধ্যে ঐ আলো আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি।

তোমার কথা মনে পড়েছে আমাদের। আশাকরি আমাদের পোস্টকার্ড পেয়েছ। হোটেল বায়রনে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বসে ঐ কার্ডে সই করেছিলাম আমরা—চল্লিশ বছর আগে আমার ছেলেবেলায় ঐ ঘরেই বাস করতেন ভিক্তর য়্যুগো।[২০]

তুমি ও শান্তা আমাদের স্নেহাশিস নিও।

তোমার বন্ধু
রমঁ্যা রলাঁ

পুঃ জুরিখ থেকে মহলানবিশ লিখছে যে তেমন কিছু ক্লান্তি ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ সেখানে পৌঁছতে পেরেছেন। তাঁরা ভিয়েনা রওনা হচ্ছেন, মধ্যে মিউনিখে এক রাত্তির থাকবেন।

টীকা

১. মাতৃভূমি ফ্রান্স ছেড়ে ১৯২২ সালের মে মাস থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সুইজার-ল্যাণ্ডের ভিলন্যভে স্বেচ্ছানির্বাসিত ছিলেন রলাঁ।

২. 'আমরা' অর্থে রলাঁ ও তাঁর চেয়ে ছ-বছরের ছোট বোন মাদলেন রলাঁ (দ্র. ১৮৭২)—ইংরেজি ও কিছুটা বাংলা জানার সুবাদে ইনি দীর্ঘদিন

(সম্ভবত ১৯৩৪ সালে মারিয়া কুদাশেভার সঙ্গে রলাঁর দ্বিতীয় বিবাহের আগে পর্যন্ত) দোভাষীর কাজ করেন। কালিদাস নাগের সঙ্গে এঁর পত্রাবলি আজও অপ্রকাশিত।

৩. 'গীতাঞ্জলি'র আঁদ্রে জিদ-কৃত ফরাসি অনুবাদ পড়েই অবশ্য রলাঁ রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু অনুবাদে যে মূলের প্রায় কিছুই ফোটেনি সেটা বোঝার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

৪. এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। রলাঁ তাঁকে প্রথম চিঠি লেখেন ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল। ২৬শে জুন *L'Humanité* পত্রিকায় প্রকাশিত মুক্তমনের ঘোষণাপত্রে (Déclaration de l'indépendance de l'Esprit) দুজনে সই করেন। পরে ১৯২১ সালে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ নিজে রলাঁর মোঁপার নাসের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

৫. জিওভান্নো আমেনদোলা (১৮৮৬-১৯২৬) : ইতালিয় দার্শনিক, সমা-লোচক ও সাংবাদিক। সম্মানিত 'ডেমোক্র্যাটিক লিবারাল', ফ্যাসিবাদীদের হাতে বার বার নিগৃহীত হন।

৬. জিয়াকোমো মাত্তেয়ত্তি (১৮৮৫-১৯২৪) : ইতালিয় রাজনীতিবিদ, ১৯২৪ সালে সমাজবাদী, দলের মুখ্যসচিব হন। ঐ বছর ৩০শে মে পার্লামেণ্টে ফ্যাসিবাদীদের নানা অপরাধমূলক ক্রিয়াকর্মের নিন্দে করার দশ দিনের মধ্যে তাদের হাতে নিহত হন।

৭. কার্লো ফরমিকি (১৮৭১-১৯৪৩) : ইতালিয় ভারততত্ত্ববিদ, রয়াল অ্যাকাডেমির সদস্য, রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ১৯২৫-২৬ সালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনির সাক্ষাৎকারের সময় দোভাষীর কাজ করেন।

৮. গাল্লারাতি তোমাস্যো স্কত্তি (১৮৭৮—?) : ইতালিয় লিবারাল রাজনীতি-বিদ ও লেখক। ফ্যাসিবাদবিরোধী, কিন্তু কখনো খোলাখুলি সংঘর্ষে আসেননি।

৯. বেনেদিত্ত ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২) : ইতালিয় দার্শনিক, সমালোচক। প্রথমে সমর্থন করলেও পরে ফ্যাসিবাদবিরোধী হয়ে যান। ক্রোচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কী কথা হয়েছিল তা আজও রহস্যে ঢাকা। মারিও প্রেয়ারের সাম্প্রতিক গ্রন্থ *In Search of an Enterte : India and Italy* (১৯৯৪) থেকে জানা যাচ্ছে যে ক্রোচে ইঙ্গিতে ফ্যাসিবাদের সমালোচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ তা ধরতে পারেননি।

১০. জর্জ দ্যুয়ামেল (১৮৮৪-১৯৬৬) ফরাসি কবি ও মানবতাবাদী।

১১. গায়েতানো সালভেমিনি (১৮৭৩-১৯৪৭) : ইতালিয় অধ্যাপক, ঐতি-

হাসিক ও রাজনীতি-বিষয়ক লেখক। মুসোলিনির নানা অপরাধ ফাঁস করে দেন। ১৯২১ সালে পার্লামেন্টের সদস্য হন, ১৯২৫ সালে ইতালি ছাড়তে বাধ্য হন। ফ্রান্সে বসে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯৪৭ সালের আগে দেশে ফিরতে পারেননি।

১২. ক্রিস্টোফার গ্লুক (১৭১১-৮৭) : জার্মান সংগীতস্রষ্টা।

১৩. জেম্‌স ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১) : আধুনিক নৃতত্ত্বের অন্যতম জনক। *The Golden Bough* (১৮৯০-১৯১৫)-এর লেখক।

১৪. এঁর সম্পর্কে কোনো তথ্য পাইনি।

১৫. শার্ল বহুয়্যা : সুইস সাহিত্যিক।

১৬. অগুস্ত ফোরেল (১৮৪৮-১৯৩১) : সুইস চিকিৎসক ও প্রকৃতিপ্রেমিক। বিখ্যাত গ্রন্থ : *The Socialist World of Ants compared to that of Men* (1921-23).

১৭. ডাঃ এমেরলি : বিশের দশকে ভালমঁ-সুরতেরিতে-তে চিকিৎসক।

১৮. রবীন্দ্র-পুত্র সম্পর্কে রলাঁর আস্থা আরো কমবে। দ্র. *The Tower and the Sea.*

১৯. এমিল রণিগার (১৮৮৩-১৯৫৮) : লেখক, সংগীতজ্ঞ, শিল্পী, প্রকাশক। রলাঁর মহৎ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। তাঁর অনুপ্রেরণায় Weltbibliothek (বিশ্বগ্রন্থাগার) গড়ার কথা ভেবেছিলেন। রামকৃষ্ণ-জীবনীসহ রলাঁর বহু গ্রন্থ ছেপেছেন।

২০. এই চমকপ্রদ তথ্য 'ভারতবর্ষ' দিনপঞ্জিতেও আছে। অনেক পরে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ তারিখে কালিদাস নাগকে লেখা এক চিঠিতে রলাঁ ঐ বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দুঃখ করেছেন। দ্র. *The Tower and the Sea* (পৃ ২৮৫)।

কুর্‌রাতুলআইন হায়দার

—

প্রতীক্ষা

অনুবাদ : জাফর আলম

রাত তখন এগারোটা। শহরের নিঃঝুম রাস্তাগুলো পেরিয়ে একটা সেকেলে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ড্রাইভার দরজা খুলে আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে ফুটপাতে রাখলে। তারপরে পয়সার জন্য হাত বাড়াতেই আমি অবাক হয়ে বললাম—'এই জায়গা?' 'জি, হাঁ', ড্রাইভার জবাব দিল।

'আমি নেমে পড়লাম। গলির অন্ধকারে ট্যাক্সি মিলিয়ে গেল। নিঃসাড় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ফটক খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা ভেতর থেকে বন্ধ। ফটকে একটা ছোট কড়া লাগানো। সেটা খট্‌খট্ করে নাড়লাম। একটু পরে দরজাটা খুলে গেল। আমি চোরের মতো ভেতরে মাথা গলিয়ে ইতিউতি দেখলাম। আবছা অন্ধকারে রাতের পোশাক পরা দুটো মেয়ে এককোণে বসে ফিস্‌ফিস্ কথা বলছে। উঠোনের ওপারে একটা ভাঙা পুরোনো প্রাসাদ। মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল লক্ষ্ণৌর খিসিয়ারী মিণ্ডি স্কুলের কথা। সেখানে পরীক্ষা দিয়ে আমি বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। আরেকবার তাকালাম গলির নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে। মনে মনে ভাবলাম—যদি এমন হয়, এটা যদি গুণ্ডাদের আড্ডা হয়, আমি এক ভিন্ দেশের ভিন্ শহরের রাত এগারোটায় এক অচেনা বাড়ির ফটকে ধাক্কা দিচ্ছি, বাড়িটার সঙ্গে যার মিণ্ডি স্কুলের সামঞ্জস্য রয়েছে।

একটা মেয়ে এগিয়ে এলো।

আমি বিনীতভাবে হেসে বললাম—'গুড্ ইভ্‌নিং। এটা ওয়াই. ডব্লু. সি. এ. না? আমি তার করে দিয়েছিলাম একটা কামরা রিজার্ভ রাখার জন্য।' মনে মনে বললাম, ওয়াই ডব্লুর এই শ্রী?

'আমরা আপনার কোন তার পাইনি। আর সত্যি দুঃখিত যে কামরাও খালি নেই।

রচনাটি মূল উর্দু থেকে অনূদিত

এবারে দ্বিতীয় মেয়েটি এগোলো—'এটা ওয়ার্কিং গার্লসদের হোস্টেল। এখানে অন্য কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না।'

আমি ঘাবড়ে গেলাম। এখন আমি কোথায় যাব? অন্য মেয়েটি আমার অসহায় অবস্থা দেখে একটু হাসল—'কোন চিন্তা নেই, ভেতরে চলে এসো।' আমি সংকুচিত হয়ে বললাম—'আমার জন্য কোথায় জায়গা হবে?'

'কোন চিন্তা নেই, জায়গা বানিয়ে দেব। এখন এই মাঝরাতে তুমি কোথায় যাবে?'

সুটকেসটা আমার হাত থেকে মেয়েটা নিয়ে নিল। আমি চলতে চলতে বললাম—'ব্যস্ শুধু এই রাতটা থাকতে দাও। সকালে আমার বন্ধুদের আমি ফোন করে দেব। তোমার আর কষ্ট হবে না।' মেয়েটি বলল—'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।' প্রথম মেয়েটি শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

আমরা সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় পৌঁছলাম। বারান্দার এক কোণে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা কামরা। লাল ফুল তোলা মোটা পর্দা সরিয়ে মেয়েটা ভেতরে গেল। আমিও গেলাম তার পিছু পিছু।

'আমি এখানে থাকি। তুমিও এখানে শোবে।' সুটকেসটা রেখে সে আলমারি থেকে পরিষ্কার তোয়ালে আর সাবান বের করল। এক কোণে ছোট একটা পালঙ্কে মশারি খাটানো। সামনে প্রসাধন টেবিল আর বইয়ের আলমারি। সারা পৃথিবীর মেয়েদের হোস্টেল যেমন হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি। মেয়েটি আরেকটা আলমারি থেকে চাদর আর কম্বল বের করে ধূসর বিবর্ণ চত্বরে বিছিয়ে দিল। পালঙ্কে টাঙিয়ে দিল মশারি, নতুন চাদরও দিল। 'তোমার বিছানা তৈরি।' আমি লজ্জা পেয়ে বললাম—'শোনো, আমি মেঝেতে শোব।'

'তা হয় না। মশা কামড়ে শেষ করে দেবে। আমরা এতে অভ্যস্ত। নাও, কাপড় ছাড়।' বসে পড়ল মেয়েটা।

'আমার নাম কারমিন, এক অফিসে চাকরী করি। আর সন্ধ্যায় ভার্সিটির ল্যাবরেটরীতে কেমিষ্ট্রী বিষয়ে রিসার্চ করি। ওয়াই ডব্লুর সোশাল সেক্রেটারী আমি। এখন তোমার সম্পর্কে কিছু বল?

আমি আমার পরিচয় দিলাম। 'এখন শুয়ে পড় তাহলে।' আমাকে ঝিমুতে দেখে বলল সে। আর দু'জানু একত্র করে কি যেন প্রার্থনা করল, তারপর হঠাৎ শুয়ে পড়ল।

সকালে বাড়িটা সরগরম হয়ে উঠল। হাউজ কোট পরা মেয়েরা মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরুচ্ছে। বারান্দায় গরম কফির গন্ধ ছড়ানো। দু-তিনটা মেয়ে আঙ্গিনায় পায়চারী করে দাঁত ব্রাশ করছে। 'চলো তোমাকে বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছি।' কারমিন বলল।

করিডোর পেরিয়ে এক প্রান্তে এক ভাঙাচোরা কুঠরির মতো। তাতে শুধু একটা মাত্র নল লাগানো। আর দেয়ালে একটা হুক লাগানো। চত্বর স্যাঁতসেঁতে আর আস্তর খসা দেয়াল। কোথা থেকে যেন একটি মেয়ের গলায় গানের সুর ভেসে আসছিল। বাথরুমে দাঁড়িয়ে আমি ভাবলাম কি আশ্চর্য কতকাল থেকে এই বাথরুম এই শহরের বাড়িতে রয়েছে, যেখানকার কথা আমি কল্পনাও করিনি, সেখানেই আজ এসে দাঁড়িয়েছি। বোকার মতো কি সব ভাবছি আমি।

স্নান সেরে আমি বেরিয়ে এলাম। আধো অন্ধকার হলঘরে এক ছোট টেবিলে আমার নাস্তা সাজানো হচ্ছে। ক'টি মেয়ে জমা হয়েছে। কারমিন তাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা পুরোনো বন্ধুদের মতো হাসি-ঠাট্টায় মুখর হয়ে উঠলাম।

'আমি এবার পরিচিতদের ফোন করব।' চা শেষ করতে করতে আমি বললাম। কারমিন দুষ্টুমির হাসি হাসল। 'হাঁ, এখন তোমার বড় বড় এবং নাম করা বন্ধুদের ফোন করো। আর তাদের সেখানে চলে যাও, বলি কে তোমার পরোয়া করে? কেমন রোজা, আমরা ওর পরোয়া থোড়াই করি?'

'আলবত।' সমবেত কণ্ঠে সবাই বলে উঠল। মেয়েটি টেবিল থেকে উঠল। 'আমরা এখন কাজে যাচ্ছি, সন্ধ্যায় আবার দেখা হবে।' —ম্যাগডালিনা বলল। 'সন্ধ্যায়? ওমা, সন্ধ্যায় তো সে কোন কান্ট্রি ক্লাবে আড্ডা দেবে।'

কারমিন অফিসে চলে গেলে আমি বারান্দায় গিয়ে ফোন করতে শুরু করলাম। সৈন্য বিভাগের মেডিকেল চিফ মেজর জেনারেল কিমলু গোল্ডাস্, যুদ্ধের সময় তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। মিসেস এণ্ডোনিয়া কুন্তেল, এক কোটিপতি কারবারির পত্নী, আর এখানকার সামাজিক নেত্রী। এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আলফান্সো বেলিরা এদেশের নামকরা ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক, তিনি একবার করাচি এসেছিলেন।

'হ্যালো, হ্যালো—তুমি কবে এলে? আমাদের একটু জানালেও না? ও হো ওখানে? গুড্ গড্—ওটাও কি একটা থাকার জায়গা! শিগ্‌গিরই তোমায় নিতে আসছি।'

সবাই একবার করে ফোনে একথা বলল। সবশেষে আমি ডন গাসিয়া ডিল প্রেডুসকে ফোন করলাম—তিনি পশ্চিম ইউরোপের এক দেশে স্বদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে ছিলেন। এবং সেখানেই তার এবং তার পত্নীর সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তার সেক্রেটারী জানাল তারা আজকাল পাহাড়ে থাকছে। সেই শৈলাবাসে আমার কল যোগ করে দিল সে।

কিছুক্ষণ পর কুন্তেলু আমাকে নিতে এলেন। কারমিনের ঘরে এসে চারিদিকে দেখল। তারপর আমার সুটকেস তুলে নিল। আমি যেন ধাক্কা খেলাম।

আমি এ লোকদের ছেড়ে যাব না। আমি কারমিন, বার্নার্ডা, রোজা এবং ম্যাগডালিনার সাথে থাকতে চাই।

'এগুলো রেখে দিন, সন্ধ্যা অবধি দেখা যাক।' আমি একটু সংযত হয়ে মিসেস কুন্তেলুকে বললাম। 'কিন্তু তোমার যে এই বাজে জায়গায় খুব কষ্ট হবে।' তিনি বারবার বলতে লাগলেন।

রাতে আমি যখন ফিরে এলাম কারমিন আর এমিলিয়া আমার প্রতীক্ষায় ফটকের খিড়কিতে দাঁড়িয়ে আছে।

'আজ আমরা তোমার জন্য কামরা ঠিক করে রেখেছি।' কারমিন বলল। আমি খুশি হয়ে ভাবলাম আজ আর ওকে চত্বরে শুতে হবে না।

হলের অন্য এক প্রান্তে আরো এক কৃত্রিম কামরা বানিয়ে তাতে দুটো সিট পাতা হয়েছে। একটায় আমার বিছানা আর অপরটিতে মিসেস স্থরিল সিগ্রেট ফুঁকছেন। বয়স তার আটচল্লিশ উনপঞ্চাশের কোঠায়। চোখে মুখে আশ্চর্য উদাসীনতা। ইউলিজিন বংশের কোন এক শাখায় তার জন্ম। অবশ্য চেহারা দেখে তা ঠাহর করা মুস্কিল। বিছানায় টান হয়ে হঠাৎই তিনি আমাকে তার জীবনের কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

'আমি গাম থেকে এসেছি।'

'গাম কোথায় ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'গাম হল প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপ। ইংরেজ শাসিত একটা ছোট দ্বীপ এবং এত ছোট যে, পৃথিবীর মানচিত্রে তার নামের নিচে একটা বিন্দু দেওয়া আছে। আমি আমেরিকান শহুরে।'

একটু গর্বোদীপ্ত ভঙ্গিতে বললেন। 'গাম'—আমি মনে মনে পুনরুক্তি করলাম। কি আশ্চর্য ! পৃথিবীতে কত জায়গা। আর তাতে আমাদের মত লোক থাকে।

'আমার মেয়ে এক ভায়োলিন বাদকের সাথে পালিয়ে এসেছে। আমি তাকে পাকড়াও করতে এসেছি। ওর বয়স মাত্র সতের বছর। এ-ই আজকালকার মেয়েরা। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, 'আমার ক্যান্সার হয়ে গিয়েছিল।'

'উহ্' আমার মুখ থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরুল।

'আমার বুকের ক্যান্সার। নইলে'—বড় দরদ দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন। 'নইলে তিন বছর আগে আমিও, সবার মত নর্মাল ছিলাম।' তাঁর স্বরে গভীর আকুতি। 'দেখো'। তিনি নাইট গাউনের কলার সরিয়ে দিলেন। আমিও হঠাৎ চোখ বন্ধ করে ফেললাম। একজন নারীর দেহ সৌন্দর্য হারিয়ে যাওয়া কত বড় মর্মান্তিক।

একটু পরে মিসেস স্থরিল সিগ্রেট নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। জানলার গরাদ দিয়ে চাঁদের আলো উঁকি মারছিলো। কাছেরই কোন কামরা থেকে ম্যাগডালিনার

গানের অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে।

হঠাৎই আমার ইচ্ছে হল আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি।

পরের সপ্তাহে ফ্যাশানেবল পত্রিকাদির ভাষায় বলতে গেলে 'সোশাল এবং সাংস্কৃতিক ব্যস্ততার ধুম'-এর মতো 'আর্ট কালচারের' কাজে কাটল। মিসেস কুন্তেলু আর তার বন্ধুদের সুন্দর, মুক্ত বাড়ি আর আলোয় ঝলমল ভ্রমণ আড্ডায় চমৎকার দিন কাটল। সব রকমের লোক—ইন্টেলেকচুয়েল, সাংবাদিক, লেখক, রাজনৈতিক নেতা মিসেস কুন্তেলুর বাড়িতে আসত। আর নানা রকম আলাপ আলোচনা চলতো। আমি তখন ইংরেজি বাকচাতুর্যে তাদেরকে বাচাল করে তুলতাম। তারপর রাতে ওয়াই ডব্লুতে ফিরে এলে টেবিলের চারিদিকে পাঁচটি মেয়েই জাঁকিয়ে বসে আমার কাছে সারাদিনের গল্প শুনতো।

'আশ্চর্য', রোজা বলল। 'আমরা এ শহরের বাসিন্দা অথচ আমরা জানিনে এখানে এমন আলেফ লায়লা কাহিনীর পটভূমি পড়ে রয়েছে।'

'এই যারা বড়লোক হয় তারা এত টাকা দিয়ে কি করে ?' এমিলিয়া জিজ্ঞেস করে। এমিলিয়া স্কুলে পড়ায়। রোজা এক সরকারি অফিসে স্টেনোগ্রাফার। ম্যাগডালিনা আর বার্নার্ডা এক মিউজিক কলেজে পিয়ানো আর ভায়োলিনের উচ্চতর শিক্ষা নিচ্ছে। এরা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

রোববার সকালে কারমিন বাইরে যাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। কি যেন বের করবার জন্য আমি আলমারীর কবাট খুলতেই হঠাৎ উপর থেকে একটি উলের খরগোস নিচে পড়ে গেল। আমি সেটা উপরে তুলতে গিয়ে দেখি আলমারির মাথায় অনেক খেলনা রয়েছে।

'এসব আমার ছেলের খেলনা।' কারমিন প্রসাধন টেবিলে চুল ঠিক করতে করতে বলল।

'তোমার ছেলে ?' আমি থতমত খেয়ে গেলাম। করুণ চোখে ওর দিকে তাকালাম। কারমিন বিয়ে না করেই মা হয়েছে ? আয়নায় আমার অভিব্যক্তি দেখে সে আমার দিকে তাকাল। মুখ আরক্ত হয়ে উঠল তার।

'তুমি ভুল বুঝেছ।' বলে সে খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর সে নিচের দেরাজ থেকে হালকা নীল রঙের জমকালো বেবী-বুক বের করল।

'দেখো আমার শিশুর জন্মদিনের বই। যখন সে এক বছরের হবে তখন সে এমন করবে। যখন দু বছরের হবে এসব বলবে। এতে ওর ছবি ছাপাব।'

সে আলতোভাবে পালঙ্কে বসে পড়ল। এবং সেই বই থেকে বেছে বেছে সুন্দর সুন্দর আমেরিকান শিশুদের ছবি মেলে ধরল।

'দেখো, আমার নাক কেমন সরু। আর নিকের নাকতো আরো সুন্দর। এমতাবস্থায় আমাদের কি অপরূপ শিশু হবে তা কল্পনা করতে পার ? আমি ওর

জন্মের একমাস আগে থাকতে এসব ছবি দেখব যাতে ওর প্রভাব পড়ে চেহারাটা আরও সুন্দর হয়।'

'তুমিত বদ্ধ পাগল দেখছি। আর এই নিক মহোদয় কে?'

ওর রং একেবারে সাদা হয়ে গেল।

'দোহাই ওর কথা বলনা। ওর নাম নিলে মনে হয় আমার কলিজাটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

অথচ তারপর থেকে বারবার নিকের আলোচনা করতো—'আমি এত অসুন্দর অথচ নিক বলে, কারমিন—কারমিন, তোমার প্রাণের সাথে, তোমার মস্তিষ্কের সাথে, এমন কি তোমার আত্মার সাথে আমার প্রেম। নিক জগতে কত কিছু দেখেছে। কত মেয়ের সাথে ওর বন্ধুত্ব। কিন্তু ওর চোখে আমার সৌন্দর্যহীনতা ধরা পড়ে না।'

গির্জা থেকে ফেরবার পথে, সমুদ্রের বেলাভূমিতে চলতে চলতে, ওয়াই ডব্লুর আস্তর খসা হলে কাপড় ইস্ত্রি করতে করতে সে আমাকে তার এবং নিকের কাহিনী শুনিয়েছে। নিক ডাক্তার।

হার্ট সার্জারির ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গেছে। আর সে ওর জন্য খুব পাগল।

রাত্রে মিসেস স্থরিলের কামরা থেকে কারমিনের কাছে চলে এসেছি। কারণ, মিসেস স্থরিল তাঁর মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন। শোবার আগে আমি মশারী ঠিক করছিলাম। কারমিন ফের মেঝেয় আসর জমিয়ে বসে পড়ল।

'নিক।' সে আরম্ভ করল।

'এখন কোথায়? আমি প্রশ্ন করলাম।

'জানিনে।'

'তাকে চিঠি লেখনা?'

'না।'

'কেন?' আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'তুমি খোদা বিশ্বাস করো?'

'এতো বড় কঠিন প্রশ্ন।' আমি হাই তুলে বললাম। 'কিন্তু কেন তাকে চিঠি লিখছনা সে কথা তো বললে না?'

'আমার প্রশ্নের জবাব আগে দাও। তুমি খোদায় বিশ্বাস কর কিনা।'

'হ্যাঁ।' আমি সহজেই একটা ফয়সলা করার জন্য বললাম।

'আচ্ছা তাহলে তুমি খোদাকে চিঠি লেখ।'

সারা বাড়ির আলো তখন নিভে গেছে। রাতের বাতাস আদিনা ভরে তুলছে। কামরার দরজায় লালফুলের পর্দা আন্দোলিত হচ্ছিল, আমি উঠে সেটাকে এক পাশে সরিয়ে দিলাম।

'বড় সুন্দর পর্দা।' আমি পালঙ্কে যেতে যেতে মন্তব্য করলাম। কারমিন ওপাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। আমার স্বর শুনেই উঠে বসল। তারপর আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল।

'আমি আর নিক একবার পাহাড়ী এলাকায় কয়েকশ মাইল ড্রাইভ করে গিয়েছিলাম। শুনছ তো?'

'হাঁ, হাঁ, বলো।'

'পথিমধ্যে নিক বলল, চলো ডন রিমুঁর সাথে দেখা করে যাই। ডন রিমুঁ নিকের বাবার বন্ধু। আর পরিষদের মন্ত্রি। সবে তিনি নিজের জেলায় পাহাড়ী এলাকায় বাড়ি বানিয়েছেন। আমরা যখন তাঁর বাড়ির কাছে পৌঁছলাম, সামনে দিয়ে সাদা ফ্রক পরা ছোট ছোট শিশুরা একটা স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছিল। সেই দৃশ্য সারা জীবনে আমার কাছে স্বপ্নের মতো এক স্মৃতি। আমরা ভেতরে গিয়ে মিসেস রিমুঁর প্রতীক্ষায় এক সুসজ্জিত ড্রইংরুমে বসলাম। কেবিনেট মিনিস্টার বাড়ি ছিলেন না। ড্রইং রুম স্টাডি রুমের মাঝখানে যে দেওয়াল রয়েছে তাতে এক চৌকো কাচের কৌটাতে প্লাস্টিকের অনেক বড় একটি পুতুল সাজানো। কামরার পারিপাট্যের কাছে যা একেবারে বেমানান। আমরা এই রুচিহীনতায় মুচকি হাসলাম। এমন সময় মিসেস রিমুঁ বারান্দায় এলেন। তিনি আমাদের ঠাণ্ডা চা পান করালেন। এবং সারা বাড়ি দেখালেন। তাদের বাথরুম কালো রং-এর আর অভ্যাগত ঘরটার বিছানাটা লাল ফুলদার টেপেস্ট্রি ঝালর দিয়ে ঢাকা। এসব দেখে শুনে নিক চুপি চুপি আমাকে বলল, 'অরুচির হদ্দ'। আর আমি মনে মনে বললাম, কোথায় অরুচি। আমিও আমার ঘরের জন্য এমনই পালঙ্ক কিনে এর বিপরীত রং লাগাব। এরপর থেকে যখনি আমি আসবাবপত্রের দোকানের কাছ দিয়ে যাই সে কাপড় দেখলে আমার পা থমকে যায়। তাই চাকরী থেকে পয়সা বাঁচিয়ে এই দামী পর্দা কিনেছি।

'যখন আমি এক বিশেষ রেস্তোঁরার কাছ দিয়ে যাই কাঁচের দেয়ালের পাশে টেবিল এবং তাতে সবুজ বাতি দেখি তখন আমি একেবারে কোথায় যেন হারিয়ে যাই। ওটায় আমি এক সন্ধ্যায় নিকের সাথে খেয়েছিলাম।'

আমার ঘুম আসছিল। আর নিকের কাহিনী শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আমি মশারী নামাতে নামাতে বললাম, 'আচ্ছা এত গভীর প্রেম থাকা সত্ত্বেও নিকের সাথে বিয়ে হলনা কেন? এখনো কেন ধুঁকছো।'

'দশ বছর ধরে এক দূরের দ্বীপে আমাকে বাবার সাথে থাকতে হয়েছিল। প্রথমত আমরা এ শহরে থাকতাম। যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে আমাদের ছোট্ট বাড়িটি জলে ছাই হয়ে যায়, আমার মা ও দুই ভাইও তাতে মারা পড়ে। শুধু আমি আর আমার বাবা বেঁচে ছিলাম। বাবা এক স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক

ছিলেন। হঠাৎ তাঁর টিবি হলো তাই আমি তাঁকে সেই দূরান্তরের দ্বীপের সেনিটোরিয়ামে ভর্তি করিয়ে দিলাম। সেনিটোরিয়ামে দেদার পয়সা লাগতো। তাই আমি কলেজ ছেড়ে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাকরী নিলাম এবং আশেপাশের জমিদারের বাড়িতে টিউশ্যানি করতে লাগলাম। তবু ওখানে আরও অর্থের দরকার। তখন আমি আমাদের গ্রামে গিয়ে আমাদের বাগান বন্ধক রেখে এলাম। তবু বাবা ভাল হলেন না। আমি এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে নৌকোয় চড়ে যেতাম এবং জমিদারের বোকা ছেলেদের পড়াতে পড়াতে চুরমার হয়ে যেতাম। তবু বাবা ভাল হল না। নিকের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত আজ থেকে দশ বছর আগে ফিস্টোতে হয়েছিলো, সে সময় আমি যখন রাজধানীতে আসতাম আমাদের সাক্ষাত হতো।

তিন বছর ধরে সে বিয়ের তাগাদা করছে কিন্তু বাবার অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে আমি তাতে সায় দিতে পারিনি অথবা বাবাকে রেখে আমি এখানে আসতে পারতাম না। এ সময় নিক বাইরে গেল। তারপর বাবা যখন মারা গেলেন আমি এখানে চলে এলাম। এখন আমি এখানে চাকরী করছি। আগামী বছর ইউনিভার্সিটিতে থিসিসও দাখিল করে দোব। আমি বাবার সম্পত্তিটা বন্ধক থেকে ছাড়িয়ে নোব। নিক আমায় সাহায্য করতে চায়। কিন্তু আমি বিয়ের আগে এক পয়সাও নোব না। তাদের পরিবারের লোক বদমেজাজী এবং মতিচ্ছন্ন। একটা মেয়ের জন্য আত্মসম্মানের প্রশ্নটাই বড়। আত্মমর্যাদা, স্বাবলম্বন এবং আত্মনির্ভরতা। যদি আমি কোনদিন বুঝি নিক আমাকে হেয় ভাবে অথবা আমাকে—তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে? আচ্ছা গুড নাইট।'

পরদিন সকালে কারমিন সবার আগে খাবার টেবিল সাজাতে গেল। মিসেস স্থরিল গ্রামে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁর ভাবী জামাইয়ের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। ছেলেটি লাজুক। বারান্দায় সে চুপ করে বসে আছে। মেয়েদের অট্টহাসিতে চারদিকে খুব হৈ চৈ চলছে। নিজেকে খুব হালকা লাগছে। এমন সময় খুব কম পাওয়া যায়। কিন্তু খুবই দামি এই সময়টুকু।

কারমিন অফিসে চলে গেল।

ম্যাগডালিনা বলল, 'আজকে তুমি বন্ধুদের দর্শনে গেলে শহরের অলি-গলি ঘুরিয়ে দেখাবে তোমাকে।'

'তোমার জন্য ক্যাডিলাক এসেছে ভাই।' রোজা বলল।

'ক্যাডিলাক?—উফ্', সমবেত ধ্বনি।

বার্নাডা যোগ করল, 'তোমার জন্য এমন সব দামি গাড়ি আসে যে আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।'

আমি ওদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সাবেক

এ্যাম্বাসাডর ডন গার্সিয়া ডেল প্রিডিউসের ওখানে দুদিনের জন্য যাচ্ছি। ড্রাইভার কালো ক্যাডিলাকের দরজা মোলায়েমভাবে বন্ধ করল। গাড়ি চলল সবুজ পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পার হয়ে।

স্পেনীয় কায়দায় তৈরি ডন গার্সিয়ার বাড়ি। উপজাতীয় চাকরানী বেরিয়ে এলো। বাটলার এসে দরজা খুলল। হলঘরের বারান্দায় ডন গার্সিয়া এবং তাঁর স্ত্রী ডোনা মারিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সারা ঘরে শাদা পাথরের মোজায়েক। সোনালি ফার্নিচার। দামি জিনিসপত্র। ঘরটা এমন যেমনটি লাইফ ম্যাগাজিনের রঙিন পৃষ্ঠায় ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন হিসেবে ছাপা হয়।

ডোনা মারিয়ার সাথে উপরে গেলাম—সেখানে কাচ ঘেরা বারান্দার এক-কোণে একটা ছোট দোলনায় মাস ছয়েকের একটি গোলাপি শিশু কাঁদছিল। এত ভাল লাগল বাচ্চাটাকে যে আমি ডোনা মারিয়ার কথা অর্ধেক শুনতে শুনতেই দোলনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, সজীব, সতেজ, কমবয়সী একটি আমেরিকান মেয়ে সোফা থেকে আমার কাছে উঠে এল।

'এ আমার বউমা', ডোনা মারিয়া বললেন।

দুপুরে খাবার টেবিলে মেয়েটির স্বামীও এসে গেল।

'এ আমার ছেলে হুজে'। গার্সিয়া পরিচয় দিলেন। হুজের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ হবে। হালকা রঙের জামা আর শাদা পাতলুনে তাকে বেশ দেখাচ্ছিল। স্ত্রীর প্রতি সে খুবই আকৃষ্ট। সন্তানকে খুবই স্নেহ করে। তাদের কথাই সে বলছিল।

রাতে সাজানো গোছানো শোবার ঘরে গেলাম। হঠাৎ আমার ওয়াই ডব্লুর আন্তর খসা দেওয়াল, খাট, মশারি, মিসেস স্থরিল, হলের রংজলা চেয়ারের কথা মনে পড়ল।

দুদিন পরে প্রিডুস পরিবার আমার সঙ্গেই রাজধানীতে ফিরে এলেন। মা বাবাকে টাউন হাউসে পৌঁছে হুজে আমাকে পৌঁছে দেবার জন্য ক্যাডিলাক স্টার্ট দিল। সে আর তার স্ত্রী মাত্র দুহপ্তা হল আমেরিকা থেকে ফিরেছে। কাস্টমসে তাদের এখনো মাল পড়ে আছে। সেগুলো তারা আনতে যাবে।

সবচেয়ে বনেদি হোটেলের সামনে হুজে গাড়ি দাঁড় করাল।

'তুমি এখানে ছিলে না?'

'না হুজে, আমি ওয়াই ডব্লুতে ছিলাম।'

'ওয়াই ডব্লু? গুড্ গড্, আশ্চর্য। আচ্ছা চল। কিন্তু তোমার কি এখানে জায়গা মেলেনি? তোমার উচিত ছিল এসেই ড্যাডিকে খবর দেওয়া।'

আমার হঠাৎ মনে হল আমি সর্বশ্রেণীর মানুষকে বিশেষ মানসিকতার নিরিখে একই সমতলে এনে ফেলেছি। হুজে এবং তার পরিবার এদেশের বড়লোকদের অন্যতম। ওয়াই ডব্লু আমার কেন এত ভাল লাগছে সে কথা এদের

বোঝানো যাবে না।

হুজে গলির মোড়ে এসে গাড়ি থামাল। আমি যখন ওয়াই ডব্লুর ভেতরে পৌঁছলাম তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি চুপি চুপি মশারীতে ঢুকলাম। কারমিন অন্য দিনের মতো চত্বরে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওর সিতানে গলির মিটমিটে বাল্বের আলো ঝলমল করছে।

সকালে চারটেয় উঠে আমি চুপিচুপি ভাঙাচোরা বাথরুমে গিয়ে আস্তে কল খুললাম। কিন্তু এত জোরে জল পড়তে লাগল যে, আমি চমকে উঠলাম। হাতমুখ ধুয়ে চুপিচুপি কামরায় এসে আসবাবপত্র বাঁধলাম যাতে কারমিনের ঘুম নষ্ট না হয়। অথচ তার মধ্যে চেয়ে দেখি সে আর চত্বরে নেই। কিছুক্ষণ পর এসে সে বলল নাস্তা প্রস্তুত। সে ট্যাক্সির জন্যও ফোন করে দিয়েছে।

'কেমন হলো সফর?' সে চা ঢালতে ঢালতে বলল।

'বড় ভালো।'

'তোমার এসব বন্ধুরা কারা যাদের কাছে তুমি গিয়েছিলে? একটুও ত বললে না।'

আমি কথা শুরু করেছিলাম। এমন সময় একটা কিছু মনে হতেই দৌড়ে স্যুটকেস খুললাম। বেনারসি শাড়িটি বের করে কাগজে লিখলাম, 'তোমার বিয়েতে আগাম উপহার।' তারপর শাড়ি ও কাগজ কারমিনের বালিশের নিচে রেখে দিলাম।

'ট্যাক্সি এসে গেছে।'

কারমিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল।

আমি ট্যাক্সিতে বসলাম। এমন সময় কারমিন ফটকের খিড়কি দিয়ে মাথা গলিয়ে চিৎকার করে বলল :

'আরে তুমি ত ঠিকানা দিয়ে গেলে না?' আমি চট্ করে একটা টুকরো কাগজে আমার ঠিকানা লিখে দিলাম।

আবার আমার হঠাৎ এক বিশেষ দরকারি কথা মনে পড়ে গেল।

'একেবারে হদ্দ করে দিয়েছি। কারমিন তোমার ওয়াই ডব্লু ত বিল দিল না।'

'অযথা বকোনা।'

'আরে, এতো তোমার বাড়ি না।'

'তুমি তো আমাদের মেহমান ছিলে?'

'বাজে বকোনা।'

'তুমি নিজেই বাজে বকছ। এখন ভাগো—নয়ত প্লেন হারাবে। আর শোনো, আমি যখন বিয়ের কার্ড পাঠাব তোমাকে আসতেই হবে। কোন ওজর আপত্তি শুনব না। ভেবে দেখো নিক তোমাকে দেখলে কত খুশি হবে।'

অথচ আমরা দুজনেই জানতাম এত দূরে এসে আর আমাদের দেখা হবে না।

ট্যাক্সি শেষ রাতের আবছা আলোতে এয়ারপোর্ট রওনা হয়ে গেল। প্লেন তৈরি হয়ে আছে। আমি কাস্টমস কাউন্টারে ফিরে এলে পেছন থেকে ডন গার্সিয়ার আওয়াজ এলো—

'নিক, আমি কিছু সিগ্রেট নিয়ে নি।'

'আচ্ছা ড্যাডি।'

এটুকু হুজের আওয়াজ। আমি চমকে পেছনে তাকালাম। হুজে মুচকি হেসে আমার দিকে এগোলো।

'দেখলে কেমন ঠিক সময় এসে গেছি।'

'নিক?' আমি মনের ভেতরে ডুবে যেতে যেতে বললাম 'তোমার অন্য নাম কি?'

'নিক। ড্যাডি যখন আদর করে ডাকেন তখন নিক বলেন, নইলে সবাই হুজেই ডাকে। কেন বলত?'

'না কিছু না', আমি তার সঙ্গে লাউঞ্জে চললাম। 'তুমি আমেরিকা কি করতে গিয়েছিলে?'

'হার্ট সার্জারিতে স্পেশালিষ্ট হওয়ার জন্য। তুমি ত জানই। কেন বলত?'

'তুমি কখনো তুমি···তুমি?'

'কি বলছ? কি হয়েছে? কি?'

'না কিছু না', আমার স্বর ডুবে গেল।

লাউড স্পিকার বার বার ঘোষণা করতে লাগল 'প্যান আমেরিকার ভ্রমণ-কারিগণ, প্যান আমেরিকার ভ্রমণকারিগণ···'

'আরে সময় যে আর নাই।'

হুজে ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল। ডন গার্সিয়া সিগ্রেট কিনে হাসতে হাসতে আমার দিকে এলেন। আমি উভয়কে খোদা হাফেজ জানিয়ে আরোহীদের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চলন্ত প্লেনের খিড়কি দিয়ে আমি তাকালাম, ডন গার্সিয়া আর নিক রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল দোলাচ্ছে। আর প্লেন ক্রমে উপরে উঠছে।

এখান থেকে অনেক দূরে ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা পরিবেষ্টিত পূর্ব সমুদ্রের এক দ্বীপ—যার নাম ফিলিপাইন। এবং তার সদা জাগ্রত রাজধানী ম্যানিলার এক জৌলুসহীন মহলের এক ভাঙা বাড়ির ভেতরে সরু নাকের এক ফিলিপাইনি ফেরেশতা মেয়ে থাকে। সে তার সন্তানের জন্য খেলনা জমাচ্ছে। আর তার প্রেমিকের প্রত্যাবর্তনের দিকে চেয়ে আছে। যে আসবে বলে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

কল্যাণী দত্ত

—

সে যুগের দাসীদিদিরা

আমাদের বেলেঘাটার বাড়িতে এক গা গহনা পরে বাসনপত্তর যে মাজত তার নাম ছিল গিরিবালা। কাজের মেয়ে বলার রেওয়াজ তখন ছিল না, আমরা সবাই ঝি বলতুম। সেজে-গুজে পরিষ্কার সাদা কাপড় পরে সে প্রথমে বাটনা বাটতে বসত, বিধবারা তার হাতের জল বাটনা খেতেন না। মেয়েরা বয়েস হয়ে গেলে রঙিন, ডুরে, বা ছাপা শাড়ি পরতেন না। আমাদের সে খুব যত্ন করত আর মাকে ভালবাসত এইটে মনে পড়ে। বাটনা বাটার পরে উত্তরের ছোট ছাতে মাছ কোটার পালা, কেষ্ট চাকরকে ডেকে নিত। কুচো আর পোনা মিলিয়ে এক টাকার মাছে ছাত বোঝাই হয়ে যেত। আমি একখানা ছোট্ট ভোঁতা কাটারি নিয়ে সেখানে বসে বসে কাক তাড়াতুম। বাসন মাজত ঝকঝকে, কাঁসার গেলাস থালা যেন সোনা, লোহার কড়ার দু' পিঠ জলজল করত। মাজার পরে ন্যাকড়া দিয়ে পুঁছে কড়ার পিঠে সরষের তেল মাখানোর পালা। আমাকে মাছ চিনিয়ে দিত কিন্তু পরদিন পর্যন্ত সে সব আমার মনে থাকত না। মাকে বলত—মা, তোমার এই ছোট্ট মেয়েটা একদম হাবা শুধু চিংড়িমাছ চেনে। আমি কত করে চেনাই, তবুও বলতে পারে না। মাছ চেনে না, শাক চেনে না, ডাল চেনে না—বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে তোকে ফিরিয়ে দেবে। আমি বলতুম আমি তোমার বাড়ি গিয়ে থাকব, শ্বশুরবাড়ি যাব না। রোজ একই কথাবার্তা। একদিন শুনে মা বললেন—দুর্গা দুর্গা ও আবার কি কথা। আমি তার বাড়ি যাব এই বায়না ধরে একদিন কেষ্টর সঙ্গে তাদের বাড়িতে গেলুম। কেমন যেন অন্য ধরনের মানুষ তারা। গহনাগাঁটি তো গিরিও পরে তবে এদের গালেতে রঙ্ কেন? কেউ কেউবা বিড়ি টানছে। ভয়ে ভয়ে কেষ্টর হাত ধরে চোখ বুজে রইলুম। কেষ্ট বললে—বাড়ি গিয়ে এসব কথা খবরদার বলবি না, তাহলে তোকে ফেলে আমি নিজের দেশে চলে যাব। কেষ্টর কৃপায় নিজের কুবুদ্ধিতে ছুটো চারটে মিথ্যে কথাও বলতে শিখলুম। বাড়ি বোঝাই মানুষ—যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত, কেউ বোঝার চেষ্টাও করেনি। দিন কাটতে লাগল, বেশ কয়েক বছরে আমি অনেকটা বড়ও হয়েছি।

গিরিবালা খুব বিপদে পড়ে একবার তার সোনার গহনা বিক্রি করতে দেয়

মাকে। মা সেই সোনা দেখে স্যাকরাকে ডেকে পাঠালেন বাড়িতে। স্যাকরা খানিক দেখে বলে 'অমুকলাল কে গো'? ঝিয়ের গহনা শুনে বললে—এ সব উৎপাতের গহনা কেন ঘরে রেখেছ মা? বিপদে পড়বে, হয়ত চোরাই জিনিস। এই গহনার দরুণ টাকা সে অনেক কম দেবে বলায় গিরিবালা মনের দুঃখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। মাসী পিসীরা বললেন—গেছে গেছে আপদ গেছে। বিদেয় কর বিদেয় কর, তার সেই সোনার তাগা কোন দিদি নিয়ে গেলেন কিন্তু তিনিও কম টাকাই দিলেন। বড়দিমণি কম টাকা দিয়েছেন বলায় মাও বিরক্ত হলেন। পিসীরা বললেন—সব আদিখ্যেতা। ওসব বজ্জাত মেয়েছেলেদের গহনা-গাঁটি কাঠি দিয়ে ছুঁতে নেই। বস্তির মানুষের সঙ্গে আবার অত মেলামেশা কিসের। বৌয়ের যেমন কাণ্ড ছিঃ ছিঃ, সবাই চুপ করে রইলেন। বাবা দাদাদের কানে যেন না যায়।

ক'মাস ছুটি নিয়ে সে শুয়ে রইল। কেষ্ট দেশে যাবার সময় বলে গেল—হাওড়ায় জানের বাড়ি গুণিয়ে দেখলে হয়। গিরি আর বাঁচবে না। নতুন চাকরকে অনেক বকশিসের লোভ দেখিয়ে খোঁজ নিতে পাঠালুম। ফল হলো না। বাড়িউলির নাম জানা নেই, গিরির ঘরে তখন মানুষজনও আসে না। আবার কিছুকাল পরে গিরির গঙ্গাযাত্রায় একটা কমবয়েসী টেরিকাটা ছেলে এসে সাহায্য চাইলে—বোধহয় দু' পাঁচটাকার বেশি দিইনি, শুচিবায়ুতে পেয়ে বসেছিল। একদিন বলেছিল, তুই আমায় গয়ায় পিণ্ডি দিস। তাও হয়নি।

চারুবালা আর একটি অল্পবয়েসী মেয়ে আমাদের কাছে কাজ করত। কোন এক বড় অফিসারের বেয়ারা ছিল তার স্বামী। প্রায়ই লিখত—বাবুকে বলে কিছু টাকা নিয়ে দোকান করবে তখন তাকে নিয়ে যাবে। একদিন সে বলেছিল দেশে থাকতে কলেরা হয়ে তার শাশুড়ী স্বামী আর একটা ছোট্ট ছেলে মারা গেছে। মা পুজো করতেন সেই ঘরের দোরে বসে পুজো দেখত। একদিন বললে মা আমাকে মন্তর দেবে। মা বললেন—রাম নাম কর তাতেই তোমার সব হবে। এত মানুষের সেবা করছ কখন পুজো করবার সময় পাবে। মায়ের একখানা এনলার্জ করা ফোটো ছিল সেইটের কপি চেয়েছিল। দেব দেব বলে দিতে পারিনি এখনও মনে আছে। মনে ধিধা ছিল সে বুঝতে পেরে বলেছিল—দাওনা, তোমাদের মা তো আমাদেরও মা। তবুও—

কালীদাসী ছিল শেষ কুড়ুনি মানুষ। খুব মিষ্টি স্বভাবের। তার পদবী সর্দার কিংবা পর্বত। তারা ক্যাওট মানে কৈবর্ত্য জেলে নয় হেলে। সেই বলেছিল তোমরা যে লেখাপড়া করো তাতে এসব থাকে না কেন? ১২ বছর বয়েসে সে বিধবা হয়। ভাইপোকে ভালবাসত তারই নামে শৈলর মা বলে তাকে আমরা ডাকতুম। একদিনও কামাই করত না। কড়ায়ের ডাল বাটতে শিখিয়েছিল আমাকে।

শিলের ওপর নোড়া এমনভাবে চেপে রাখতে হয় যে ছুঁচও গলবে না। একবার ডাল পিছলে গেলে সব মাটি। কলকাতা এসে দোকানে ডাল বাটার কাজ নিয়েছিল, মাস মাইনে আট আনা। অনেক ছড়া শিখিয়ে গেছে

তোর সন্নটাপায় কি হবে লো দুজ্জোধনের মা
সন্ন চাঁপার ছড়াছড়ি করেছে সেই কুন্তী নারী

তার জন্যে দুটো গান আমি শিখে নিই, তার অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও কী সুন্দর বোধ ছিল। একখানা রামায়ণ বই চেয়েছিল ছোট ভাইকে দেবে বলে। ছোট ভাইটা প্রত্যেক মাসে এসে তার মাইনে আগাম নিয়ে যেত দিদি মাত্র পাঁচটা টাকা দিত। বর্ষার দিনে বেলা দুটোর পর হঠাৎ একটু রোদ উঠলে বলত আকাশের যতুনী মেয়েরা চুল শুকোবে তাই তোমাদের ভগবান ছিঁচকে পোড়া রোদ দেয়। বারোমাস সে মাছ খেত শুধু একাদশী বাদ দিত। গঙ্গাসাগর মেলায় গিয়ে দেখে চার আনা পয়সায় এক মস্ত ভোলামাছ অনেকেই কিনছে, কিনতে গিয়ে শুনি সেই দিন আবার একাদশী তাই খাওয়া আর হলো না। বুড়ো হতে শরীর পড়ে গেছল হাত-পা কাঁপত মিষ্টি খাবার টাকা দিলুম কিন্তু থান কাপড় যেটা দিলুম সেটার খোল যাচ্ছেতাই। আর ছিল না ঘরে। মা বলতেন তোমার দেবার হাত নেই। হয়ত হবে। কবে স্নানযাত্রা কবে রথ কবে দোল সব তিথি সে আঙুল গুণে বলে দিত। অনেক পাঁচালী অষ্টোত্তর শতনাম সে আমাকে এনে দেয়। ঘুরে ফিরে তার কথা আজও মনে পড়ে।

রঙিলী বিশ্বাস

—

দাফন

১.

ফাল্গুনের দুপুর তার শেষমুখে। আকাশে বৃষ্টি হবে না এমন মেঘ। তার আস্তরণ ভেদ করে যতটুকু আলো আসে তাও মেঘজড়ানো, নেভা। ফলে খুব নরম আর সম্বলহীন দেখায় চারপাশ। আদিগন্ত এক হাওয়া বয় তার ওপর দিয়ে। মাঝ-ফাল্গুনের সেই গা কেমন করা হাওয়ায় সামনের কাঠবাদাম গাছের লাল হয়ে যাওয়া পাতাগুলো কেঁপে ওঠে খানিক। এমন সময় ওরা আসে। নিঃশব্দ বৃষ্টি পাতের মতো শোনায় ওদের গলার আওয়াজ। মাথার আবরণে, মুখগুলোয় দীর্ঘ গাছের ছায়া পড়ে এলোমেলো। ওরা কিছু দেখে না চারপাশে। যেন আচ্ছন্নের মতো হেঁটে যায় ধীরপায়ে। কাঁধবদলের সময় শুধু দু-এক মুহূর্ত ওপরে তাকালে ওদের ভিজে চোখের ওপর এসে লাগে বিকেলের আলো।

উত্তর-দক্ষিণমুখী গর্তটা মানুষপ্রমাণ। তার মাঝে দাঁড়িয়ে কাজ সারে হাসমত, সিরাজুল আর দুখে। নির্বিকার কোদালের ঘায়ে ছিটকে ওঠে মাটি, ঘাসচাপড়া, কখনও আনাড়ি কোনো কীট। ওপাশে মাটির স্তূপের ওপর পড়ে আছে উপড়ানো সন্ধ্যামালতী আর শিয়ালকাঁটার খানতিনেক গাছ। বাহকেরা এসে দাঁড়ায় তার পাশে। আতর আর অগুরুর মিশ্রিত গন্ধে হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে বাতাস।

তাবুতে রাখা শবদেহের বক্ষস্থলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘদেহী ইমাম নুরুল ইসলাম। পেছনে সারবদ্ধ হয়ে অন্যান্যরা। মন্দ্রসপ্তকে ইমামসাহেবের গলা শোনা যায় 'আল হামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন…' তাঁকে অনুসরণ করে বাকীরা। সমবেত সেই দোয়াদরুদ পড়ার শব্দ হাওয়ায় টালমাটাল চেরা নারকেল পাতার মতো বিদ্ধ করে চারপাশ।

গর্তে শোয়ান শব এখন আর দৃশ্যমান নয়। গর্তের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা বাঁশের খণ্ডগুলির ওপর চাটাই পাতা রয়েছে। দু-হাতের মুঠোয় মাটি নিয়ে সমবেতস্বর বলছে 'মিন্‌হা খালাক নাকুম'—আমি এই মৃত্তিকাদ্বারা তোমার আদিপুরুষ আদম অর্থাৎ তোমাকে তৈরি করেছি।

'ওয়াফিহা নুইদকুম'—এবং এই মৃত্তিকার মধ্যেই তোমাকে ফিরিয়ে আনলাম।

'ওয়ামিন্‌হা নুখ্‌রেজোকুম্‌ তা রাতান উখরা'—এবং এই মৃত্তিকা হতেই (একদিন) তোমার পুনরুত্থান ঘটাব।

আতর-গোলাপজল ধূপের গন্ধ ঘেরা গোরটিকে ফেলে সন্ধ্যা নামার আগে ফিরে গেছে সবাই। দমকা হাওয়া ওঠে একবার। গোরস্থানের অযত্নে বেড়ে ওঠা আমগাছগুলির গা থেকে তখন নিত্যিকার বউল ঝরে পড়ে অনেক। এপাশে-ওপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাজারগুলির নানা রঙের আলো একে একে জ্বলে উঠলে এসময়, আধো অন্ধকারে, বিন্দু বিন্দু আলোর অবয়বের পাশ দিয়ে আসা উত্তাল হাওয়ায় যেন স্পষ্ট শোনা যায়—

ইন্না-লিল্লা-হি-অইনা-ইলাইহি-রাজিউন…

আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

২.

অল্প একটু বৃষ্টির পর আজ পুবের ঘাসজমি পেরোতে ভাল লাগে। 'বেগম তামিজুদ্দীন খান, ইন্তেকাল ২৩ অক্টোবর, ১৯৩৯' পার হয়ে আসেন সৌরীন। পাশেরটা ভাঙাচোরা, ঘাস আর অবিন্যস্ত জংলী গাছে ভরা, মাঝ বরাবর উঠে গেছে ডুমুরগাছ। তারই একধারের ঘাসের রুক্ষ মাথাগুলো সরালে আবছা হয়ে যাওয়া ফলকটা চোখে পড়ে—'আবদুল কাদির মাস্টার, মৃত্যু ১৯৫৯, জন্ম—হাটগাও, নোয়াখালি।' সৌরীন বসে পড়েন তার পাশে। মুখোমুখি ডালপালা ছড়ানো প্রাচীন শিরীষের দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজেন। হাটগাও, আবদুল-পুর, শিবচর, সোনাইমুড়ী—এইসব নাম অথবা এ মুহূর্তে ঘনসংলগ্ন সমাধিক্ষেত্র ঘিরে একহাত ধানছড়া ঘাসের গায়ে নরম তুলোর মতো সাদা সাদা ফুল, অদূরে কেয়াঝোপ, ভিড় করে থাকা কুল, জামরুল, কদম আর কাঠকরবী, কখনও ক্ষিপ্র সতর্ক বেজির যাতায়াত—চক্রাকারে ঘুরে যায় ঘাসের কটা কীট, শরীরে তখন আবহমান চন্দ্রোদয়ের মতো জন্ম নেয় কি; মেঘে মেঘে শব্দ ওঠে অস্পষ্ট। সৌরীন দাঁড়াতেই দ্যাখেন 'ডাক্তার মাহবুব আলি খান', কাঁচাপাকা চুলের মধ্যে অন্যমনস্ক আঙুল সৌরীনের, 'গ্রাম রসুল্লাবাদ, নবীনগর, ত্রিপুরা, মৃত্যুসন: ১৯৩৬'। অন্য কেউ এত দ্রুত দেখত না। আড়াল ছিল গাছের। কিন্তু তার কথা স্বভাবতই স্বতন্ত্র এই নিরন্তর দিনরাত্রিযাপন যাকে চিনিয়েছে গোরস্থানের প্রতিটি ধূলিকণা আর মৃত্তিকাবিন্দু, এর আলো-হাওয়া-বৃষ্টি-মেঘ, সমাধিক্ষেত্রের ভিজে মাটি, ঘাস আর ঘাসনিঃসৃত ঘ্রাণ। যেমন এখন মাহফুজার রহমানের কবরের ওপর জুঁইগাছ দোল খাচ্ছে হাওয়ায়। ফলে যন্ত্রাইল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা শব্দ তিনটি সময় সময় দৃশ্যমান বা নয়। পাশে মাটিতে আগাছার ঝাড়ের মধ্য থেকে মাথা তুলেছে বাবলা, বনবেগুন আর আমাদের দেশে যাকে বলে হাতীশুরার

পাতা, দেশ বলতে ধলেশ্বরী পার হয়ে অধুনা ঢাকা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া জেলা মাণিকগঞ্জের সিঙ্গাইর সাবডিভিশন। বাবা ছিলেন প্রতাপশালী ছোট জমিদার—অধিকাংশ মুসলমান আর অল্প ক'ঘর হিন্দু প্রজার ভাগ্যনির্ধারক। সেই দালান-বাড়ি এখন ভেঙেচুরে আর কিছু নেই। পরপর তিনবারের বন্যায় মাণিকগঞ্জ ভেসে গেছে একেবারে। বিঘার পর বিঘা জমি বালির তলায় চাপা পড়ে রয়েছে এখনও, ক্ষেত ছেড়ে বালির ব্যবসায়ে নেমেছে লোকজন, চারধার ধূ-ধূ শ্মশান, সবুজ চোখে পড়ে না কোথাও একছিঁটে। সেবার বন্যায় লাশ ভেসে এসেছিল অগুণতি। গোর দেওয়ার জায়গা কোথায় অত? হরেদরে জালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিঙ্গাইর আর দাহক্ষেত্র শব্দ দুটো মেলাতে গিয়ে হঠাৎ ঝটকায় ঘোর ভাঙে। ঘুঘু ডাকছে আশপাশ থেকে।

বাঁশের খুঁটির বেড়া। ওপরে চলকা ওঠা টিনের ছাউনি। নিচে মাটির কবর। বাইরে খুঁটির গায়ে টিনের পাতে লেখা:

দরগা শরীফ
হজরত মৌলানা আলহাজ সুফী-পীর
আবদুর রহমান খান
১৬ বি. বি. বাগান লেন
মৃত্যু—২১ আগস্ট, ১৯৮৭—২৫ জেলহজ হিজরী, ১৪০৭ অনুযায়ী।

চাঁদতারা সম্বলিত রুপোলি জরির ঘন কারুকাজে ভরা সবুজ এক আচ্ছাদন বিছিয়ে দেওয়া তার ওপর। তার পাশে খুব ম্লান দেখায় অল্পদূরের অপুষ্ট, আধ-শুকনো ঘাসগুলোকে। খুঁটির এককোণে একগুচ্ছ ধূপ পুড়ছে। তার তীক্ষ্ণ গন্ধ মাথায় এসে লাগে। তাছাড়া এ মুহূর্তে ছায়ারও প্রয়োজন। সৌরীন জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে যান। ম্লান আর জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ওঠে কোথাও। এখন গাছের সার আর জমির ঢাল দেখে বোঝা যায় বড় পুকুরের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন সৌরীন। সারবদ্ধ নারকেল-সুপুরির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে বাচ্চাগুলো একমাথা জল নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওপাশে পাশাপাশি দু-তিনটে ডেওয়া ফলের গাছ। ওরা ঢিল ছোঁড়ে একটানা। ফল ছিঁড়ে পড়ার ভারী শব্দ হয়।

জঙ্গল আরো ঘন হয়েছে এরপর। দু-তিনহাত উঁচু কাঁটাঘাস, শীষ উজিয়ে থাকা আগাছা, শেয়ালকাঁটা, মনসাকাঁটার ঝোপ, কবরগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তার মধ্যে। টগরের কুঁড়ির শুকনো মালা, আধজ্বলা ধূপের টুকরো, পোড়া মোমের সলতে ছড়িয়ে আছে এদিকে-ওদিকে। জঙ্গলের প্রকোপে কোন কবরই আর দৃশ্যমান নয় এখন।

ভাঙা সমাধির গা থেকে ঝুলছে শুকনো মরা ঘাস আর দু-চারটে লতানো গাছ। রোদ পড়ে এলে দক্ষিণের হাওয়ায় খুব অস্পষ্ট, শিরশির আওয়াজ ওঠে

ওখানে। বিবর্ণ, ফ্যাকাসে, নিম্নমুখী ঘাসগুলো তখন অল্প নড়ে সে হাওয়ায়। আর রক্তের মধ্যে যেন ঘুম ভেঙে ওঠে গাঁয়ের কাত্যায়নী মন্দির—দেবী ছিলেন জাগ্রত—মুখটা যেন এখনও আবছা মনে পড়ে, মনে পড়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ানো আগ্রাসী বুনো গাছ আর ভাঙা চালে অশ্বত্থচারা···

'স্বর্গীয় আহাদেন্নেসা'—সোনাঝুরি গাছ থেকে পাতা ঝরে স্তূপ হয়ে আছে সামনের মাটি। গোরস্থানের চূড়ান্ত পশ্চিমে এখন মরে আসা রোদের তেজ আর এক সর্বগ্রাসী নৈঃশব্দ্য। পেছনে ডোবা থেকে স্নান সেরে উঠে যায় দিনমজুর দুটি মেয়ে। কতদিন আগে ঘাসজঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই টিনের পাতে তেতে ওঠা 'স্বর্গীয়' শব্দটা চোখ কেড়েছিল আচমকা। আহাদেন্নেসার মাটির কবর শাসনহীন বেড়ে ওঠা আকন্দ, শ্যাওড়া আর বিবিধ লতাগুল্মের ঝাড়ে অদৃশ্য ছিল তখন। সেদিন তাকে খুঁজে বার করেছিলেন সৌরীন। সযত্নে উপড়ে দিয়েছিলেন অযথা ভিড় করে থাকা বুনোগাছের স্বেচ্ছাচারী হাত-পাগুলো। ক্ষয়া টিনের ওপর ক্ষুদে অক্ষর ক'টা—পোস্টাপিস দেবীগঞ্জ, দিনাজপুর—কেমন করুণ দেখাচ্ছিল সেসময়। তখন দুপুরবেলা আর জামজামরুলের আড়াল থেকে এক টানা ভেসে আসত কুবোর ডাক···

একটানা উঁচু পাঁচিল যা বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে গোরস্থানটিকে, দক্ষিণ-পশ্চিমে তার একদিকের ধার ঘেঁষে আতাহারা-আকমলের যুগ্ম সমাধি, অন্যপাশে রেলের লাইন। দীর্ঘ নিশ্চুপ দ্বিপ্রহরের মাঝখানে কখনও হৃদস্পন্দনের মতো ধকধক আওয়াজ তুলে যায় মালগাড়ি, হুইশেল দেওয়া লোকাল ট্রেন। সামনে নিশিন্দা গাছের পাশ দিয়ে ঘাস মাড়ান অপরিসর পায়ে হাঁটা রাস্তা। তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চকিতে একবার পেছন ফেরেন সৌরীন। সার সার পামগাছের ফাঁক দিয়ে এখনও দূরে দেখা যায় নারকেল-খেজুরের ছাউনি আর মূলীবাঁশের খুঁটির নিচে মাটিতে পাশাপাশি শায়িত আতাহারা-আকমল। কবরের ওপর গোলাপী আচ্ছাদন দুটো, যা এখন মাটিরই অংশপ্রায়, অল্প উড়ছে হাওয়ায়।

তালগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কায়সার। সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্ত অবধি এমনই থাকবে। গোরস্থানযাত্রীদের কাছে গিয়ে একে একে জিজ্ঞাসা করবে কারুর কবরে মাটি লেপে দিতে হবে কিনা। 'পানী ভী নহী দেনা হ্যায়?' প্রত্যাশিত 'না' শব্দটা নিয়ে আলো নিভে আসা অবধি অপেক্ষা করবে কায়সার। আজ সিরাজুলরা নেই। নতুবা এটুকুও গোপনে করত ও। সৌরীনকে আসতে দেখে অদ্ভুত চোখে তাকায়। 'কায়দার আজ ভী কাম নহী মিলা?' 'নহী বাবু।' চারনম্বর পুলের ওপারে ওর ঘর। সেদিকে অনির্দিষ্ট দৃষ্টি মেলে বলে 'কুছ খানেকো দো না, ভুখ লগী হ্যায়।' 'অভী তো কুছ নহী হ্যায় মেরে পাস। বাদমে ঘরমে আও।' ছায়ামূর্তির মতো গাছের গা ছেড়ে চলে যায় কায়সার। ওর মাথা দিয়ে

আড়াল হওয়া 'চারঘুড়ি মার্কা কেওড়া গোলাপজল ব্যবহার করুন' বিজ্ঞাপনটি এবার স্পষ্ট হয় তালগাছের অপ্রশস্ত কাণ্ডে। ওদিকের জনবিরল প্রবেশপথের মুখে দাঁড়িয়ে একবার ফিরে তাকান সৌরীন—পশ্চিমের খণ্ড লাল মেঘ আর পাম-ইউক্যালিপ্টাসের উঁচু মাথাগুলোর মধ্য দিয়ে অনেকদূর দেখা যায় এখনও, হজরত বাবা হাসান রাজার মাজার শরীফের সেই বিষণ্ণ হলুদ আলো অবধি। সৌরীন বেরিয়ে আসেন ধীরপায়ে।

৩

কায়সার দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। হাতে আখরোটদানার মতো গোলাপী একগোছা ফুল। অপর্ণা বাটিতে করে রুটি-তরকারি এনে দেন ওর হাতে। 'কি ফুল কায়সার?' 'কুছ নহী মাঈজী জঙ্গলমে যো হ্যায়—' অপর্ণার হাতে গোছাটা দেয় কায়সার। 'ওটা বুনোফুল নয় অপর্ণা, আমি ওর নাম জানি না কিন্তু বুনোফুল নয়। আর কায়সারকে জিজ্ঞাসা কর কেন তুমি, সব ফুলই এক ওর কাছে' প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে যান সৌরীন। এ মুহূর্তে ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় Anjuman Mufidul Islam pauper burial ground-এর অফিসঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কায়সার। হয়ত ঘরের মধ্যে থাকা তাবুতের দিকে তাকাল একবার। ডানহাতে রুটি, বুলো বাঁহাত অদ্ভুত ছন্দে উঠছে নামছে চলার সঙ্গে। ·····কতক্ষণ হাঁটছেন সৌরীনও ওর পিছু—অনিদ্রাজনিত ভারগ্রস্ত পা নিয়ে। কায়সারকে আর দেখা যায় না এখন। অথচ কিছুক্ষণ আগেও কাঁচামাটির দুটো অপ্রশস্ত রাস্তা যেখানে মিলেছে—বাতিস্তম্ভের গাঢ় হলুদ আলো পড়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা বৃত্তাকার অংশটুকু—সেখানেই দাঁড়িয়েছিল ও। যদিও চারপাশে আর কিছু ছিল না একটানা ঝিঁঝির ডাক ছাড়া, রাত্রি নেমে আসায় সোঁতবিহীন পশ্চিমের ডোবার জল কালো হিম লাগছিল। হয়ত শেষপ্রান্তের বাবলাগাছ ঘিরে রাশ-রাশ জোনাকির ভিড় আর অনির্দিষ্ট বাতাসে উঁচু গাছের পাতাগুলোর গায়ে গা ঘেঁষা যুদ্ধ করে থাকবে ওকে। এখন এই আধ-অন্ধকারে, অল্প বৃষ্টিপাতের মধ্যে সবকিছুকেই অভিন্ন লাগে সৌরীনের—এই ধ্বসে পড়া সাবেকি কবরগুলোর মুখ আর চারপাশে স্তব্ধ হয়ে থাকা অজস্র জংলী গাছ, মাটির ওপর শায়িত শয়ে শয়ে সুসংবদ্ধ কবর আর একগলা ঘাস ডিঙিয়ে যেতে হয় যার কাছে সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জানবাজারের জোহরা বানু—এ পর্যন্ত সবকিছু। অন্ধকার মাদকের মতো ঢুকে পড়ে মাথায় এখন, চারিয়ে যায় মধ্যপঞ্চাশের সমগ্র অস্তিত্বে। এই তো সেদিন কে ছিল নাম জানি না তবু তার কবরের ওপর মাদারগাছে হাত রাখতেই কাঁটা ঢুকে গেছে সজোরে আর তখনই চোখে পড়ল মাদারফুল কি অসম্ভব লাল। আগে কি কখনও দেখিনি এসব, আর এখন? এখন আর তাবৎ

অন্ধকার ছাড়ানো যায় না মাত্র এই দুই হাতে, উপড়ে ফেলা যায় না কাঁটার মতো উপর্যুপরি টানে। একথা ভাবতে ভাবতে ট্রেন যায়। বিবর্ণ আলোর চৌখুপী পড়ে পাঁচিল জোড়া। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ও কোণ দিয়ে কয়েকজন মানুষ দৌড়ে এল। চলমান আলোর শরীরগুলি তারপর মিলিয়ে যায় একে একে। পাঁচিলের মধ্যভাগের হাঁ হয়ে থাকা অংশটা এখন ভয়ংকর দেখায়। রেললাইন থেকে অনুপ্রবেশের ওটাই এখানকার সহজতম পথ আর সে পথ দিয়ে ঢুকে প্রথমেই পড়ে শিরিনের সমাধি। শিরিন বস্তুত শিশুশব। তবু এত অরক্ষিত। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুঁতে ইচ্ছে করে ওকে। যেন এভাবেই আগলে রাখা যাবে। ভিজে মাটির শক্ত ত্বক বেয়ে যা উঠে আসে তাতে ক্রুদ্ধ চাপা একটা উত্তাপ থাকে মাত্র। দিনরাত্রির উৎকণ্ঠা যেন দীর্ঘশ্বাস হয়ে ছোঁয় সৌরীনের হাত।

তেঁতুলগাছটা বেঁকেচুরে ত্রিভঙ্গ হয়ে রয়েছে যেখানে, কয়েকটা দলচ্যুত বাঁশগাছ একধারে, তার মধ্য থেকে কাঁপা আলো আসে। সৌরীন দ্রুতপায়ে হাঁটেন সেইদিকে। পথভতি গাছের ছায়া হাওয়ায় দুলছে। আলোর উৎসস্থল উত্তরের কোণের ছোট মাজারটিতে পৌঁছতে মুহূর্তাধিক সময় লাগে না। চাতালের ওপর মাটিছোঁয়া গাছের ডাল। তার একপাশে ছোট ঘরটার মধ্যে মোমের অল্প আলোয় সমাধির ওপর লাল কাপড়ের আবরণ কেমন অস্বচ্ছ দেখায় আজ; চারকোণে সমুদ্রশঙ্খ, ধূপ জলছে আর শুকনো ফুল, কী যেন মনে পড়ে হঠাৎ, কার মুখ, মাত্র আজই সমাধিস্থ হল কি? শেষবারের মতো কাফন তুলতেই রক্তশূন্য মধ্যবয়সিনী। না সে তা হতেই পারে না। আর দেখো স্মৃতিও কি ভীষণ প্রতারক, ওর আদলটুকুও আর মনে আসে না এখন। অথচ এই যেন সেদিন চলে গেছে। আর বলো হাঁটতে হাঁটতে এ কোথায় এলাম মধ্যপঞ্চাশ, সামনে দেখি কুলগাছ, জোনাকির মতো আলোকবিচ্ছুরণ, জিব্রাইল তার ওপারে যেতেই বিন্দু বিন্দু আগুন বিঁধে উঠেছে ডানায়, ক্ষতচিহ্ন আর ক্ষতচিহ্নের শেষে এই মাটিতেই যার অন্তিমশয়ান তার মস্তিষ্ক ফুঁড়ে উঠেছে ঘোড়ানিম—

অপর্ণা মৃদুস্বরে ডাকছেন 'শুনছ ছাখো বাইরের ঘরে কারা এসেছে—একি এরকম ঘেমেছ কেন, শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

'না, কিছু নয়। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ। আচ্ছা অপর্ণা, তোমার মনে আছে পূর্ণিমাকে কেমন দেখতে ছিল? আজ বহু চেষ্টাতেও মনে করতে পারলাম না জানো—মেয়েটা কবে চলে গেল তাও না।'

অপর্ণা চুপ করে রয়েছেন অন্ধকারে। 'না তুমি বলো, এ ক্ষয়প্রাপ্ত স্মৃতি নিয়ে আমি কী করব, একদিন যদি তোমার মুখও ধ্বসে যায় এভাবে, তমালকেও আর মনে পড়ে না আমার, জরাগ্রস্ত, জড়বোধ শুধুমাত্র খাদ্যসন্ধানী অশীতিপর কোনো শরীর যদি সেদিন ঘুরে বেড়ায় তোমার রান্নাঘর থেকে ঘরের সামনের ঐ সমাধি-

ক্ষেত্র? তুমি চলে যাচ্ছো অপর্ণা, কিন্তু শোনো আমি বলছি আর সত্যি বলছি জেনো, আজ মনে হয় পূর্ণিমা কোনো অর্থে আমাদের অসতর্ক প্রয়োগ ছিল জীবন-বোধের। না, বোঝাতে পারছি না হয়ত তোমাকে। আচ্ছা, তোমার মনে হয়নি কখনও, এমন কেউ ছিল না কোথাও? আমাদের ব্যর্থ অতীত আর অক্ষম ভবিষ্যতের মাঝখানে শুধু ধ্বংসস্তূপের মতো জন্ম নিয়েছিল কে, যেন স্বপ্ন থেকে? হ্যাঁ স্বপ্ন থেকে। অথচ স্বপ্নপ্রসূত কথাটাও আর সহ্য হয় না এখন, কারণ স্বপ্নেরও একটা আগুন থাকে—আমরা তার বহু আগেই দগ্ধ করেছি নিজেদের।'

৪.

তখনও খুব ভোর। অমিয়দারা এলেন। 'সৌরীন একটি মেয়েকে রাখবে?' দরকার তো ছিলই খুব। তমাল ততোদিনে চলে গেছে বিদেশে। অপর্ণা মুখে না বললেও বোঝা যেত এই নিস্তব্ধ পাড়ায় দিনের অধিকাংশ সময় একা কাটানো অসহনীয় হয়ে উঠেছে ওঁর। পরদিনই পূর্ণিমা এসেছিল এ বাড়িতে।

সৌরীন চোখ বোজেন অন্ধকারে। ক্রমশূন্য, পারম্পর্যহীন স্মৃতিগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে মাথায়। প্রাণপণ মনে করার চেষ্টা করেন মুখ—অন্ধকার আবারও গ্রাস করে, তবু যেন আবছা মনে পড়ে এবার—কালো আর রোগা, খানিকটা অস্বাভাবিক রকমের রোগা, জলের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণিমা। সেই বোধহয় প্রথমদিন আর সেদিনই সৌরীন লক্ষ্য করেছিলেন মেয়েটির চোখদুটো অসম্ভব অস্থির। কিছু যেন খুঁজছে সবসময়। 'তোমার নাম পূর্ণিমা?' নিস্তব্ধতা ভেঙে সৌরীনই বলেছিলেন আবার 'যদি নাও হয় তবু পূর্ণিমা বলেই ডাকব কেমন?'

ক'দিন পর সকালে অপর্ণা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন। সম্ভবত কোনো কাজই সুসম্পন্ন হচ্ছিল না সেদিন কারণ অপর্ণার গলা উত্তরোত্তর চড়ছিল। সৌরীন বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার কাছে যেতেই চিৎকার শুনলেন কথার উত্তর দিতে পারো না, তুমি কি বোবা?' এটা সত্যি আশ্চর্যের। প্রথম এক দুদিন দুজনেই ভেবেছিলেন মেয়েটির জড়তা কাটছে না কোনো কারণে। কিন্তু ক্রমশ বোঝা গেল এটা ওর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। এমনকী সৌরীনের একথাও মনে হয়েছিল যে পূর্ণিমার এই কথা-না-বলাটা প্রায় ধর্মীয় আচরণের পর্যায়ের। সমস্ত প্রতিরোধের মধ্যেও সাধ্যমতো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকে ও। তবু অপর্ণার সঙ্গে এরমধ্যে ভাব হয়ে গিয়েছিল এক ধরনের। সারাদিনের কাজ সেরে ক্লান্ত-শরীরে ওই নিষ্প্রাণ বাড়িতে দুজন মানুষ—একজন কথা বলে, আরেকজন বলে না—তাদের মধ্যে যতদূর যোগাযোগ সম্ভব সৌরীন এখন কল্পনা করে নিতে পারেন তা হয়েছিল। কারণ গরমের দুপুরে কখনও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলে দেখা যেত মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে অপর্ণা জামার হাতে ফুল তুলতে তুলতে তমালের

শৈশবের গল্প করছেন অথবা খুলনা শহরের বাড়িতে ওঁর বিয়ের আগেকার জীবনের কথা—পূর্ণিমার চোখ তখন হাওয়াহীন গাছের ছায়ার মতো স্থির, মগ্ন দেখাত। অপর্ণা সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠতেন 'পুণি, সত্যি করে বলবি আজকেও তুই স্নান করিস নি না?' পূর্ণিমা চোখ নামিয়ে নিত দ্রুত। 'তোকে না কতদিন বলেছি নোংরা থাকবি না। এ বাড়িতে তোর কিসের অভাব হচ্ছে বল।' নিরুত্তর পূর্ণিমা স্বভাবসিদ্ধ হেঁটমুখে বসে থাকত মেঝেয়।

তো অপর্ণা এই মানুষ করার প্রক্রিয়াটা দ্রুত সেরে নিতে চেয়েছিলেন। হয়ত পূর্ণিমার আপাতবাধ্যতা কোথাও উৎসাহী করেছিল অপর্ণাকে। হয়ত পূর্ণিমার একরাশ রুক্ষ চুল আর অসম্ভব অস্থির চোখ, তমাল যে দূরে চলে গেছে সেই শূন্যতা, সংসারের সঙ্গে ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় প্রতিদিন আরো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার বোধ—এই সমস্ত সংগত এবং অসংগত কারণে মেয়েটির প্রতি বাস্তবিক মায়া অনুভব করেছিলেন অপর্ণা কোথাও।

অব্যবহৃত গাঢ় নীল রঙের শাড়ী ছিল অপর্ণার একটা। বেশ মনে পড়ে কিছুদিন পর ভোরবেলায় উঠে বাসি কাপড় ছেড়ে সেইটা গায়ে জড়াত পূর্ণিমা। কলতলায় কাঁড়ি কাঁড়ি বাসনের সামনে ঐ অসম্ভব বেমানান নীল রঙ—একদিন খুব সকাল তখনও, শীতকালের সকাল—ভোরের আলো ডানা গুটিয়ে আছে চারপাশের মধ্যে। 'অপর্ণা, আমি একটু আসছি' বলে বেরিয়ে পড়েছিলেন সৌরীন। 'জ্বরগায়ে এই সকালে কি না বেরোলেই নয়?' অপর্ণার নীচু অথচ দৃঢ়স্বর কানে থাকতে থাকতেই রাস্তা পার হয়ে এসেছিলেন গোরস্থানে প্রবেশ-পথের শিমূলগাছটার গোড়ায়। সামনে দু'পাশের ঘাস জমিকে অগ্রাহ্য করে রেল স্টেশনের দিকে চলে যাওয়া পথ—মাথার ওপর শ্বাসরোধকারী কুয়াশা, জরক্লিষ্ট মুখে সৌরীন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বহুক্ষণ। দু'একজন স্টেশনযাত্রী পাশ দিয়ে চলে গেলে সকালবেলার রোদ্দুর ওঠে কখন অজান্তেই। পুবের গাছপালারা চকিতে সে রোদ্দুরে শরীর মেলে যেন আহ্বান করে সৌরীনকে। এমন সময় দেখেন ওরা দুজন—অপর্ণা আর পূর্ণিমা। অপর্ণা সকালের রঙের শাড়ী পরেছেন, পূর্ণিমার গায়ে সেই অপার্থিব নীল রঙ। 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' চেঁচিয়েও উঠতেন হয়ত যদি না নীল শাড়ী সহসা মুখ ফিরিয়ে ফিরতি পথের ঘড়ি-বাঁধা লোকটিকে উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করে উঠত, 'টাইম কতো হল গো দাদা?'

গোরস্থানে ঢুকতেই বাঁদিকের রাস্তার একপাশে আব্দুল ওহুদের ওপর বেড়ে ওঠা দুরন্তের নয়নতারা গাছদুটোতে বারোমাস চোখ মেলে থাকত ক'টা রুগ্ন ফুল। একদিন বিকেল গড়াতে না গড়াতে তার সিমেন্টে বাঁধানো ধারটুকুয় এসে বসেছেন সৌরীন। পায়ের কাছে ভিড় করে এসেছে রাজ্যের কষপাতা গাছ। তা থেকে একটা পাতা টেনে ছিঁড়ে নিতে বোঁটার গা বেয়ে দুধ গড়িয়ে পড়ে হাতে।

কী মনে হওয়ায় হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দেখেন পূর্ণিমা দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। বিস্ময়ে 'তুই এখানে' বলতে গিয়েও থেমে যান সৌরীন। কোথা থেকে পূর্ণিমার মুখে অদ্ভুত এক আলো এসে পড়েছে সেসময়। আর ওর কখনও স্থির না হওয়া চোখ কোনো বিশেষ কিছুর প্রতি নিবদ্ধ, অপলক। পূর্ণিমা তাকিয়েছিল সামনের পুকুরপাড়ের তারেক মল্লিকের সমাধির ওপর মাটির পোকাদের ব্যস্ততার দিকে অথবা দক্ষিণে কোনাকুনি তাল-নারকেলের সার পেরিয়ে আরো অনির্দিষ্ট কোথাও। হয়তো আকাশের হাল্কা মেঘ দেখছিল পূর্ণিমা, মাটির কাঁটাঝোপ, জল থেকে উঠে আসা হলুদ রঙের সাপ জঙ্গলে মিলিয়ে গেল এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনা-মাত্র কিন্তু সেইদিন সেই আসন্ন সন্ধ্যাকালে হাওয়া আর গাছেদের মৃদু কথোপ-কথনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল আজ এ মুহূর্তে কথা বলে উঠবে পূর্ণিমা। অনেক কথা। সৌরীন অপেক্ষা করেন। এক এক মুহূর্ত। মাঝ আকাশ বরাবর কী পাখির ঝাঁক যায়। চকিতে সম্বিত ফিরে পেয়ে সৌরীনের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পায় পূর্ণিমা। আর সম্ভবত এ কারণেই দুটো অস্পষ্ট শব্দ বেরোয় ওর গলা দিয়ে—'দাদা চিঠি'। খামটা নেন সৌরীন। অপর্ণা পাঠিয়েছে। তমালের হাতের লেখা ওপরে। এ পাড়ায় মাঝে মাঝে বিকালে পোস্টম্যান আসে। চিঠিটা হাতে নিতেই বোঝা যায় সংক্ষিপ্ত, কারণ ভার নেই কোনো। দ্রুত পড়েন সৌরীন। তারপর ফেরত দেবার জন্য মুখ তুলতেই অবাক হয়ে যান। পূর্ণিমাকে দেখা যায় না আশেপাশে। 'পূর্ণিমা' সৌরীন ডাকেন একবার আস্তে, তারপর জোরে। উত্তর নেই কোনো। কী আশ্চর্য। সৌরীন উঠে দাঁড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে যান। কেমন ভয় করে ওঠে হঠাৎ। শেষে পুকুরের পাশ দিয়ে সরু রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে ডানদিকে তার পাশে একটি ধ্বস্ত সমাধির ওপর বসে থাকতে দেখা যায় পূর্ণিমাকে। হঠাৎ প্রবল রাগে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে সৌরীনের। মনে হয় সবকিছুকে খুব বেশি মেনে নেওয়া হয়ে গেছে। অদ্ভুতত্বকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে সীমাহীন। 'ওখানে কী করছ তুমি? চলে এস এদিকে' চিৎকার করে ওঠেন সৌরীন। নিজের গলার স্বর ভয়ংকর কানে লাগে নিজেরই। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছিল পূর্ণিমা। খুব আস্তে পা ফেলে গিয়েছিল বাড়ির দিকে। শেষ বিকেলের আলো এসবের মধ্যে সম্পূর্ণত অন্তর্হিত হয়েছিল আশপাশ থেকে, কেউ বুঝতে পারেনি কখন।

দিনযাপনের একটা নিজস্ব সহনীয়তা থাকে বোধহয়, চারপাশকে নিয়ত সমতল করে দেবার কোনো অনিবার্য প্রক্রিয়া। তেমন করে পূর্ণিমা একইসঙ্গে গ্রহণ আর পরিহারযোগ্য হয়ে উঠছিল এ বাড়িতে। অপর্ণার অভিযোগের সংখ্যা বাড়ছিল প্রতিদিন, অথচ অপর্ণা আর আগের মত অস্থির হতেন না তা নিয়ে। পূর্ণিমার প্রতিক্রিয়াহীন, অপার্থিব ঠাণ্ডা অস্তিত্ব এ বাড়ির মধ্যে নিঃশব্দ পায়ে ঢুকে পড়ে-ছিল—কখন কেউ বোঝেনি তা। জ্যৈষ্ঠের দারুণ গরমে স্নান না করে পূর্ণিমা যখন

ফেলে দেওয়া কাপড়ের স্তূপের মতো মুখ গুঁজে থাকত মেঝেয়, অপর্ণা আর ডাকতেন না আগের মতো। কোনোদিন কাজ অপছন্দ হলে বলতেন 'তুই রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে আয়'। তারপর দিনভর পূর্ণিমা রান্নাঘরের মেঝের ওপর বসে থাকত শূন্যচোখে আর অপর্ণা এক এক করে শেষ করতেন সমস্ত কাজ। রাতে ঘরে ফিরে এসে সৌরীন দেখতেন পূর্ণিমা ঠায় মেঝের ওপর সেই একই জায়গায় বসা—সারাদিনে নড়েনি একটুও। রুক্ষ, লাল চুল বাইরের হাওয়ায় মুখের ওপর এসে পড়ছে ঘন ঘন তবু যেন হুঁশ নেই কোনো। সৌরীন দ্রুতপায়ে ঘরে গিয়ে ডাকতেন 'অপর্ণা, ওকি সারাদিন এভাবে বসে আছে?'

'হ্যাঁ'

'খায় নি?'

'না।'

'তুমি ডাকো নি খেতে?'

'না'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর ঠাণ্ডা গলায় সৌরীন বলে উঠতেন 'অপর্ণা, মানুষের খুব গোড়াকার দৈনন্দিন অনুভূতিগুলোও যার মধ্যে কাজ করে না তার সঙ্গে প্রতিযোগিতার দরকার কি?'

অপর্ণা তীব্রচোখে তাকাতেন একবার। 'ছাড়িয়ে দিলেই তো হয় অপর্ণা, তুমি বলো একবার।'

'না।' দৃঢ়, সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল অপর্ণার। সৌরীন স্নান থেকে বেরিয়ে এসে দেখতেন অপর্ণার দেওয়া রুটি হাতে নিয়ে ততক্ষণে ঘরে এসেছে পূর্ণিমা, খুব অল্প করে যেন অনিচ্ছায় ছিঁড়ে খাচ্ছে রুটির কোণ। যন্ত্রের মত ওর মুখের নড়াচড়া আর ভাষাহীন চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে কী এক অস্বস্তিতে ভরে উঠতেন সৌরীন। ঘুমোবার আগে আর একবার বলতেন—

'অপর্ণা—'

'ছাড়িয়ে দিলে ও যাবে কোথায়? ওকে কেউ রাখবে না।'

'সেটা ভাবার দায়িত্ব তো তোমার আমার নয়। প্রতিদিন আমরা কেন ভোগ করব এই অশান্তি?'

'তোমার কী অশান্তি হচ্ছে বলো তো?'

'কী বলছ—'

সৌরীন জানেন এইবার চুপ করে যাবার সময় এসেছে। অপর্ণা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবেন ক্রমশ। দুর্বোধ্য হয়ে যাবেন কোনো না জানা কারণে। কিন্তু পূর্ণিমাকে কেন যেতে দেবেন না অপর্ণা? শুধুই করুণা, হঠাৎ জন্মে যাওয়া এবং এ মুহূর্তে উপড়ে ফেলতে না পারা কোনো টান থেকেই শুধু যেন নয়। এ

বাড়ি থেকে বের হলে যার রাস্তা ভিন্ন আশ্রয় নেই, অথচ 'বেরিয়ে যা' বললে যে একমুহূর্ত দ্বিধা করবে কিনা সন্দেহ সেই বোধহীন জড় পদার্থটির জন্য এটা যথার্থ শাস্তি নয়, অপর্ণা যেন তা বুঝেছিলেন। আর পূর্ণিমা? সৌরীন ভাবেন 'এ মুহূর্তে যদি ডেকে বলি পূর্ণিমা, তুই চলে যা এক্ষুনি। কাল থেকে আর কাজে দেখতে চাই না তোকে'—এখন এই অন্ধকারে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে শুয়েও সৌরীন স্পষ্ট দেখতে পান কি হবে তাহলে—পূর্ণিমা উঠবে। ক'মুহূর্ত সময় হয়ত নেবে গোছগাছের জন্য। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে যাবে। রাস্তা পার হলেই গোরস্থান, এদিক ওদিক ছিটিয়ে থাকা বাতিস্তম্ভ, গাছ আর সমাধিক্ষেত্র চার-পাশে। মাঝে অল্প হিম পড়ে ভিজে উঠেছে যে পথ তা ধরে খুব ধীরে হাঁটতে হাঁটতে যাবে রেলস্টেশনের দিকে। যদি মাঝপথেই বলা যায় 'পূর্ণিমা যাবি না থাম্'—ও দাঁড়িয়ে যাবে। যদি বলি 'ফিরে আয় পূর্ণিমা'—সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে আর যদি কিছু না বলি আমরা কেউ, তবে অনন্তকাল এইভাবে হেঁটে যাবে ও।"

কী সহজ পূর্ণিমা, অথচ কী দুঃসহ।

সৌরীন দেখেছিলেন করিডোরে মেঝের ওপর আড়াআড়ি শীর্ণকায় এক আলো পড়া। এখন কত রাত জানেন না সৌরীন কিন্তু এটা সেই সময় যখন পৃথিবী তার শরীরস্থ সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে অনিদ্রাপীড়িত মানুষদের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায়। ঘুমিয়ে পড়া পাড়াগুলোর গা থেকে তখন মাধবীলতার গন্ধ ওঠে স্পষ্ট; হাওয়া এসে স্পর্শ করে চোখ আর সেরাতে চোখ খুলতেই সৌরীন দেখেন আলো—নিশ্চল সরলরেখায় পড়ে আছে শোবার ঘরের সামনে বারান্দায়। কোনো জানলার কপাট হয়ত অল্প খোলা। সৌরীন নিঃশব্দে ওঠেন। পাশে অপর্ণা মধ্যরাতের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বারান্দায় পা দিতে বোঝা যায় জানলা থেকে নয়, ওপাশের শেষ প্রান্তে বাইরে বেরোবার একমাত্র দরজা দিয়ে আলো আসছে। অপর্ণা আজ ভুলে গেছেন সেই দরজা বন্ধ করতে। সৌরীন উঠে ক'পা এগিয়ে আসতেই স্তম্ভিত হয়ে যাখেন—দরজা অল্প হাট, একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার ফাঁক দিয়ে করিডোরে আর দরজার বাইরে কপাটের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো পূর্ণিমা। গলায় উঁচু হয়ে থাকা হাড়ের অংশটা সাদা দেখাচ্ছে এখন জ্যোৎস্নায়। ওকি পাগল হয়ে গেছে—দু মুহূর্ত হতবুদ্ধি থাকার পর একথাটাই প্রথম মনে হয়। এই নিশুতি রাতে কোনো অর্থে নিরাপদ নয় এমন এক রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখে কী দেখছে পূর্ণিমা? নাকি অপেক্ষা করছে কারো? গোপন অন্য কোনো কিছু কি? না তা অসম্ভব। সৌরীন একথা নিশ্চিত জেনেছেন পূর্ণিমা যে পৃথিবী থেকে অবতীর্ণ তা সবকিছুর বাইরের এক গ্রহ—সমস্ত অর্থেই নির্বাক, অনুভূতিশূন্য, মোহহীন। খুঁড়লে রাশ রাশ ধোঁয়া আর অন্ধকার ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না সেখানে। কিন্তু এই গভীর রাতে গোটা

বাড়িকে বিপন্ন করে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছে কেন পূর্ণিমা এ প্রশ্ন এখন বিপর্যস্ত করে সৌরীনকে। রাগে দিশেহারা লাগে কেমন। সৌরীন হিংস্র চাপা গলায় ওর পিছনে গিয়ে বলেন 'এত রাতে তুই এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস পূর্ণিমা?' পূর্ণিমা হঠাৎ চমকে ওঠে ভীষণ। তারপর নিমেষে ঘরে চলে যাবার চেষ্টা করতেই সৌরীন সজোরে বাহু চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে দেন। 'যাবি না। বল কী করছিলি?' সৌরীনের গলায় প্রবল এক উত্তাপ ছিল। পূর্ণিমা চোখ তুলে তাকায়। খুব আস্তে বলে—'এমনি'। যেন বহুদূর থেকে মধ্যরাতের হাওয়ায় ভেসে এল এমন শোনায় 'এমনি' শব্দটা এখন। সৌরীনের গলা তীব্রতর হয়—'এমনি মানে কী?'

'দেখছিলাম।'

'কী দেখছিলি?'

পূর্ণিমা অস্ফুটে কিছু বলে। তারপর সামনে তাকায়। মুখের বাঁ পাশটা আলোকিত হয়ে উঠে অদ্ভুত দেখায় ওকে—গোরস্থানে চিঠি দিতে যাবার সেই দিনের মতো। আর ওর মুখ অনুসরণ করতে গিয়ে সৌরীন ছাখেন সামনের গোরস্থান কী অকল্পনীয় জ্যোৎস্নায় স্নান করে উঠেছে তখন, অল্প দূরের শিরীষ-গাছটার কাঁধ বেয়ে আলো নেমে এসেছে মাটিতে। একেবারে চুড়োয় ক'টা শিরীষফুল। সারবদ্ধ সমাধিগুলোর ওপর অসংখ্য জোনাকির ভিড়। শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়ে শিরীষগাছের সামনে তৈরি হওয়া আলোর বৃত্তটুকুয়। আর ঐ তো, সৌরীন নিজেই প্রোথিতমূল হয়ে দাঁড়ানো এখন, দরগা শরীফের সবুজ কাঠচেরা দরজার ওপারে মোমের আলো হাওয়ায় নড়ছে—কে সন্ধ্যায় জালিয়ে রেখে গেছে, নেভেনি এখনও। দমকা হাওয়ায় দরগা শরীফের শেষ হয়ে আসা মোম তিরতির করে কেঁপে ওঠে একবার। হঠাৎ মনে হয় সৌরীন হেঁটে যাবেন ঐদিকে—অনিবার্য কোনো টানে। হাট হওয়া দরজা কোনোমতে আটকে ভেতরে আসেন সৌরীন। তারপর ফিরতেই দেখেন পূর্ণিমা ঘরে চলে গেছে কখন।

কতদিন গিয়েছিল তারপর আর? সেদিন রাতে শুতে এলেন অপর্ণা—চোখের তলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। বিকালে বৃষ্টি হয়েছিল অল্প। মাথার কাছের জানলা অপর্ণা খুলে দিতে মনে পড়ল—হ্যাঁ বৃষ্টি হয়েছিল। সৌরীন ক্লান্ত ছিলেন খুব। ঘুম আসছিল প্রবল। অপর্ণার দুচোখের তলায় অল্প বসে যাওয়া দুটো অংশ—মোমের আলোয় সেদিনই প্রথম মনে হল ওরা নদীখাতের মতো, তাতে ঘামের প্রবাহ আর ঘুমের মধ্যে অপর্ণা ডাকছিলেন—

'শোনো'

জানলার অনতিদূরে সমাধির সার। বাতিস্তম্ভের খানিক বিবর্ণ আলোর ওপারে গাছের ছায়া। দীঘল গাছ।

'শোনো তুমি, কীভাবে বলব জানিনা কিন্তু—'

'বল অপর্ণা।'

অপর্ণার হাতে চিরুনি, চুলে প্রথম আঁচড় দেওয়ার আগে দ্বিধাগ্রস্ত মুখ—

'শোনো, রক্তক্ষরণ নেই ওর, শরীরের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণ নেই। পূর্ণিমার। আজ জানলাম।'

চরাচরময় অন্ধকার তখন প্রবল এক হাওয়ায় দোলে। আর যেন অনেকদূর থেকে ভেসে আসা মাধবীলতা—'কি বলছ অপর্ণা, আগে বলো নি কেন?'

'আজ তুমি বেরিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করেছি। ইদানীং ঠাকুরের বাসন ওই মাজত। আসনও দিত কতসময়। আমি বলেছিলাম ওসবসময় জানাবি আমায়।'

'তারপর?'

ঘরের ভেতর ভাসমান অন্ধকার। অপর্ণা কথা বলছেন যেন সে অন্ধকারের অতল থেকে।

'আজ মনে হল কতদিন তো হয়ে গেল—ওতো কিছু বলল না আমায়। তাই তুমি চলে যেতে—'

'কী সাংঘাতিক অপর্ণা'

'কী করবো আমরা এখন?'

বৃষ্টিশেষের হাওয়ায় তীব্র বুনোফুলের গন্ধ।

'বলো কী করবো?'

'মিত্রার সঙ্গে কথা বলবো কাল। আর তো কিছু ভাবতে পারছি না এ মুহূর্তে।'

খোলা জানলার ওপারেও সেই চোখ ধুয়ে যাওয়া অন্ধকার। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সৌরীন কার্যকারণসূত্রগুলো গোলাতে থাকেন ক্রমান্বয়ে। অপর্ণা সত্যিই বিপন্নবোধ করছেন এ মুহূর্তে। উপরিতলে সহজ থাকার একটা চেষ্টা সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট এখন। কিন্তু কেন বিপন্নবোধ করবেন অপর্ণা? একটি মেয়ে যে নিতান্তই ঘটনাচক্রে বাড়িতে এসে পড়েছে অপর্ণা জানেন তার শরীরের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণ নেই। কতদিন ধরে কেউ জানে না। শুধু তাই নয়, মনুষ্যপদবাচ্য হতে গেলে আর যা যা কিছু দরকার—যা মানুষের জন্মলব্ধ, স্বাভাবিক তার কোনো-কিছুই কি পূর্ণিমার আছে? নেই তো আমাদের কী? আমরা অপর্ণা এবং সৌরীন মিত্র—প্রাচীন জলাশয়ের মতো শান্ত, স্রোতহীন ভেসে যাওয়া ছিল আমাদের। একদিন চড়ায় এসে কি ঠেকল তার ভার আমাদেরই ওপর রয়েছে কি? যদি অস্বীকার করি নিতে? পূর্ণিমা কোথায় যাবে তার আমরা কী জানি? অথচ জানতে হয় কারণ পূর্ণিমা এখন অসুস্থ। একদিন অমিয়দার স্ত্রী মিনতি-বৌদির সঙ্গে স্টেশন থেকে হেঁটে এসে যখন ওদের বাড়িতে উঠেছিল তখনও

অসুস্থই ছিল। আমরা কেউ কিছু জানতাম না। অথচ এখন জানি। জানি ও ঋতুহীন। ওর চিকিৎসার প্রয়োজন। তার আগে নিরাশ্রয় করে দেওয়া যায় না। মিনতি বৌদিকে গিয়ে কিছুতেই বলা যায় না—আপনি বুঝুন ও কোথায় যাবে। কিন্তু কখনও হয়ত যাবে। যথাসাধ্য সাহায্য করে বলা যাবে পথ দেখে নিতে। আমরা কি অন্য একটি মেয়ে খুঁজে নেব তখন ?

'তুমি কি ঘুমুবে না আজ ?'

'শোনো অপর্ণা, মজার কথা মনে পড়লো শুনবে ?'

'কী ?'

'শোনো। একটা শুচিতার অনুষঙ্গে আবিষ্কৃত হলো একটি মেয়ে এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। অদ্ভুত না ? একটি চিরকালীন দ্বিবিভাজনকে নিজের শরীরের মধ্যে নস্যাৎ করে ফেলছে একটি পথ-কুড়ানো মেয়ে। বুঝতে পারছো কি বলছি ? সে শুচিও নয়, অশুচিও নয়। প্রতি ঋতুর আবর্তনে ক্রমান্বয়ে শুচি ও অশুচি হয়ে ওঠার এই নির্ধারিত প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে গোটা নির্ধারণটাকেই বিদ্রূপ করছে ও। তোমাদের নির্ধারণ অপর্ণা—রজস্বলার ফুল না কুড়ানো, জল না দেওয়া, ঠাকুরঘরে ঢুকতে না পারার—।'

না, এমন করে বলা হয় নি সেরাতে। এটুকু অন্তত বলা যায় নি অপর্ণাকে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে ওঠে সৌরীন শুধু দেখেন অন্ধকারের বৃত্তগুলি এক থেকে অন্যে বিলীন হতে হতে ক্রমে শরীরহীন, পরিধিহীন হয়ে যাচ্ছে কেমন। সেদিকে তাকিয়ে ঘুমজড়ানো অর্ধস্বরে সৌরীন হঠাৎ বলে ওঠেন 'কী যেন জানিনি এখনও, কী জানব বলে মধ্যরাতের হাওয়ায় চকিতে এভাবে ঘুম ভেঙে গেছে আমার অপর্ণা। দিকজোড়া রাত্রির মধ্যে আমি কবে তাকে খুঁজে পাব ভাবি…'

তারপর পুবের পথে হেঁটে হেঁটে মুশতারী বেগম। এককোণে ভাঙা টবের মধ্যে যত্নে পোঁতা মোরগফুল। পাশে দ্বাদশবর্ষীয় মুন্নাজানের পায়ের কাছে ফেলে যাওয়া শকুন্তলা আগরবাতির গাঢ় নীল মোড়ক। উত্তরে বাঁক নিলে 'গোলাম-জিলানী, মিয়াজান ওস্তাগর লেন'-এর নীল-সাদা শ্লেট পাথরের আধভাঙা সমাধিস্তম্ভ। কিন্তু আজ দক্ষিণে যাবেন সৌরীন। রাজা শা'র মাজার পেরিয়ে আরো দক্ষিণে—যেখানে কামিনী ঝোপের গা ঘেঁষে সেই একচিলতে ঘর, সমাধি-ক্ষেত্র দুটির দুই কোণে নিভে যাওয়া মোম, গলে যাওয়া মোমের অন্ধকারে জাফরির ছায়াপড়া মাটি—তার কাছে। দিবাবসানের হাওয়ায় তার উত্তরশিয়রের কুলগাছ আজ অদ্ভুত নড়ে। আর কোথা থেকে ভেসে আসা লোবানের গন্ধ… সে মুহূর্তে কে এসে দাঁড়িয়েছে। চকিতে পাশ ফিরলে আধ-অন্ধকারে অল্প হাসেন নুরুল ইসলাম। দাফন শেষে বাড়ি ফিরছেন হয়ত বা। সৌজন্য বিনিময়ের পরে সৌরীন বলেছিলেন 'কথা আছে ইমামসাহেব। যদি অসুবিধে না হয়—'

'না অসুবিধে কিসের, বলেন।'

বড়পুকুরের ধারে সিমেন্টের লাল বেদীর ওপর বসেছেন দুজন তারপর, পায়ের তলায় শামুকখোল আর সমাধির প্রান্তে কখন গুচ্ছ গুচ্ছ জলে ওঠা ধূপ—সে মুহূর্তে বাতিস্তম্ভের বিবর্ণ আলোয় বসে সৌরীন শোনেন গম্ভীর এক স্বর 'লা ইয়ামাচ্ছুহু ইল্লাল মুত্বাহহারুন'—অর্থাৎ কি, ইহা—ইহা অর্থে এখানে কোরাণ, পবিত্রতা ব্যতীত স্পর্শ করিও না। অতএব মেয়েলোকের ওসময় কোরাণ ছোঁয়া নিষেধ। শুধু কোরাণ কেন, কোনো ধর্মগ্রন্থই সে স্পর্শ করবে না, রোজার সময় ঐ কয়দিন রোজা রাখবে না, নামাজ পড়বে না—এককথায় ধর্মীয় কোনো আচারই সে পালন করতে সক্ষম নয়। এমনকী, জানেন বোধহয় নিকট আত্মীয়েরও মৃত্যুর পর—'

'সমাধিকার্যে মেয়েরা উপস্থিত হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, তারও একটা কারণ ঐ ব্যাপার। যদি অশুচি অবস্থা চলে। তবে দিন ধার্য করে দেওয়া আছে। কমপক্ষে তিন, সবচেয়ে বেশি হলে তেরোদিন পর্যন্ত এসব নিয়ম মানা যেতে পারে। এরপরও যদি কারুর ঋতুস্রাব বন্ধ না হয় তবে তাকে অসুস্থ বলে ধরা হবে। আমরা বলব ইস্তেহাজা। তার ক্ষেত্রে এসব মাপ।'

'আর যদি কারো ঋতু বন্ধ হয়ে যায় ?' সৌরীন যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন এবার। অস্পষ্ট, নীচুস্বর।

'হ্যাঁ, কিছু বলছিলেন ?' বৃদ্ধ ইমাম সংগত কারণেই শুনতে পান না। সুর্মাটানা চোখদুটো নিবদ্ধ সৌরীনের ওপর।

'না না ঠিক আছে।'

'এতেই আপনার কাজ হয়ে যাবে ?'

'আপাতত হবে। প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করব না হয়। অনেক ধন্যবাদ—'

'ধন্যবাদের কি আছে ? আজ আসি তাহলে ?'

তাল-নারকেলের সারের মধ্য দিয়ে দ্রুত হেঁটে ফিরে যান দীর্ঘদেহী ইমাম। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে আসা দমকা একটা বাতাস গোরস্থানের চাপা সৌরভটুকু চারপাশে ছড়িয়েই আবার অন্তর্হিত হয়ে যায় নিমেষে। কামিনী ঝোপের পাশে মকবুল মামুদের সেই বিষণ্ণ শয়নকক্ষ অবধি হেঁটে এসে দেখেন সৌরীন, মোমের আলো সম্পূর্ণত নিভে গেছে কখন।

অপর্ণা ও ঘর থেকে ডেকেছেন 'শোনো'। হাতে হাল্কা সবুজ রঙের খাম। 'মিত্রা পাঠিয়েছে।'

'কখন ফিরলে অপর্ণা ? কী বলল মিত্রা ?'

'পড়ে দ্যাখো।'

চিঠি খুললে হাল্কা একটা গন্ধ নাকে এসে লাগে। মুন্নাজানের পায়ের কাছে শকুন্তলা আগরবাতির গাঢ় নীল মোড়ক থেকে উঠে আসা ঘ্রাণ যেন বা—

'সৌরীনদা', মিত্রা লিখেছে, 'মেয়েটিকে দেখলাম। ব্যাপারটা মানসিক। ভালরকমের কোনো চোট রয়েছে কোথাও। এক্ষেত্রে এরকম অ্যামিনোরিয়া বা ঋতুবন্ধ হয়ে যাওয়াটা খুবই সম্ভব। ডাক্তারিশাস্ত্রে এর নাম সাইকোজেনিক অ্যামিনোরিয়া—total suspension of ovarian function through hypothalmic upset। আপনি কোনো সাইকিয়াট্রিস্টকে দ্যাখান। দরকার হলে আমি আবার দেখব ওকে।'

'পূর্ণিমার আগেকার জীবন কিছু জানতেন না মিনতি বৌদি?' অপর্ণার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম 'জানতেন না ওর—'

'ঋতুহীনতার কথা? total suspension of ovarian function—ওর বাক্‌যন্ত্রের মতো অচল, নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে যা? নাকি জানতেন বলেই রামমোহন বেরা লেন ছেড়ে যাবার আগে আমাদের কাছে দিয়ে যাবার দরকার হল পূর্ণিমাকে? সাময়িক মায়ায় পড়ে যে হৃদয়বত্তা দেখান সম্ভব হয়েছিল তার ভার কতদূর মিনতি বৌদি জানলেন কখনও, আমাদের মতো আচম্বিতে এবং অস্বীকার করতে চাইলেন। অথচ দৃশ্যত নয়, এভাবে কৌশলে। কিসে এত বাধছিল—শুধু বিবেক? না আমি জানি এও এক অহং। অহং, অহং, অক্ষমতা স্বীকার না করার অহং—আমার, অপর্ণার, মিনতি বৌদির। কিন্তু আজ সিদ্ধান্ত নেবার রাত। যা হয় হোক, একবার বর্ম খুলে নামি এসো। হৃতসর্বস্ব কাউকে তার ভাষা এবং ঋতু ফিরিয়ে দেবার এই অমোঘ যুদ্ধে—অন্তত একবার, একবার অপর্ণা।'

দীর্ঘ এবং অনুচ্চার এ সংলাপ যাপনকালীন অপর্ণার ফিসফিসে স্বর ভেসে আসে—'আমি কিছু জানি না—শুধু আমার ভয় করছে, জানো? কেমন ভয়—'

ক্রমে রাত বাড়ে। কী এক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন সৌরীন। বাইরে থমথমে পৃথিবী। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় গাছের ছায়াগুলো অনড় পড়ে থাকে রাস্তার ওপর। রাত্রির গহ্বর থেকে, আদিম পৃথিবীর গা থেকে সেসময় হাওয়া উঠে এলে দুহাতের পাতায় রাখা মুখ অল্প তোলেন সৌরীন। সামনে এসে দরজার কোণে কে যেন দাঁড়িয়েছে। অপর্ণা? ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ঘুম থেকে উঠে এলে? আজ অনেক রাত অবধি এখানেই বসে থাকব ঠিক করলাম—জানো? নির্ঘুম রাতগুলো বিছানায় শুয়ে কাটাব না আর। বরং আজ বৃষ্টি দেখব। 'অপর্ণা' স্বভাবসিদ্ধ নিচুস্বরে ডাকেন সৌরীন। দরজার পাশ থেকে চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের মধ্যে পূর্ণিমা এসে দাঁড়ায়। হাতে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস—'কিরে তুই ঘুমোতে যাস নি এখনও?' সৌরীন খুব অবাক হয়ে যান। পূর্ণিমা এমন অনাহূত আসে নাতো কখনও। কিছু কি চায়? ক'মুহূর্ত আগেও বৃষ্টির যে বাতাস তা কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে সৌরীন অনুভব করেন। জলটুকু নিঃশেষ করে গ্লাস দিতে গিয়ে পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকান একবার। কিছু যেন খুঁজে পেতে

চান। 'কী হয়েছিল রে পূর্ণি, কী হয়েছিল বলবি একবার?' বলতে ইচ্ছে করে অথচ বলেন না সৌরীন। পূর্ণিমার ঈষৎ চাপা নাকের ওপর ছোটো পাথরটা ঝকঝক করে ঘরের মুমূর্ষু আলোতেও। হঠাৎ মনে হয় কোথা থেকে উঠে এল ও।

—কোথা থেকে উঠে আসে এক দুই তিন সহস্র রাত্রির শিকড় অপর্ণা, এমন নামগোত্রহীন?

—ধলেশ্বরীর জল নেমে গেলে ধূ-ধূ বালির মধ্যে আমি যেন হেঁটে যেতে দেখেছিলাম—মনে পড়ে? সেই একরাশ রুক্ষ চুল। ঋতুসম্ভব।

—শোনো, আজ বৃষ্টি হয়েছিল কোথাও? আজ বৃষ্টি হল বলে আগ্‌হা মেহ্‌দী স্ট্রীটের সেই সমাধির মধ্যভাগ থেকে পিঠটান করে উঠে দাঁড়াল ছাতিমগাছ, সেই ছাতিম আর বাড়ি ফিরতেই দেখি কলতলায় প্রবল জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে সব—কাদাবালি, ক্ষতের রক্ত আর কিশোর ছাতিমের ভাঙা ক'টা ডাল···

'দাদা।'

'বল্‌, কিছু বলবি?'

'আমি আর যাব না।'

কী বলছে মেয়েটা, 'কোথায় যাবি না?'

নৈঃশব্দ্য।

'কোথায় যাবি না বল?'

'ডাক্তারের কাছে।'

সৌরীনের হঠাৎ মনে হয় চেঁচিয়ে বলেন, 'ঠিক কাছে যেতে হবে না তোর।' পরক্ষণেই সংযত করেন নিজেকে। পূর্ণিমা কি ভয় পেয়েছে?

'আমরা নতুন ডাক্তারের কাছে যাব পূর্ণিমা। বড় ঘরের এককোণে কাঠের চেয়ার। টেবিলের ওপর অল্প নীল আলো। আমরা গেলেই অনেক গল্প হবে দেখবি। সবার সব গল্প শেষ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে আসব আমরা। এই তো। একদম ভয়ের কিছু নেই। এমনি করেই ভাল হয়ে যাবি তুই। যা শুয়ে পড়।'

সৌরীন যেন দুগ্ধপোষ্য কোনো শিশুকে প্রবোধ দিচ্ছেন।

পূর্ণিমা অনড়। এবং সৌরীন আবিষ্কার করেন ধৈর্য দ্রুত ছেড়ে যাচ্ছে আবার। এটা সেই মস্তিষ্কহীন জড়তা, হয়ত বা অনন্ত এক জেদ, এতকিছুর পরও যাকে সহ্য করে নেওয়া কঠিন।

'কী বললাম তোকে?' সৌরীন গলা চড়ান। পূর্ণিমা হঠাৎ চোখ তুলে তাকায়। সৌরীন স্তম্ভিত হয়ে দেখেন দুচোখ বেয়ে অজস্র জল গড়িয়ে নামছে ওর, শব্দহীন হু-হু সেই জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে গোটা মুখ—খড়িওঠা শুষ্ক দুহাত তার ওপর চেপে পূর্ণিমা দ্রুতপায়ে পার হয়ে যায় ঘরের চৌকাঠ। 'পূর্ণিমা, তুই—' আর কিছু বলতে পারেন না সৌরীন। প্রাচীনতম অন্ধকারের গায়ে ঘুমন্ত

ঘরদুয়ারগুলি যে যার মতো পড়ে থাকে এদিক ওদিক—খানিক পরে আকাশ ভেঙে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়।

পুরোনো আরামকেদারার গায়ে অসার, ক্লান্ত মাথা এলিয়ে রয়েছে আর ছিটকে আসা জলের স্পর্শে দ্রুত ভিজে উঠছে ঘরের আসবাব, মুখের একাংশ আর আধবোজা চোখ। চৌকাঠের ওপারে বিস্তীর্ণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে সৌরীন বলে ওঠেন 'আমার সমস্ত এই শূন্যে নিক্ষেপ করে বলতে চাই আজ—তুমি পুনর্জীবিত হও।'

অপর্ণা ভোরে এসে উদ্বেগজড়ানো গলায় ডেকেছেন 'শুনছ তুমি? সারারাত যে ঠায় বসে রইলে এখানে, মেয়েটাকে বার হতে দেখেছো একবারও?' সৌরীন শেষরাতের গাঢ় ঘুম থেকে জেগে উঠে বোবা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন।

'কোথায় গ্যাছে পূর্ণিমা?'

'আমিই তো প্রশ্ন করছি তোমায়।'

'ওকি সত্যিই চলে গেল অপর্ণা?'

'আশেপাশে কোথাও তো নেই। কী হবে এখন?' অপর্ণার গলা ভেঙে আসে। একমুহূর্ত সময় নেন সৌরীন। তারপর উঠে দাঁড়ান।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'স্টেশনে।'

'কেন?'

'জানি না। মনে হচ্ছে দ্যাখা উচিত। স্টেশন থেকে একদিন হেঁটে এসেছিল মিনতিবৌদির বাড়ি।'

'মিনতিবৌদির বাড়ি?'

'না, এখন ওখানে যেতে পারে না ও।'

'তাহলে?'

'তাহলেও রেলস্টেশন ঘুরে আসা উচিত একবার আর শোনো যদি সত্যকে স্বীকার করতে ভয় না পাও তবে এ মুহূর্ত থেকে একথাও মানতে শুরু করো যে পূর্ণিমাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।'

'এভাবে বলছ কেন?'

'সত্যকে মানো অপর্ণা। ও স্বেচ্ছায় ছেড়ে গ্যাছে ওর একমাত্র আশ্রয়। কখনও এমন হলে কেউ কি ফিরে আসে তুমি বলো?'

'স্বেচ্ছায়ই তো? অন্য কোনো অঘটন ঘটে নি তুমি জানো?'

সৌরীন ম্লান হাসেন। 'এত বিপর্যস্ত হচ্ছো কেন? আমাদের কী করার ছিল? মিনতিবৌদির বাড়ি থাকলেও তো একদিন এভাবে উধাও হয়ে যেতে পারত, অনেক আগেই হয়ত যেত।'

অপর্ণার মুখ অন্ধকার হয়ে যায় নিমেষে। 'দয়া করো। এভাবে কথা বোলো না এখন।'

সৌরীন দ্রুত তৈরি হয়ে এসে দেখেন অপর্ণা দরজার বাইরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।

'তোমার সঙ্গে কিছুদূর অন্তত যাই। না বলবে না।'

স্টেশনের পথে পা দিতেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয় আবার। চলার পথের দুপাশে সার সার সমাধিগুলোর দিকে চোখ পড়তে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। এই তো সেই ভেঙে যাওয়া সমাধি অপর্ণা, দেখো, পূর্ণিমা চিঠি দিতে এসে বসেছিল ক'মুহূর্ত। আমি তো শুভার্থী ছিলাম তাই চিৎকার করে বলেছি উঠে আসতে—হারিয়ে যাবে ভেবে ভয় হয়েছিল খুব। আজ কতো প্রন্থিহীন বলো আমরা। কোনো ধ্বস্ত সমাধির ওপর গাছগাছালির আড়াল রেখে কেউ বসে থাকবে না—আমরা তা জানি। পশ্চিমের কাদামাটির রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে হেঁটে যান অপর্ণা-সৌরীন। জলজমা মাটি আর কাদাভরা ঘাসজমি। 'সাবধানে যাও, পড়ে যাবে', অপর্ণার চকিত স্বর, অল্প হাওয়ায় গাছগুলির সারা গা থেকে জল গড়ায়। এভাবে যখন মধ্যপথ, সৌরীন দাঁড়িয়ে যান। অপর্ণা এগিয়ে এসে বলেন—

'কী হল?'

'অপর্ণা, মরহুম মানে কি জান?'

'না।'

'মাইয়্যেত মানে?'

'জানি না।'

'মুর্দা কাকে বলে অপর্ণা?'

'কী হল কী তোমার?'

'যাবতীয় মহানুভবতা আঘাটায় গেলে যা হয় অপর্ণা, ক্লেদ লাগছে বড়।' সৌরীন অদ্ভুত হাসেন।

'মহানুভবতা?' অপর্ণাও হাসেন এবার 'কিন্তু ও চলে গেল কেন? অন্তত কাল রাতেই গেল কেন বলতে পারো তুমি?'

'ওর শরীরে ছিল সেই মরণকামড়। যাকে আমরা জড়তার অন্ধকার বলে ভুল করেছি তা ছিল ভয়ংকর এক বিষাদ—আর আমরা উদ্ধার করতে চেয়েছিলাম ওকে—'

'হ্যাঁ চেয়েছিলাম-তাতে কি?'

'ওযে উদ্ধার পেতে চায়নি অপর্ণা। কখনও চায় নি। এটা বুঝতে সময় গেল অনেক।'

অন্ধকার কাদামাটির মতো ঘনবদ্ধ জমাট। সদ্য উপড়ে ফেলা ঘাসের গন্ধ লেগে আছে এমন অন্ধকারে। অপর্ণা জানলার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন। হাওয়া নেই। অপর্ণার চুল তাই হাওয়ায় ওড়ে না। অপর্ণার মনে আছে নীল শাড়ি? সৌরীন ভাবেন, কী আশ্চর্য যে মেয়ে সব কিছু ফেলে গেছে সে নীল শাড়ি নিল কেন? গোরস্থানের দিক থেকে গন্ধ আসে কী ফুলের। হাওয়া নেই, তবু গন্ধ আসে। আর সে মুহূর্তে চোখে পড়ে দূরে এককোণে অপর্ণার ঠাকুরঘর। অবিন্যস্ত। পায়ে পায়ে যে এসে দাঁড়ায় সে ঘরের চৌকাঠে তার ঋতুস্রাবে শরীর ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে পরনের নীল শাড়ি। গাঢ় নীল শাড়ি। মুহূর্তাধিক নয়। সে ঢুকে পড়ে ঠাকুরঘরে। 'অপর্ণা' সৌরীন হঠাৎ ডাকতে যান কিন্তু গলায় কোনো সাড়া নেই। স্তম্ভিত প্রাচীন এক দম্পতির চোখের সামনে দিয়ে সে ঢুকে যায় ঠাকুরঘরে। তারপর টেনে নেয় পটের ঠাকুর। ত্রস্ত, বিমূঢ় অপর্ণা দেখেন তাঁর ঠাকুরঘর অল্পে অল্পে ভিজে উঠছে সেই প্রবল রক্তস্রোতে···

'আজ বৃষ্টি হবে না আর? জানলাগুলো খুলে দিয়ে শুয়ে পড়ো তুমি, কী দম আটকানো গরম অপর্ণা, জানলাগুলো খোলো।'

'ঘুম আসছে না একটুও?' অপর্ণার গলায় উৎকণ্ঠা।

'আসবে। তুমি জানলাগুলো খোলো।'

পরমুহূর্তে হাওয়া দেয়। ঝোড়ো হাওয়া। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে এমন হাওয়া। জানলার বাইরে আকাশের যতটুকু দেখা যায় মেঘাচ্ছন্ন। অথচ কী এক আলো এসে পড়েছে সমাধিক্ষেত্র জুড়ে। রাস্তা পার হয়ে এসে ও কোণাকুণি যায়। যেখানে মাটির কবরের সার অনন্ত গুল্মলতায় মুখ গুঁজে আছে সেইদিকে। হঠাৎ হোঁচট লাগে। মুঠো দিয়ে জঙ্গল সরাতে বোঝা যায় লোহার ভাঙা অংশ। এককালে জায়গানির্দেশ দেওয়া ছোটো প্রাচীর ছিল। মধ্যের সমাধি একমানুষ উঁচু ঘাস নিয়ে হাহা করছে। শুকনো ঘাস। ওপরে জোনাকির ভিড়। শয়ে শয়ে আলোকবিন্দু দুলছে। কি ভেবে ও হাত রাখে সেখানে। এমনি সময় ঝড় ওঠে। ধুলো আর পাতার রাশ উড়তে থাকে চারপাশ ছেয়ে। বাতিস্তম্ভগুলি নিভে আসে চকিতে। সমস্ত গোরস্থান যেন কার এক প্রবল প্রহারে চলমান হয়। আর ভূবক্ষ ছেড়ে উঠে যেতে থাকে কোথায়। এই উঠে যাওয়ার বোধ ভিজে সপসপ করা মেয়েটিকে মাতাল করে। সিমেন্টের ধাপে পা রেখে সে দাঁড়ায় ঐ সমাধির গায়। চুলখোলা, নীল শাড়ির আঁচল ধুলোয় লুটোচ্ছে। পায়ের তলায় চাপা পড়া কাঁটাগাছ। হাওয়া এসে জোরে একবার ধাক্কা দেয়। ও টাল সামলে আচম্বিতে লাফ দেয় সামনের সমাধিতে। তারপর আরও সামনে কোথাও। হঠাৎ নেমে পড়ে মাটিতে। সারবদ্ধ কাঁচামাটির কবরগুলি পার হয়ে দৌড়ায়। এক, দুই তারপর তিন আর হাজার হাজার সমাধির উত্তরশিয়র পার হয়ে হয়ে

দৌড়ে যায় অনন্ত অন্ধকারের গায়ে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলে হাওয়া আর কাঁটাগাছ ফালা ফালা করে দেয় নীল শাড়ি। সমাধিশিয়র মগ্ন কোনো প্রবাহের মতো ঋতুরক্ত গড়ায়। আর পৃথিবীর আদিমতম এক প্রলয়ের রাতে বিস্রস্ত জোনাকির সার, অন্ধকারের নাম না জানা কাঁটাগাছ, বুনোফুল আর ঘাসসমষ্টি পার হয়ে জলকাদারক্তমাখা পৃথিমা রেলস্টেশন যায়।

অপর্ণা বুকের ওপর থেকে ভাঁজকরা হাত নামিয়ে দিচ্ছেন। শ্বাসকষ্ট ছিল কিছু? অপর্ণা তুমি ঘুমোও। ঘুমোও। আজ রাত্রি এই যাবে। এক স্বচ্ছ রাতে আমি প্রোফেট হয়ে যাচ্ছি। ভাল শোনাচ্ছে বলো?

'আজ তমাল থাকলে হয়ত শান্তি পেতে তুমি। আমিও। আমরা দুজনেই।'

'হয়ত পেতাম জানি না। তুমি তো আছ অপর্ণা কোথায় রয়েছ তুমি'? অন্ধকার হাতড়ে সৌরীন খুঁজে পেতে চান অপর্ণাকে। সে মুহূর্তে কেউ ডাকে 'নাজারিও, নাজারিও, ডন নাজারিও।' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সরে আসেন সৌরীন। কেননা অন্ধকার ঘরে তমালের একেবারে পাশে বসেও সৌরীন অভ্রান্ত শোনেন সেই নাম। 'ওরা কাকে ডাকছে তমাল?' 'বুঝতে পারছো না বাবা, ওরা একজন নিষ্ফলা বিশ্ববিবেচক খুঁজে বেড়াচ্ছে যার হৃদয়বত্তা তুলনাহীন, but who is a terrible failure—সে যা করতে চায় কখনই তা হয়ে ওঠে না। সম্পূর্ণ অন্যকিছু হয় যা তার বিরুদ্ধগামী, যাকে সে কোনোদিন হতে দেখতে চায়নি। আর বস্তুত এইভাবে সে হয়ে ওঠে একজন অপস্রষ্টা। ভাবো, কি করুণ অথচ কি হাস্যকর। তোমার উপকারের গ্রাহক যেমন আজ ফেরার হয়ে গ্যাছে তোমারই জন্য। বাবা, তুমিই কি সেই নাজারিও নও? বুন্যুয়েলের নাজারিন নও তুমি?'

৫.

আশহাদো আন্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়া আশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আব্‌দোহু ওয়া রাসুলোহু···

কিছুদূর থেকে সমবেত গলার আওয়াজ আসে। সৌরীন খুব ধীরে ওঠেন। দরজা খুলে বাইরে এলে দূর থেকে আসা দলটিকে দেখতে পাওয়া যায়। সামনে ক'জনের হাতে ছোট মশাল। বৃষ্টির পর রাস্তার গহ্বরগুলিতে আজ জল জমা। ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে পড়েছে তার ওপর। পায়ে পায়ে সেসব পার হয়ে কখন একেবারে সামনে এসে যায় ওরা। সৌরীন খানিকটা সরে গিয়ে জায়গা করে দেন। অর্ধচন্দ্রালোকে নেয়ে ওঠা গাছগুলির ফাঁকে এক এক করে অদৃশ্য হয়ে যায় পুরো দল।

শবাধার মাটিতে আর শবদেহের বক্ষস্থলের সামনে সারবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে সকলে। জারুলগাছটার আড়ালে এক বাতিস্তম্ভের নিচে এসে দাঁড়িয়েছেন

সৌরীন। শেষবারের মতো কাফন তোলা হয়। চারপাশের গাছগুলির ছায়া এক অদ্ভুত আলো-আঁধারি তৈরি করে শবের মুখের ওপর পড়ে। সৌরীন হঠাৎ শিউরে ওঠেন। মনে হয় এ মুখ তিনি কোথাও দেখেছেন। ভাঙচুরের রেখাগুলিতে চোখ রাখলে কি যেন লাফ দিয়ে ওঠে মাথায়, অথচ অন্ধকারের কোনো তল খুঁজে পান না সৌরীন। তল পান না স্মৃতিকোষ নামের এক কবেই সমাধিপ্রাপ্ত জীবন-উপাদানের। শরীরব্যাপী ব্যর্থ, সন্ধানী সেইসব আঁচড়গুলিতে ছিন্ন হতে হতে শুধু মনে হয় সময়েরও জন্মমুহূর্ত আগে যার উত্থান, সেই শবযাত্রীদল আজ যেন বয়ে নিয়ে এল তাকে—বয়ে নিয়ে এল এই অদ্বিতীয় মুখ—নিয়তিপীড়িত ঈশ্বরের মুখ। অপর্ণার ঈশ্বর। অপর্ণাদের। আর নুরুল ইসলামের। বাতিস্তম্ভের আলোর ওপারে শায়িত সেই সর্বশক্তিমান শরীর এখন ডুবে যাচ্ছে রাশ রাশ মাটির অন্ধকারে। বহুদিন পর আজ সৌরীন আনন্দ পান খুব। এক অভূতপূর্ব দাফনের রাতে বর্ণময় মিছিল দেখে আনন্দ পান। যার বিরুদ্ধে আবহমান প্রত্যাবর্তনকারী সভ্যতার মুখ, তার অনির্বচনীয় মৃত্তিকাপ্রাপ্তি দেখে আনন্দ পান। শেষে রাতের হাওয়ায় বর্ণময় মিছিল যায় কুয়াশার পরে। আর দিক্‌রেখায় গায়, মাজারশরীফের নানা রঙের আলোকবিন্দু লক্ষ লক্ষ তারা হয়ে জ্বলছে যেখানে……

অনেক পরে কেউ আসে। বিবর্ণ পাতার স্তূপ আর ঝুরো মাটির ছড়ানো টুকরোগুলোর ওপর সন্তর্পণে পা ফেলে। কে? কে? কায়সার নয় ও? এতরাতে কী করছে এখানে? হ্যাজ কায়সার খুব ভারী কিছু বয়ে আনছে যেন এক পা দু পা করে। এতদূর থেকেও ওর অনিয়মিত শ্বাসের শব্দ শোনা যায় স্পষ্ট। সদ্য দেওয়া গোরের পাশে এসে এদিক ওদিক তাকায় একবার। সৌরীনের মাথার মধ্যে বিদ্যুৎবাহী কিছু যায়। কোনো হিসেবই আজ আর বাকি থাকার নয় বোধহয়। গোরস্থানে গোপন চক্রের ক্রিয়াশীলতায় স্থানাভাব আর কোনো সমস্যা নয় এখন। রাতের অন্ধকারে নির্ধারিত সময়সীমার অনেক আগেই খুঁড়ে ফেলা হয় পুরোনো কবরগুলি। মোটাটাকার বিনিময়ে স্থাপন করা হয় নতুন এক একটি শব। আজ কায়সার নিযুক্ত হয়েছে তেমন কোনো কাজে। বিনিময়ের ওপারে হয়ত আছে দুটো আধপোড়া রুটি আর গেঁজে যাওয়া তরকারির অবশিষ্ট অংশ মাত্র। মাত্র ক'দিন আগে দক্ষিণের মাজারে বসে জাহেদ বলছিল ওর কথা—কখনও না নেভা কোনো চুল্লীর আগুন আছে ওর পেটে। রাত্রির শেষ প্রহরে অপরাধরত কায়সারের সঙ্গে ব্যবধান কমাতে সৌরীন এগিয়ে আসেন বেশ কিছুটা এবং হঠাৎ নিরস্ত হন। ভিজে গোরের পাশে হাঁটুমুড়ে বসে আছে কায়সার। আনতমুখ। পাশে রাখা বড় এক বালতি। তা থেকে জল তুলে আচমকা ছিটোতে শুরু করে ও অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে। ওর কাঁপা হাতের অপুষ্ট আঙুলগুলি বেয়ে জল গড়ায় কবরের গায়ে, দ্বিতীয়বার সম্পূর্ণত ভিজে উঠলে নুলো বাঁ-হাত

মাটিতে চেপে কবরটির জ্যামিতিক আকারটুকুকে অসম্ভব দক্ষতায় পরিপূর্ণ করে ও। তারপর উঠে দাঁড়ায়। বালতিটাকে টেনে আনে কিছুদূর। সারাদিনের কাজ না পাওয়া কায়সার জল ছিটিয়ে যায় আশেপাশের সমস্ত কবরগুলিতে। যত্ন করে হাত বোলায় ফুলগাছে, শিহরিত পাতাগুলির শিরা-উপশিরায়। তারপর ফিরে যায় বড় পুকুরের কাছে। নুলো হাতে একটু একটু করে টেনে আনে জলভরা বালতির কাণাটুকু। গুঁড়ি মেরে আসা কোন রাত্রিচরের মতো দেখায় ওকে প্রসারিত অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

ও তাকিয়ে আছে ঊর্ধ্বাকাশে। দল ছেড়ে আসা মেঘেদের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া তারাগুলির মুখ খুঁজে ফিরছে কায়সার। নিচে রাতের হাওয়া তোলপাড় করে পৃথিবী। তখন ঘুম আসে। অল্প একটু ঘাসজমির প্রান্ত খুঁজে শুয়ে পড়ে ও। বিনিময়হীন এক রাত্রিশ্রমের পর এত নির্ভার লাগে নিজেকে কোথাও? কায়সারকে অদ্ভুত দেখায়। ঘুমের দুহাতে জড়িয়ে আছে সদ্য জল ছেটানো গোরের পিঠ। সমস্ত গালে কাদার দাগ। মাথার কাছে ফুলগাছ পূব-দক্ষিণের অপার্থিব হাওয়ায় দুলছে। নাম-না-জানা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল তাতে, প্রসারিত ডাল থেকে একগোছা ঝুঁকে আছে ঘুমন্ত কায়সারের মুখের ওপর। কায়সার গভীর করে শ্বাস নেয় একবার। রাতের হাওয়া বুনোফুলের তীব্র গন্ধ ছড়ায় চারপাশে। ওরা কী ফুল, কী ফুল কায়সার? কুছ নহী মাঈজী, জঙ্গলমে যো হ্যায়…আর তখনই রাত্রির অণুপরমাণু, জলবায়ুমণ্ডিকার এই সর্বতাপহারী গোরস্থান প্রকৃতির সমস্ত প্রাণের একেবারে মাঝখান থেকে সুর ওঠে—অভ্রান্ত সেই আহির্ভৈরো। উন্মাদ হাওয়ায় তোলপাড় হওয়া আবহমানের আজানগান। সৌরীন চোখ মেলতে দেখেন বিবর্ণ অন্ধকার একটু একটু করে নিজেকে শেষ করে ফেলেছে কখন।

শেখর আহ্‌মেদ

—

দুধ সমুদ্দুর

আচমকা পাখিবর মনে কুচিন্তা এল। আচ্ছা, শোভনবাবুরা টাকিতে পৌঁছেছেন তো? যদি না গিয়ে থাকেন? কোনো কারণে প্রোগ্রাম বাতিল হতেই তো পারে! বেলা বার্ধক্যের দিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করছে। বাস বসিরহাট পেরিয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। দণ্ডির হাট ছেড়ে দুপাশে সবুজ ধানক্ষেত দেখাতে দেখাতে হু হু করে ছুটে চলেছে।

খোলাপোতা থেকে বসার জায়গা পেয়েছে পাখিব। বসিরহাটে জানলার ধার। শরীর ছুড়িয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। বেশ লাগে এমন অচেনা পথের যাত্রা। বেশ বাউণ্ডুলে বাউণ্ডুলে ভাব। সত্যিকারের বাউণ্ডুলে তো আর এ জীবনে হয়ে ওঠা গেল না। সে কফিনে পেরেক পড়েছে বিপাশা প্রেমিকার ডিম ফাটিয়ে বউরূপ ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই। এমন জানলে কোন শালা খোলা সমুদ্র ছেড়ে ডোবার শামুক হতে যেত! রাগ-ঝাল-অভিমান ঝালিয়ে টক্-ঝাল-মিষ্টি মিষ্টি-ঝাল-টক জীবন উল্টেপাল্টে লেংচে লেংচে তবু চলছিল। পাখিব কখনো খোড়-বড়ি-খাড়া বলে না। কেমন বিধবা-বিধবা লাগে। তা সেই ল্যাংচানো জীবন মুখ থুবড়ে পড়ল নৈবেদ্য আসার পর। থালা ভরা নৈবেদ্য যেমন পুরুত ঠাকুরের মনোহরণ করে তেমনি বিপাশার মন স্থির হয়ে গেল নৈবেদ্যে। পাখিব ফুস্। বেমালুম। নৈবেদ্যর হাসি, নৈবেদ্যর কান্না, নৈবেদ্যর হিসি, নৈবেদ্যর হ্যা, নৈবেদ্যর ইত্যাদি ইত্যাদি। আর পাখিবর বাজার, বাজারে চূড়ান্ত অনৈপুণ্য, পাখিবর সংসার—সে সংসারে বিপাশার হাড়-মাস ভাজা ভাজা, পাখিবর চাকরস্থ চাকরের চাকরি,—অমন রোজগারের মুখে আগুন, পাখিবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাখিব যদি কখনো পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হয় (খুব আশাবাদী পাখিব, যতটা অপদার্থ বিপাশা তাকে বলে, সেটা সত্যি হলে তার মন্ত্রী হওয়া ঠেকায় কে।) তবে প্রেমিকাদের জন্যে বিবাহপূর্ব টিউবেকটমি বাধ্যতামূলক করে ছাড়বে সে। তাতে প্রেমের পোয়াবারো। বিয়ের আগেও বটে, বিয়ের পরেও বটে।

সামনের আসনে বউটি মাঝে মাঝে ঠোঙা থেকে কয়েৎবেলের আচার

আঙুলে তুলে মুখে চালান করছে। সদ্য বিয়ে হয়েছে বোধহয়। চনমনে যৌবন বারুদ হয়ে আছে শরীরে। হাসনাবাদ যাত্রীনী বউয়ের কাঁচি চালানো চুল, খামচানো ভুরু, পালিশ করা মুখ, রাঙানো নখ আর ঠোঁট। কত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে পড়া এলাকায় রূপচর্চা ঢুকে পড়ছে।

কয়েৎবেলের গন্ধে আকুল একটা মাছি বউটার মুখের কাছে ভন্ ভন্ করছে। ফাঁক বুঝে ওর পাপড়ি ঠোঁটে টুক করে চুমু দিয়ে দিচ্ছে। হিংসে হয় পাখিবর।

আর একজন হেলছে বউটার দিকে। সে অবশ্য কয়েৎবেলের গন্ধে নয়, তার রূপ যৌবনের টানে। মেয়েটার ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকটাকে বেদম ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে হয় পাখিবর। প্রায় গোড়া থেকেই ও বউটার কাঁধে শরীর লেপটে দাঁড়িয়েছিল। সাহেব-সুবো দেখতে। বউটা বোধহয় খুব অপছন্দ করেনি। পাখিব ড্যাশিং পুশিং দিয়ে ওর দাঁড়ানোর জায়গাটা দখল করার চেষ্টা করেছে কয়েকবার। ভদ্রলোক 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' হয়ে অটল পর্বতের মতো তার সব উদ্যম ব্যর্থ করেছেন। দূর থেকে যৌবনসুধা চোখ দিয়ে পান করা ছাড়া উপায় ছিল না পাখিবর। মুখ চোখ আহামরি কিছু নয়। কিন্তু টান্‌টান্ বেশবাস আর সাজ-সজ্জায় চটক আছে। সবার ওপরে দুর্দান্ত একজোড়া বুক। পাখিবর কাছে নারী-দেহের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ওই বুকেই। বিপাশা তাকে ভুলিয়েছিল ওই সম্পদেই। এখনো আছে। নৈবেদ্য হিসেবের বাইরে একফোঁটাও পায়নি কখনো। শরীর সম্পর্কে সচেতনতা বিপাশার যথেষ্ট। কিন্তু কার জন্যে? পাখিবর স্পর্শ সম্বন্ধে বিপাশা কখনো নিরাসক্ত, কখনো বিরক্ত। পাখিব আর চেষ্টা করে না। সমুদ্রের বুকে দুটো দ্বীপের দূরত্ব বাড়ছে ক্রমশ। শেষ কবে বিপাশাকে কাছে পেয়েছিল ভাবার চেষ্টা করে সে। মাস দুয়েক আগে রাত্রে বিপাশা কলে ঢুকলে হঠাৎ পাখিবর ইচ্ছে হল, সে বিপাশার শরীর দেখবে। শতবার দেখা ওই দেহে এমন ভাঁজ নেই যা পাখিব জানে না, এমন তিল নেই যা পাখিবর মুখস্থ নয়। তবু। স্কুলজীবনের মতো অদম্য ইচ্ছা জেগে উঠেছিল তার। লুকিয়ে পরনারীর দেহ দেখার উদ্দাম তৃষ্ণা।

বাথরুমের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে দেখেছিল সে। বিপাশার বোমারু শরীর। তার পুষ্ট ভারী বুক। সারা দেহে রক্তস্রোত উন্মত্ত হয়ে উঠছিল। রাত্রে বিপাশার অনীহা আপত্তিকে পাত্তা না দিয়ে তার বুকে মুখ গুঁজেছিল। পাখিবর কামনায় শৈশব আর যৌবন এক হয়ে যায়। চরম তৃপ্তির পরেও সে দীর্ঘক্ষণ বুকে মুখ গুঁজে পান করে। খুব ছোটবেলায় মাকে হারানোর জন্যেই কি? একটু বড় হয়ে দেখত, গোলগাল গৌরবর্ণা সৎমা তাঁর নিজের সন্তানকে স্তডৌল স্তনে দুধ পান করাচ্ছেন। হাঁ করে দেখতে থাকত সে। সৎমা রেগে গিয়ে বলতেন, কী অসভ্য ছেলে রে বাবা। যেখানেই যাই, ছেলেটাকে একটু দুধ দেওয়ার জো নেই! হতচ্ছাড়া

পাজি ছেলে ঠিক হাজির হয়ে ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে থাকবে!

একদিন পার্থিব শেষমেষ বলেই ফেলল, নতুন মা, আমাকে একবার দুধ খেতে দেবে?

নতুনমা আর্তনাদ করে তাড়াতাড়ি নিজের ছেলের মুখ সরিয়ে দিলেন। ভালো করে আঁচল চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, বদমাস্, শুয়োর কোথাকার, এইটুকু বয়েসেই কুনজরে দেখতে শিখেছ, মা-মাসী জ্ঞানটুকুও নেই! ওমা আমি কোথায় যাব!

বাবা ফিরলে সাতকাহন। বেদম মার খেয়েছিল সেদিন পার্থিব বাবার কাছে। বুঝতে পারেনি, এত শাস্তি পাওয়ার মতো কী এমন গুরুতর অন্যায় সে করেছে। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে উঠোনে গিয়ে খুব কেঁদেছিল সে।

সেই শুরু। নতুন মা তার কাছে একজন সাধারণ মেয়েমানুষ হয়ে গেল। বাঘ যেমন চোখে নখর মানুষকে দেখে ঠিক তেমন দৃষ্টিতেই সে তারপর থেকে নতুন মাকে দেখছে। স্কুলে বন্ধুদের কাছে নারীপুরুষের গোপন সম্পর্কের পাঠ পাওয়ার পর অদ্ভুত জিঘাংসায় নতুন মা তার কাছে হয়ে উঠল পুরোপুরি কামনার নারী। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখত, নতুন মা শাড়ি গাছকোমর করে পুকুরে চিৎসাঁতার কাটছে। একজোড়া বুক সূর্যের দিকে উড়ে যেতে চাইছে। ভিজে লেপ্টানো শাড়ির মধ্যে কঠিন বৃন্তদুটি স্পষ্ট। পার্থিবর কিশোর শরীরে শিহরণ। কান ঝাঁ ঝাঁ করত। ঘরে এসে কাপড় ছাড়ার সময়ে সুযোগ পেলেই সে দরজার ফাটল দিয়ে নতুন মায়ের আঁটো-সাঁটো নগ্ন শরীর দেখার চেষ্টা করত। রাত্রে দরজার ফাটলে চোখ রেখে বাবা মায়ের মিলনদৃশ্য দেখা তার প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছিল। ঘুমন্ত পুঁচকেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার হত না। আলো জ্বালাই থাকত। বালক পার্থিব দেখত তার বাবার বিশাল শরীরের নিচে নতুনমা ছটফট করছে। এতে খুব আনন্দ হত তার।

কত রাত্রে সে স্বপ্ন দেখেছে, নতুনমার বুকে মুখ রেখে সে বালক কৃষ্ণের মতো সব দুধ শুষে নিচ্ছে। সারা শরীরের রক্ত দুধ হয়ে উঠে আসছে। সাদাটে মেরে যাচ্ছে নতুন মায়ের আদুড় গা।

যৌবনে বিপাশা কিংবা অন্য নারীর বুকে মুখ রেখে সে কল্পনায় নতুন মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখেছে। ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। নতুন মা অকালে মারা গেছেন। তার স্থূলজীবনেই, কিন্তু তাঁর উপরে হিংস্র প্রতিশোধস্পৃহা যায়নি পার্থিবর।

—থুবোর মোড়, টাকির মোড়! কণ্ডাক্টর হাঁকে, পার্থিব উঠে দাঁড়ায়। দেখে, বউটার পাশে বসে লোকটা বেশ মৌজে আছে। বাঁহাতের বাহুমূল ওর বুকের উষ্ণতা নিচ্ছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে পার্থিবর ইচ্ছে করে এক লাথি কষাতে

লোকটার মুখে। শালা হারামি।

বাস ঘুরে গেল হাসনাবাদের দিকে। পার্থিব শেষবার চেয়ে দেখল, মেয়েটা আবার আচার মুখে দিচ্ছে। একটা বড়সড় নিশ্বাস ফেলে সে চারদিকে তাকাল। তিনজন প্যাসেঞ্জার আর কয়েকটা ভ্যান রিক্সা। এখনো বৈকালিক দোকানপাট খোলেনি। খালি একটা চায়ের দোকানের উনুনে কয়লা পড়েছে। গুচ্ছের ধোঁয়া ছাড়ছে। পার্থিবর আবার মনে হল, শোভনবাবুরা দলবল নিয়ে এসেছেন তো? আগেরদিনই ওদের পৌঁছে যাওয়ার কথা। পার্থিব কলকাতার বাইরে থেকে আসছে। তবু কলকাতায় পৌঁছে তার একটা টেলিফোন করে জেনে নেওয়া উচিত ছিল, ওঁরা রওনা হয়েছেন কিনা। শুটিং বাতিল শেষ লগ্নেও হয়।

ভ্যানে বসে পার্থিব মনে মনে নিজেকে আখ্যা দিল, গাঁড়ল। আহা বিপাশা শুনলে কী খুশিই না হত। এটাই তো সে মনে মনে পার্থিব সম্পর্কে আওড়ায়। এটুকু ভাবলে সেও নিশ্চিন্ত। পরকীয়ায় পা বাড়াতে আরো সুবিধে হয়।

কলেজের মুখে যাত্রীরা নেমে গেল। ভ্যান কিছুটা এগিয়ে ইছামতীর পাড় ঘেঁষে এগিয়ে চলল। এ অঞ্চল তার একেবারেই অচেনা। সুন্দর জায়গা। নদীর ওপারেই বাংলাদেশ। সবুজ গাছপালাই শুধু চোখে পড়ে এপার থেকে। মাল বোঝাই ভারি নৌকো চলেছে শ্লথ গতিতে। জেলের জালের ভাসিকাঠে বসে আছে দুধসাদা বক। তীরে সার সার নৌকো যেন এখনো দুপুরের ঘুমে আচ্ছন্ন। তার চিত্রনাট্যে এক কিশোরের একের পর এক তীরে ভেড়ানো নৌকোয় লাফিয়ে যাওয়ার দৃশ্য আছে। পার্থিব ভাবছিল এখনই সে তার দলবলকে দেখতে পাবে—শোভনবাবু ক্যামেরাম্যান কিংবা অভিনেতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

ভ্যান সৈদপুর হাটখোলায় পৌঁছোল। এখানে সিনেমা শুটিংয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। শোভনবাবু এমনই বলেছিলেন। দুতিনজন ছেলেছোকরা গাছতলায় বসেছিল। মহাউৎসাহে ওরা জানাল, হ্যাঁ হ্যাঁ শুটিং তো চলছেই। ভাসানের পরদিনই হয়েছে। এখনও বোধহয় চলছে। জেনারেটর টেনারেটর তো লাগানো হয়েছে, ওরা নিজের চোখে দেখেছে। কিন্তু লোকজন এসেছে কি না? না, তা আসতে ওরা দেখেনি।

হয়ে গেল পার্থিবর। খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। একঘণ্টা হয়রান করে ইছামতী প্যাসেঞ্জার বাতিল করা হল। অতঃপর বারাসত লোকালে বারাসত। ভালো ভালো হোটেল ছিল। জিভে জল আসছিল তার। কিন্তু পাছে এক্সপ্রেস বাসটাও ছেড়ে বেরিয়ে যায়, এই ভয়ে সে পেটের খিদে পেটেই বন্দী করল। সময় নষ্ট, পয়সা নষ্ট, খিদেয় অস্থির। শোভনবাবুর ওপরে খুবই রাগ হয় তার। তবু চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করতে সে ওদের একজনকে পাকড়ে সাথে নিয়ে চলে।

পাড়ার ভেতরে গাছগাছালির ঠাস বুনোনের মধ্যে বাংলো ধাঁচের ছোট

দোতলা পুরোনো বাড়ি। পাশে সত্যিই ডায়নামো তারটার খাটিয়ে তৈরি। কুড়ি-বাইশ বছরের এক গ্রাম্য ছোকরা দাওয়ার তক্তপোশে ঘুমোচ্ছিল। ডাকাডাকিতে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। না, ওঁরা কেউ আসেননি।

ছেলেটা চট্‌পট্ দৌড়ে একটা চেয়ার নিয়ে এল আর ধপ করে বসেই পড়ল পার্থিব। ছেলেটা আশ্বাস দিল, চিন্তা কইরবেন না, বাবুরা হয়ত সন্ধ্যা বেলাতেই আসি যাবে। আপনি থেকি যান। কোনো অসুবিধা নাই। উপরে ঘর খুলে দিচ্চি।

পার্থিব খুব ক্লান্ত বোধ করছে। শোভনবাবু বা তার দলবল আদৌ এ যাত্রায় আর হাজরে দিচ্ছেন বলে ভরসা হয় না। এত ধকল সয়ে ফিরতেও মন চায় না। বাড়ি ফেরার ইচ্ছে আজ তার একেবারেই নেই। বিপাশার সাথে কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে নিত্যকার খিটিমিটির গণ্ডিতে আজ আর সে পা দেবে না বলেই মনে মনে তৈরি হয়েছে।

ওপরে উঠে তার সত্যিই ভালো লাগে। টালি ছাওয়া বারান্দা, কমোড বসানো অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুম। খাওয়ার টেবিল। অনেকগুলো বেতের চেয়ার। জমজমাট আসর বসানোর উপযুক্ত জায়গা। ওরা এলে কী মজাই না হত। রাত্রে মহিলাসহ হুইস্কির আসর। শুটিংয়ে চিত্রনাট্যকারের উপস্থিতি বিশেষ দরকার নেই। সে আসে এই হৈ-হুল্লোড়ের টানে। দমবন্ধ করা সংসারজাঁতার বাইরে এসে তার 'বেঁচে আছি' গোছের একটা চমৎকার উপলব্ধি হয়। অবশ্য শোভনবাবু সে এলে খুশিই হন। বিভিন্ন সময়ে তার মতামত নেন, গুরুত্ব দেন। আর বিপাশা এ নিয়ে চিন্তা করে না। অভিনেত্রীরা আর যাই করুক, কন্দর্প-কান্তি অভিনেতাদেরকে পেরিয়ে অভাগা—অন্তত পার্থিবর মতো অভাগা অপদার্থ চিত্রনাট্যকারকে বগলদাবা করবে না—এ বিশ্বাস তার আছে।

ছেলেটার নাম আলু। শুনে চমকে উঠতে ও চট্‌পট্ ব্যাখ্যা করে দিল—আসলি আমার নাম হইল গিয়ে অলক। সকলি ডাকনাম করি ফেল্যেচে আলু। তা থেকি যান বাবু। বাজার করি দেবেন, আমি রাঁধি দেব। পেলেট-গেলাস, হাঁড়িকুড়ি সব আছে।

থেকেই গেল পার্থিব। নির্জন পরিবেশে অজ্ঞাতবাসের অনুভূতি হচ্ছে। নতুন একটা প্লট মাথায় ঘুরছে। লেখার পক্ষে আদর্শ জায়গা। আলু চটপট হাটে গিয়ে মিল্ক ব্রেড আর রসগোল্লা এনে দিল। আলুকে ভাগ দিয়ে খেতে খেতে বারান্দায় বসে পার্থিব জায়গার বিশেষত্ব শুনছিল। ওই যে পঞ্চাশ গজ দূরে ভাঙা বাড়ি, ওটা জেনারেল শঙ্কর রায় চৌধুরির ভিটে। এই তো মাস দুয়েক আগে উনি এসেছিলেন। বাপ্‌রে, মিলিটারিতে ছয়লাপ। বাইরের লোক তো দূরের কথা, পাড়ার মানুষদেরও কাছে ঘেঁষতে দেয় না। আর কি যে তাদের খোট্টাই বুলি।

শেষে আলুরা ফুঁসে উঠল, আমাদের পাড়ার ছেল্যে তোমাদের জেনারিল, আর আমাদেরই যাতি দেবেনি? ভেবিছটা কি? তখন মিলিটারি কাবু।

আলু বেরিয়ে যায় বাবুর বাগান তদারকি করতে। বাবুরা থাকেন বালিগঞ্জে, কলকাতায়। এই বাড়ি, বাগান, জমি—সব দেখভালের দায়িত্ব আলুর ওপরেই ন্যস্ত। কম কাজ আলুর!

রোদ্দুর নরম হয়ে বিছিয়েছে গাছের পাতায়। আশেপাশে যে দু-চারটে বাড়ি আছে, তা বোঝাই যায় না, এমন নির্জন। বাড়ির লাগোয়া আম সজনে নারকেল গাছের ডাল বাড়ির দেওয়াল স্পর্শ করেছে। যেন হাত দিয়ে আছে স্নেহে, মমতায়। উঠোনের দুটো পেঁপে গাছের পেঁপে দিব্যি বারান্দা থেকে হাত বাড়িয়ে পাড়া যায়। এক কোণের থাম বেয়ে দিব্যি উঠে এসেছে মাধবীলতার ঝাড়।

নিজেকে ধনী মনে হয় পার্থিবর। কলকাতার বনেদী ধনী। এটা তার বাগান বাড়ি। তার আসার অপেক্ষায় সব সময় প্রস্তুত হয়ে আছে। ফরমাশ খাটার জন্যে, সেবা করার জন্যে হুজুরে হাজির চাকর, বাবু কখনো আসেন ইয়ারবন্ধু নিয়ে, কখনো পরিবার, কখনো একা। ধোঁয়া ধুলো থেকে দূরে, কারখানার শব্দ থেকে দূরে, গায়ে পড়া জনতা থেকে দূরে, পায়ে পা-বাধানো প্রতিবেশি থেকে দূরে। তখন বাবু একা। বাবুর ঘর ভালো লাগে না, সংসার ভালো লাগে না, অমন পাথর বসানো বাড়ি ভালো লাগে না, খাওয়ার টেবিলে বিলিতি পদ ভালো লাগে না—কিচ্ছু ভালো লাগে না। তখন বাবুর পাঁউরুটি আর রসগোল্লা প্রিয়। তখন বাবু সন্ধেবেলা বাংলা মদের গেলাস নিয়ে বসেন আর আলু গরম গরম বেগুনি ভেজে প্লেটে দেয়। বাবু, পার্থিব বাবু।

পার্থিবর মনে হয়, এমন জমিদারি স্বপ্ন সব মধ্যবিত্তই দেখে। সামন্তযুগীয় জমিদারির আকাশকুসুম বাসনা ধনী-দরিদ্র সকলের রক্তেই ভেসে বেড়ায়। যার আছে তার আজ থেকেও নেই। ইউনিয়ন, পার্টি, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। বরং যার নেই, সেই স্বপ্নসম্বলের জমিদারি নির্ঝঞ্ঝাট। যেমন খুশি ভেবে নাও।

পাশাপাশি তিনটে আরামকেদারা। তার একটায় বসে পার্থিব তার স্বপ্ন সাম্রাজ্য গড়ছে। মৃদুমন্দ বাতাসে ক্লান্ত দেহমন এলিয়ে পড়তে চায়। এমন একটা নিজস্ব বাড়ি তার দরকার, যার ঠিকানা বিপাশা জানবে না। প্রচুর গাছপালা সহ বিশাল বাগান, মাছ ধরার পুকুর।...

কোনো শিশুর চিল চিৎকারে পার্থিবর আচ্ছন্নভাব কেটে যায়। পিছনদিকের গাছপালার আড়াল থেকে কান্না ভেসে আসছে। কী জোর গলায়! কেঁদে যাচ্ছে, কেঁদেই যাচ্ছে। থামার নামটি নেই। বসে থাকা দুঃসহ হয়ে ওঠে তার। কান্নার শব্দ যেন তার দু-কানের পর্দায় দামামা বাজাচ্ছে। বীভৎসভাবে চিরে যাচ্ছে নির্জনতার বাতাস। পার্থিব পায়চারি করতে শুরু করে।

আলু ঢুকতেই জিজ্ঞেস করে পাথিব, কার বাচ্ছা এমন চিলের মতো চেঁচিয়ে কাঁদছে বাগানে ?

আলু সলজ্জ হয়, ও মোর ছেলি বাবু। হুই বাগানের পরে আমাদের ঘর কিনা।

—থামে না কেন ? পাথিব রীতিমতো অসন্তুষ্ট,—ওর মা নেই ?

—থাকবেনি কেন। দুখির জন্যি কাঁদে। হারামির ব্যাটা পেট করে এয়েচেন যেন জালা। দুটো মাইয়ের দুধ চেঁটে পুঁচেও পেট ভরে না। খালি চেল্লাবে।

—কৌটোর দুধ দিলেই পারিস। সহজ রাস্তা দেখায় পাথিব, চুপচাপ খালি ওর কান্না শুনিস বসে বসে ? আচ্ছা মানুষ তো তোরা ! বাপ-মা, না কসাই ?

—ও কেঁদি কেঁদি ঘুমিয়ে পড়বে, ব্যস সব চুপ। কোনো ঝামেলা নাই। আলুও সহজ সমাধান দেখিয়ে দেয়। তারপরই কেমন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে তার মুখ, —আর কৌটার দুধির কথা বলতিচেন ? একটা ছোট কৌটার দাম লাগি যাচ্ছে ধরেন পেরায় একশ টাকা। আগুন লাগিছে যেন। বলেন বাবু, আমাদের একবেলা আধপেটা হলি চলি যাবে। কিন্তু বাচ্চাটারে কি দিয়ে থামাই ? ইদিকে বাবু তো বাবু যেন আগের জন্মে জমিদার ছেল। এট্টু ফ্যান কি এট্টু বালি ধরি দিব, তা মুখ ঘুরাই নিবে।

শেষদিকে আলুর কথাগুলো যেন কান্নার মতো শোনায়। তারপর সংকোচে জবুথবু হয়ে বলে বাবু, আপনারা তো কত জায়গায় কত দান করেন, এই শিশুটারে এক কৌটা অন্তত দুধ দান করি দিতে পারেন না ?

বিরক্তি এবং অস্বস্তিতে কুঁচকে যায় পাথিবর মুখ। ছোটলোকগুলো এমনই। সব সময় পয়সা বাগানোর তাল খোঁজে। এদেরকে সমবেদনা জানাতে যাওয়া আহাম্মকি। থেকে খুব ভুল করেছে সে। পকেটে কয়েকশ টাকা আছে, দু-একটা দিন ফুর্তি করতে এসেছে। ব্যাটা তাল বুঝে চুরি করবেনা তো ? সতর্ক হয়ে বলে, আমি গরীব মানুষরে আলু, সে সাধ্য কি আছে আমার ? তুই পাঁচজনের কাছে চাঁদাপত্তর তোল। আচ্ছা আমি না হয় পাঁচটাকা দেব'খন।

আলু কথা বলে না। কেমন অদ্ভুত বিষণ্ণ হাসিরকুচি নীরবে ভাসিয়ে দেয় গুমোট পরিমণ্ডলে মৃদু বাতাসের মতো। একটা দুর্বোধ্য অস্বস্তি পাথিবর স্নায়ুকে আচ্ছন্ন করতে থাকে।

গুমোট কাটাতে পাথিব হঠাৎ অতিরিক্ত স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে—চল দেখি, হাটখোলায় বি এস এফ ক্যাম্পটা একবার ঘুরে আসি। ব্যাটারা এই ঘুণ-ধরা দেশটা কেমন রক্ষা করছে একবার দেখি।

হাটের গায়েই ইছামতীর পাড়ে বি এস এফ-এর ক্যাম্প। শরীর-জুড়ানো বাতাস। একটা বাঁশের মাচায় বসেছিল একজন সৈনিক। সাদা প্যান্ট, সাদা

রঙের স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে। ডিউটি-শেষের খোশমেজাজে আরাম করছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের অত্যাচারের নানা কাহিনী কাগজে পড়েছে সে। লোকটাকে দেখে কিন্তু তার আদৌ ভয়ংকর মনে হয় না। এগিয়ে গিয়ে বলে, একটু বসতে পারি ?

লোকটা এক মুহূর্ত তাকে যেন জরীপ করে নেয়। তারপর সহজভাবে বলে, জরুর।

অচেনা মানুষের সাথে আলাপ জমানোর অভ্যাস পাথিবর আছে। লোকটা প্রথমে গম্ভীর থাকার চেষ্টা করলেও ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসে। পাথিব জানে কারো মন পেতে গেলে, তার সমস্যার ওপরে সহানুভূতি দেখাতে হয়। বলে, সত্যি, বড় কষ্ট আপনাদের। কত ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত পাহারা দিতে হয়। অথচ সাধারণ মানুষ শুধু দূর থেকে বদনামই দিয়ে যায়।

লোকটা তুষ্ট হয়। এমন সমঝদার আদমির ওপরে কে না খুশি হয়। বলে, সে এই ক্যাম্পের দায়িত্বশীল বি এইচ এম। কিন্তু কোন্ দায়িত্ব পালন করবে সে ? বঙ্গাল মুলুকে রাজনীতির দাদাদের ঠ্যালায় আইনকানুন বলে কিছু আর নেই। আর আছে পুলিশ। তারা তো আইনের যম বললেই হয়।

নদীর মাঝবরাবর বেশ বড়সড় একটা মোটরবোটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে পাথিবর। ওই যে নৌকো ওটা বি এইচ এম-এর বিলক্ষণ পরিচিত। ওতে করে গুঁড়ো দুধের শত শত প্যাকেট ওপারে বাংলাদেশে চালান যাচ্ছে। বি এইচ এম কি করতে পারে ? পাকড়াও করলে হয়ত এখনই মুখের ওপর মেলে ধরবে ডি. এম.-এর অনুমতিপত্র—দুধ যাচ্ছে বসিরহাট থেকে ক্যানিং। কিন্তু কে-না জানে ঝুপ করে অন্ধকার নামলেই ফাঁক বুঝে ওটি ওপারে ভিড়বে। এপারের শিশুদের খিদের দুধ ওপারে চা আর খাবারের কাজে লাগবে। ওইসব পারমিশান দেনেওয়ালা অফিসারবাবুরা এই সেদিন গণেশ-ভগবানকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে কত পয়সা খরচ করে এল। তারা নাদান বাচ্চাদের মুখের দিকে কখনো তাকায় ?

অন্ধকার নেমে আসছে। সেন্ট্রি পোস্টে দাঁড়ানো জওয়ান টানটান হয়ে নদীর বুকে তাকিয়ে আছে। বি এইচ এম উদাস হয়ে যায়। তারপর বিড়বিড় করে বলে, বারুদই বলুক না, এমন নোকরি করতে ইচ্ছে করে ? হাতে অটোমেটিক রাইফেল কোন্ কাজে লাগবে, যদি কাগজের ফাঁদে তা আটকে যায় ?

বি এইচ এম উঠে ক্যাম্পের ভেতরে চলে যায়। রোল কলের সময় হয়েছে তার। পাথিব নদীর বুকে চেয়ে ঠায় বসে থাকে। বিপাশার কথা মনে পড়ে। বিয়ের পর বকখালি গিয়ে আসন্ন সন্ধ্যার নির্জনতায় সমুদ্রতীরে হুজনে বসেছিল তারা। হু-হু বাতাস, ভিজে মাটি আর গাছের গন্ধ বাতাসে। হোটেলে ফিরে বিপাশাকে নতুন করে পাওয়া—যেন সে শহরের নয়, যেন সে আজীবন গ্রামের

ছোঁয়ায় গড়া প্রাণময় মাটির নারী। তার শরীরে উদ্ভিদ, তার ভেতরে জল-তরঙ্গ……

কেন যে এমন দিনগুলো একদিন শেষ হয়ে যায়, কিছুতেই ফিরে আসে না আর ?

আপনা থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ে পাথিবর। তখন সে পিছনে চুড়ির রিণিঝিণি শুনতে পায়। গাঁয়ের বধূ কাঁখে কলসি নিয়ে ঘরে ফিরছে। মুখ ঘুরিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় পাথিব। পাতলা রোগা ফর্সা মেয়েটি খালি পায়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছে। কলসি-বেষ্টন করা বাঁ-হাত দুলছে আগে পিছে। তরঙ্গায়িত নিতম্ব আর বুক যেন ওই ক্ষীণ কটিদেশকে ভেঙে ফেলতে চাইছে। আবছা আঁধারে মেয়েটির মুখ সরস্বতী প্রতিমার মতো। নাকের পাতলা নোলকে আরো সুন্দর।

দূরত্বের সাথে অন্ধকারও বাড়ে। পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সদ্য তরুণী বৌটি। ওর মাটির দাওয়া পরিপাটি করে নিকোনো। এখন ও কি কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করবে ? স্বামীর দোষগুণ বিচার না করে কামনা করবে তার মঙ্গল ?

শূন্য থেকে শূন্যতর হয়ে ওঠে পাথিবর বুক। তার পরম লোভ হয় গাঁয়ের সেই কল্পিত মাটির ঘরের ওপরে। শাঁখাপরা স্নিগ্ধ দুটি হাত যেখানে গৃহকর্মে ব্যস্ত। উনুনে কাঠপাতার আগুনের আভায় তার সরল মুখচ্ছবি, ঘরে উনুখ শয্যায় শুধু নিবেদনের গুঞ্জনধ্বনি।

—বাবু ! আলু হাজির হয়, কি কি বাজার করি দিবেন—ছান, আমি রান্না বসাই ফেলি। পাথিব ওঠে।

এখনো বিজলিবাতি চালু হয়নি এখানে। হয়নি বলেই সন্ধ্যা এতো মায়াময়। কেরোসিন-লম্ফর ধোঁয়াওঠা শিখা। মাঝে একটা-দুটো হ্যাজাক যেন রাজার মতো ঝলমল করছে। হ্যাজাকের সোঁ-সোঁ শব্দ আর উজ্জ্বল আলোর এক নেশা আছে। পুরানো সামগ্রীর মতো। পুরানো দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাথিবর মনে। নন্দপুর বাজারে তখন মাত্র দুটি দোকানে হ্যাজাকলণ্ঠনের চল ছিল। ঘোতনবাবুর চা দোকান আর ভোঁদাবাবুর মুদিখানা। সন্ধ্যায় দুটি দোকানের দাওয়াতেই আড্ডা বসত বড়দের। উজ্জ্বল আলোয় সকালের বারবার পড়া খবরের কাগজটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাই পড়ত। এমন আলোয় পড়ার আনন্দই যে আলাদা, স্কুল পড়ুয়া পাথিবর খুব ইচ্ছে করত ওদের মতো বড় হয়ে উঠতে, অমন জাঁকিয়ে বসে সন্ধ্যার মৌজটুকু চাখতে।

মুদিখানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাথিব। আলু তার নির্দেশ অনুযায়ী কেনাকাটা করছে। বড় বড় গাছের মাথায় দু-একটি আলোর রশ্মি পড়ে অন্ধকারকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। কিছু দূরে একটা গাছের নিচে দু-একজন মানুষের অসংলগ্ন সংলাপ। ওদের মধ্যে একজন দেশলাই জেলে বিড়ি ধরাতে পাথিবর

নজরে আসে বোতল আর গ্লাস। ধেনো মদের আসর। পাথিব খুব একা হয়ে যায়। পাথিবর গলায় আকণ্ঠ তৃষ্ণা তীব্র তাগিদ দেয়।

বাংলোয় ফিরে আলু রান্নার জোগাড় করতে থাকে। বারান্দা এবং ঘরে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। এমন অন্ধকারে পাড়ার আনাচে কানাচে চোর-পুলিশ খেলার সময় হত পরীক্ষার পর। কখনো দল বেঁধে, কখনো বা জোড়ায় জোড়ায় লুকিয়ে পড়া, মনের মতো সঙ্গিনী হলে, নিবিড়তর আত্মগোপনের ঢঙে তাকে জাপ্টে ধরা, কপট ভীতির বাতাবরণ তৈরি করা, তার আধফোটা শরীরের খুঁটনাটি হাতের অনুভবে জানার অদম্য ইচ্ছা। কামনার চেয়ে অনেক বেশি ছিল তখন কৌতূহল। হাঁদুখুড়োর মেয়ে রূপসীর সাথে তার মিলত ভালো। ওদের খড়ের গাদার পিছন দিকে একটা খোঁদল মতো তৈরি হয়েছিল। বিচালি টেনে টেনে বের করে নিলে গাদার পেটে এমন অগভীর গহ্বর তৈরি হয়। সেখানেই চোর-পুলিশ খেলার মাঝে প্রথম রূপসীর ফ্রকের নিচে হাত ছোঁয়ানোর সুযোগ। কৌতূহলের শেষ বিন্দুতে পৌঁছাতে রাজিও হয়ে গেছিল রূপসী। আর সেই মুহূর্তে ভয় পেয়ে গেল পাথিব। নিদারুণ ভয় তাকে তাড়া করল। ওই অবস্থায় রূপসীকে ফেলে পালিয়ে গেল সে।

তারপর থেকে রূপসী আর কখনো তাকে পাত্তা দেয়নি। পাথিব ক্রমশ আকুল হয়েছে তার টানে। কিন্তু রূপসী ফিরেও তাকায়নি। রূপসীর সঙ্গী হল নরেন। নরেন পাথিবর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। একদিন আপত্তিকর অবস্থায় ধরাও পড়ল দুজনে। তারপর পাড়াময় হুলুস্থুল। কিশোরী জীবন শেষ হয়ে গেল রূপসীর। তারপর সবাই একদিন ভুলেও গেল সে কথা। পাথিবর চোখের সামনে দিয়ে রূপসী লাল টুকটুকে চেলি পরে বরের পেছন পেছন চলে গেল শ্বশুরঘর করতে। চন্দনচর্চিত বাসি মুখ। নাকে উজ্জ্বল নোলক-পরা অবস্থায় রূপসীকে সেই প্রথম দেখা গেল। খুব কষ্ট হচ্ছিল পাথিবর।

বিষণ্ণ অন্ধকারে পাথিব কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। কিছুটা দ্বিধার পর আলুকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, এখানে ভালো বাংলা মদ পাওয়া যাবে ?

—কেন পাওয়া যাবেনি ? চোলাই তো ?

—না না, চোলাই নয়, ওসব খেতে পারব না। এই ধর, ফেরিনি কোম্পানির দিশি মদ।

—সে তাহলি বাবু থুবোর মোড় যাতি হবে। দাম বেশি পড়ি যাবে। তারপর ধরেন, আসা-যাওয়া ভ্যানভাড়া, তাও বারো টাকা।

—তা হোক, নিয়ে আয়। মানিব্যাগ থেকে একশ টাকার একটা নোট বের করে পাথিব আলুর হাতে দেয়,—পুরো বোতলই আনিস। একটা পাতিলেবু, একটু গোলমরিচ, আর পেলে একটা লিম্‌কা আনবি। আদা তো ঘরেই আছে।

আর হ্যাঁ, একটু ব্যাসন আর বেগুন। বেগুনি ভাজা হবে। দরকার হলে আর একটু সর্ষের তেল কিনে নিস।

দ্রুত বেরিয়ে যায় আলু। পার্থিব ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। রূপসীর কথা মনে পড়ছে খুব। রূপসীকে সে বোধহয় ভালোই বেসে ফেলেছিল। বড় হয়ে নিজের অতীত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বারবার এমনটি মনে হয়েছে তার। বিয়ের পর প্রথম যখন বাপের বাড়ি এল রূপসী, কি ঢলোঢলো রূপ তার। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখেছিল পার্থিব, পাকা গৃহিণীর মতো এর ওর সাথে হাসিমুখে কথা বলছে। অল্পদিনেই নিটোল মুখে লাবণ্য ঝলমল করছে।

এরপর আরো দু-তিনবার রূপসীকে দেখেছে সে, কিন্তু কথা হয়নি কখনো। শুধু বুকের মধ্যে না-পাওয়ার যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠেছে। আজ এতদিন পর তার খুব ইচ্ছে করছে, রূপসীকে জোর করে বুকে টেনে এনে বলে, রূপসী, আমি তোকে ভালোবাসি।

কিছুক্ষণ আগে নদীর ধারে দেখা কলসীকাঁখে গ্রাম্য বধূটিই তার মনে রূপসীর স্মৃতিকে উস্কে দিয়ে গেছে। তেমনই টিকোলো নাকে বড় নোলক, তেমনই ফর্সা রঙ, পানপাতা মুখ, গভীর টানা দুটি চোখ।

রূপসীর কথা ভাবতে ভাবতে কখন পার্থিবর দুচোখের পাতা এক হয়ে আসে। পার্থিব দেখে রূপসী বাপের বাড়ি এসেছে। এতবছর পরেও যেন আগের মতোই আছে সে। ওদের খড়ের গাদার পিছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একা পার্থিব রূপসীর সান্নিধ্যের স্মৃতি হাতড়াচ্ছিল। এমন সময়ে এল রূপসী। চোরের মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। তার সামনে নতমুখে অনুতপ্তা রূপসী দাঁড়িয়ে। পার্থ, আমি তোমায় চিনতে পারিনি। আমি ভুল করেছি। পার্থ···

দুহাত বাড়িয়ে পার্থ তার রূপসীকে বুকে টেনে নিচ্ছে। তৃষ্ণাকুল দুটি ঠোঁট প্রবেশ করছে আরো দুটি ওষ্ঠাধরের ধারাময়ী অন্তঃপুরে। বিড়বিড় করে ওঠে পার্থিব, রূপসী, আমার রূপসী···রূপসী···রূপসী···

—বাবু, ঘুমাই পড়লেন নাকি? কি বলতিচেন? ঘরের কথা মনে পড়িচে বুঝি?

মাথা তুলে চোখ কচলায় পার্থিব। নিশ্বাস দ্রুত হয়ে আছে, নিজেই বুঝতে পারে। চোখ রগড়ায়। রূপসীর উপস্থিতি যেন এখনো জড়িয়ে আছে বাতাসে। ঘরের মধ্যে অন্ধকারে যেন লুকিয়ে আছে সে। ঘামে জামা ভিজে গেছে তার।

আলুর মুখজোড়া হাসি। হাতে বোতল। ঠক্ করে সামনের ছোট্ট টেবিলে নামিয়ে রাখে,—এই নেন। অনেক কষ্ট করি পেলাম। কিছুতেই দিবেনি। একটাই ছিল যে।

খুব দ্রুত পান করতে থাকে পার্থিব। গলা কাঠ হয়েছিল তেষ্টায়। অনেকদিন

পর এমন জাঁকিয়ে বাংলাখাওয়া। আলু বেগুনি ভেজে দিয়ে যায় প্লেটে করে। খেতে খেতে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে পার্থিবর। শিরায় রক্ত চলকায়। রূপসীর জন্যে মন কেমন করে। বিপাশার অবহেলার কথা মনে আসে। কদর্য মনে হয় তার মুখ।···নতুন মা।···নতুন মায়ের শরীরে শুধু কাঁচা মাংস।···নদীর ধারে রূপসীর আদল নেওয়া বৌ···তুলসীতলা, সন্ধ্যাপ্রদীপ, শাঁখাসিঁদুর···তার গোবরনিকানো ঘরে ঘাম তামাক আর মাটির মিশ্রগন্ধ···

সঙ্গ কামনায় অধীর হয়ে ওঠে পার্থিব। বোতল আরো খালি হয়।

গরম গরম ভাত আর ডিমের ঝোল। খেতে খেতে আলুর দিকে তাকায় পার্থিব। শরীর বেশ টলছে তার। মদ আনতে দেওয়ার সময় যেটুকু দ্বিধা ছিল, তা আর নেই। বলে, তোদের গাঁয়ের মেয়েরা খুব সরল রে আলু।

—তা যা বলিচেন। আলু বেশ গর্বভরে বলে, শহরের মতন নিজেদের বিরাট পারা ভাবে না। এই আমার বউয়ের কথাই বলি, মারি ধরি, রা-টি কাড়বেনি। শহরে তো শুনি, মেয়েরাই কর্তা।

—একটা ব্যবস্থা হয় না?

—অ্যাঁ? আলু ভালো করে বিষয়টা যেন বোঝার চেষ্টা করে।

পার্থিব ঘোলাটে চোখে চেয়ে থাকে ওর মুখে। আলু চিন্তিত হয়, তা চেষ্টা করলি হয়ত—তবে গাঁ-গেরাম তো, রাজি করানো সহজ নয়। তা ধরেন, রাজি হলি অনেক টাকা লাগি যাবে!

—আরে ধুর টাকা! টাকার মায়া করে কি হবে?—পার্থিব এখন নবাব,—জীবনটা হল উপভোগের। টাকার চিন্তা কি? বল্, কত টাকা?

—একশ টাকা তো লাগবেই বাবু।

—কোই বাৎ নেহি। ব্যবস্থা কর।

খেয়ে দেয়ে আলু বলে, তবে যাই বাবু, দেখি।

পার্থিবর মনে এখন সেই ভরন্ত বুকের নেশা। মুখের আগল নেই তার। আলুকে সেকথা বলতে আলু অর্থপূর্ণ হাসে,—সেকি আর বলি দিতে হয়, এত টাকা খরচ করি কি আর বাজে জিনিস আনব? সে তখন দেখি নেবেন।

আলু চলে গেলে বিছানায় কাত্ হয়ে সিগারেট ধরায় পার্থিব। সারাদিনের ক্লান্তি আর মদের গুণে দুচোখ জুড়ে আসতে চায়। প্রচণ্ড সঙ্গ তৃষ্ণা তাকে জাগিয়ে রাখে। বাইরে গাছে গাছে অসংখ্য হীরের কুচির মতো জোনাকি। আকাশভরা তারা।

বাচ্চাটার চিল-চিৎকার ভেসে আসে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় শব্দ আরো তীক্ষ্ণ, আরো স্পষ্ট। মেজাজ চড়ে যায় পার্থিবর। বিড়বিড় করে অদেখা শিশুকে ধমকায়, চোপ্ শালা, মারব মুখে এক লাথি। ঘড়ি দেখে, রাত্রি মাত্র সাড়ে দশটা। এর

মধ্যেই পাড়া-গাঁয়ে যেন মধ্যরাত নেমে এসেছে। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ জেগে ধড়মড় করে উঠে বসে। বাচ্চাটার কান্না আর শোনা যাচ্ছে না। আলুর ফেরার নাম নেই। ব্যাটা বোধহয় ফাঁকি দিল। রাগ হয় খুব তার। আবার শুয়ে পড়ে। ঘুমটা নষ্ট হয়ে গেছে। ছটফট করছে শরীর।

ঘুমানোর চেষ্টা করতে করতেই সে বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনতে পায়। ফিস্‌ফিস্ কথা। শরীর হিম হয়ে যায় তার। চোর-ডাকাত নয়ত? আলু যাওয়ার সময় নিচে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আসা উচিত ছিল তার।

দুম্ করে ভেজানো-দরজা খুলে যায়। আতঙ্কে শুধু স্থির দৃষ্টি মেলে থাকে পার্থিব। যেন পিছনে কোনো ধাক্কা খেয়ে ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ে বৌটা। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে যায়। পার্থিবর রক্ত ছলকে ওঠে। মৃদু আলোতেও সে চিনতে পারে, সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে দেখা সেই গ্রাম্যবধূ। মাথা নিচু করে পায়ের দিকে চেয়ে আছে।

পার্থিব শয্যা থেকে নামে। দু-পা এগিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটা নিচু স্বরে আর্তনাদের মতো বলে, বাবু আমারে ছেড়ি দ্যান্। আমি এ-সব পাপ কখনো করি নাই।

ওর মুখে রূপসীর লুকোচুরি। পার্থিব পরম মমতায় উঁচু করে ধরে ওর মুখ। আবিষ্ট গলায় বলে—ভালোবাসায় পাপ কি? আমাকে ভয় পেয়োনা। আমি বড় কাঙাল। একটু ভালোবাসা দাও।

মেয়েটা মুখ তুলে দেখে পার্থিবকে। পার্থিবর গলায় থরো থরো আবেগ ছিল। মেয়েটাকে মোহ স্পর্শ করে। তার প্রতিরোধ আলগা হতে পার্থিব বুকে টেনে নেয় তাকে। বাঁহাত বাড়িয়ে নিবু নিবু করে দেয় টেবিলল্যাম্পটা। এই আঁধারে এখন সে ফিরে যেতে চায় তার গ্রামে। আজ সে এই রমণীর শরীরের প্রতি বিন্দুতে রূপসীকে খুঁজবে।

চমৎকৃত হয় পার্থিব। ওর বুকে মুখ রেখে আবিষ্কার করে ওর মাতৃত্ব। সুমিষ্ট ক্ষীণ দুধের প্রস্রবণ। শিশু হয়ে যায় সে। দামাল হয় তার যৌবন।

তাকে পরিপূর্ণ শান্ত করে চলে যাওয়ার আগে পার্থিব তার হাতে একশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিতে ভুল করে না। খুব ক্লান্ত পদবিক্ষেপে ও চলে যায় দরজা খুলে। পার্থিব আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। অজস্র তারায় সজ্জিত আকাশ। ওর এক-একটা যেন তার শৈশব কৈশোর যৌবনের এক-এক খণ্ড প্রতিচ্ছবি। বর্তমানের শূন্যতায় বুক ব্যথা করে তার। রিক্ত বর্তমানের শূন্যগর্ভে শুয়ে সে ক্রমশ পিছনের দিকে সরতে থাকে।

সকালে ওরা এসে হৈ-হৈ করে ঘুম ভাঙাল তার। শোভনবাবু, শ্রীলতা, সন্দর্ভ —সবাই হাজির। ভোর থাকতে গাড়ি স্টার্ট করেছে। শ্রীলতা গ্রীবাভঙ্গি করে বলল, আহা, পার্থদা হয়ত এখন একটা লম্বা রোমান্টিক স্বপ্নের ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, দিলেন তো সুতো কেটে।

সন্দর্ভ বারান্দার প্রায়-খালি বাংলার বোতলটা দেখিয়ে বলল, তা, রোমান্টিক স্বপ্ন দেখার মতো আয়োজনই বটে। একাই বোতল প্রায় শেষ করে ফেলেছ। এলেম আছে গুরু তোমার।

হাঁকাহাঁকিতে আলু হাজির। ঝোলা থেকে বের হল নতুন দুধের কৌটো, চা-পাতা চিনি, শোভনবাবু বললেন, বেশ জুত্ করে চা বানা আলু। দুধ একটু বেশি দিস।

নতুন দুধের টিন দেখে হঠাৎ দুধ-বুভুক্ষু বাচ্চাটার কথা মনে পড়ল পার্থিবর। ভোর থেকে বহুবার ঘুম ভেঙেছে তার। সকালের দিকে সে আর তেমন করে ঘুমোয়নি। উঠে জল খেয়ে আবার শুয়েছিল। গতরাত্রে অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে কিছুটা আচ্ছন্ন ভাব ছিল। কিন্তু এর মধ্যে একটিবারও সেই অস্বস্তিকর তীব্র কান্নার শব্দ শোনেনি সে।

চা খেতে খেতে পার্থিবর মনে হয়, আলু বোধহয় অতিরিক্ত দুধ দিয়ে ফেলেছে। চায়ের চেয়ে দুধের ভাগ বেশি। দুধের এত দাম, বরং র-চা খাওয়াই ভালো। এক কৌটো দুধ আলুকে দান করার কথা শোভনবাবুকে বলে দেখবে কিনা ভাবে। শোভনবাবু হয়ত তার কথা হেসেই উড়িয়ে দেবেন।

চা-পর্বের পর শুরু হয় কাজের ব্যস্ততা। শোভনবাবু সকলকেই তাড়া লাগান। শ্রীলতা সন্দর্ভরা মেক্-আপে বসে যায়। ক্যামেরা, লাইট সেট করা হতে থাকে।

বেলা বাড়ছে। ব্যস্ত আলু এদিক ওদিক করছে। পার্থিব ওর কাছে সহজ হতে পারছে না। তার সব আবরণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে ওর কাছে। আলুও যেন তার সামনে আসা একটু এড়িয়েই চলছে। তাকাচ্ছে না তার দিকে। ওর কাছে নিজেকে ছোট মনে হয় তার। এর মধ্যেই সে আলুর বাচ্চাটার কান্না শোনার জন্যে কান খাড়া করে। কিন্তু একবারও শুনতে পায় না। আশ্চর্য, এত বেলা হল, ছেলেটা কি আজ যাদু বলে চুপ মেরে গেল?

এক ফাঁকে আলুকে সামনে পেয়ে পার্থিব সহজ হওয়ার চেষ্টা করে,—কি রে আলু, তোর ছেলেটা আজ আর চেল্লাচ্ছে না? কি ব্যাপার?

আলু লজ্জিত হেসে জবাব দেয়, আজ যে কৌটার দুধ পাচ্ছে বাবু। ব্যাটা পরাণ ভরে খাচ্চে।

—হঠাৎ কৌটোর দুধ কোথা থেকে এল? শোভনবাবু দিল নাকি?

—তা কেন, সক্কালবেলা সতুজ্যেঠুরে ডাকি দোকান খুলিয়ে এক কৌটা

কিনে আনলাম না।

—সে কি! সে তো একশ টাকার ব্যাপার। সাতসকালে কোথায় পেলি?

আলু চুপ করে থাকে। পার্থিবর মনে প্রবল সন্দেহ হয়। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ম্যানিব্যাগ বের করে টাকা গুনে দেখে।

—আমি চুরি করি না বাবু। আলুর কথা যেন জলের ভেতর থেকে উঠে আসে। চোখ তুলে তাকায় পার্থিব। আলু মাথা নত করে আছে। থমথমে মুখ যেন কোনো অব্যক্ত যন্ত্রণায় অধীর। বিদ্যুৎচমকের মতো তার মনে হয়, তবে কি কাল রাতে এক কৌটো দুধের আশায়···মেয়েটি আলুরই···

চাপা আর্তনাদের মতো সে বলে, আলুউ—

নীরব আলুর চোখ দিয়ে টপাটপ্ দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে পার্থিবর। দ্রুত ঘাটের দিকে পা বাড়ায়। খোলা বাতাসে একটু দম নিতে না পারলে সে মরে যাবে। পিছনে শোভনবাবু তখন শ্রীলতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আহা আর একটু এক্সপোজ করো, এটা কমার্শিয়াল ফিল্ম···

বি এস এফ ক্যাম্পের সামনে নদীর পাড়ে ইতস্তত জটলা। সকলের চোখ নদীর বুকে। বি এইচ এম গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে নদীর মাঝবরাবর তাকিয়েই।

গম্ভীর বি এইচ এম তার প্রশ্নের উত্তরে জানায়, ভোর রাতে দুটো বিশাল মোটর বোট বে-আইনী বেবিফুডের বস্তা বোঝাই করে বাংলাদেশে পাচার করতে যাচ্ছিল। বি এস এফ-এর তাড়া খেয়ে তাড়াহুড়োয় নৌকোর মুখ ঘোরাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ধাক্কা লাগিয়ে বসে। দুটো নৌকোরই অতল সমাধি হয়েছে। মাঝিরা অন্ধকারে সাঁতার দিয়ে পালিয়েছে।

পার্থিব জিজ্ঞেস করে, কত বস্তা দুধ হবে সার?

—কোন জানে! পানশো—সাতশো—হাজার—

হাজার বস্তা দুধ! শিউরে ওঠে পার্থিব। তীক্ষ্ণ চোখে নদীর মাঝে তাকায়। বি এস এফ এবং জলপুলিশের কয়েকটা নৌকো নোঙর ফেলে ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। অন্যান্য নৌকো বা লঞ্চকে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। অনেক দূর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে তারা।

পার্থিবর স্নায়ু চঞ্চল হয়। অস্থির ভাবে বলে, দুধগুলো উদ্ধার করা যাবে না?

বি এইচ এম মাথা নাড়ে, নেহি সার। সবেরেমে ডুবোরি এল। ওভি পারল না। আউর দুধ কিত্না সময় থাকবে? ওতো পানিমে মিলে যাবে।

হাজার বস্তা দুধ জলে গুলে যাবে? পার্থিব চোখের ওপরে হাত রেখে দেখার চেষ্টা করে। ওখানে জল কি সাদা হয়ে যাচ্ছে দুধের মতো? কিছু করার নেই? কাতর হয়ে বলে, বি এইচ সার, কোনোভাবে উদ্ধার করা যায় না কিছু দুধ?

আমাকে একবার নিয়ে যাবে ওখানে?

—নেহি সার। বেগর পারমিশান হামি ভি যেতে পারবে না। ডেপুটি কমাণ্ডাণ্ট সার খুদ উধার হ্যায়।

পার্থিব শুনতে পায় ক্যাম্পের ওয়্যারলেসে ঘন ঘন বার্তা আদান প্রদান হচ্ছে। হতাশ ভাবে চেয়ে থাকে সে নদীর বুকে।

কোথা থেকে এক শিশুর কান্না বয়ে আনে বাতাস। চমকে ওঠে পার্থিব। এ কোন্ আলুর সন্তান? এরও কি এক সমুদ্র দুধের খিদে?

কেঁদেই চলে বাচ্ছাটা। পার্থিবর বুক ঘন ঘন ওঠে নামে। চারিদিকে যেন শিশুর কান্না ঝম্ ঝম্ করে বাজে। হঠাৎ সে দেখতে পায়, ছোট্ট পার্থিব একটু দুধের জন্যে একা বসে কাঁদছে, নৈবেদ্য কাঁদছে, আলুর ছেলে কাঁদছে। চতুর্দিকে অজস্র ক্রন্দনরত ক্ষুধিত শিশুর মুখ।

পার্থিব দেখে, জোয়ার ডাকা নদীর মাঝখানে দুধের স্রোত। এক এক শিশুর মুখের গ্রাস এক একটি স্রোত জমে অসংখ্য ঢেউ। অসংখ্য পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গেভরা দুধের সমুদ্র তার নাগাল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। দূরে—আরো দূরে·····

বিড়বিড় করে পার্থিব,—না-না, যেতে হবে—যেতেই হবে! তারপর ঝাঁপ দেয় প্রবল জলে।

বি এইচ এম চিৎকার করে বলে, বীরবাহাদুর, বোট খুলো, বাবু পাগল হোগয়া হ্যায়—জলদি।

অজস্র কোলাহলের মধ্যে পার্থিব স্রোতের মুখে ভেসে চলে—দুধ সমুদ্রের দিকে।

বীরেন্দ্র গুপ্ত

—

বিয়ের ফাঁদে

হনিমুনে এসেছে রজত আর মণিকা দার্জিলিং-এ। কলকাতা থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত প্লেনে। সবই আগে থেকে ভাল করে প্ল্যান করা ছিল। দার্জিলিং-এ একটা পাঁচতারা হোটেলে ডাবল্ বেডরুমের স্যুইট্ বুক করাও হয়েছে। আর সেই সঙ্গে হিমালয় মোটর সার্ভিস থেকে সারাদিনের জন্য ড্রাইভার সমেত একটা গাড়ি। রেন্টাল কার বাগডোগরা এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিল। ঐ গাড়িতেই সড়ক পথে দার্জিলিং-এ এসেছে ওরা—উঠেছে এভারেস্ট হোটেলে। মণিকার ইচ্ছে মতই সব করা হয়েছে। হনিমুনের দিনগুলো বেশ কাটছে এক এক করে। ঠিক করে এসেছে ওরা, দিন পনেরো এখানে কাটাবে। ওরা রোজ নানা জায়গায় চলে যায়। গাড়িতে কখনও নিচে, কখনও ঘুরে ঘুরে চা বাগান দেখে কখনও প্ল্যান্টার্স্ ক্লাব, কখনও বা মাউন্টেনিয়ারিং স্কুল দেখা। প্রথম প্রথম নেপালি ড্রাইভার, বাহাদুর চালাতো আর রজত মণিকা পেছনে বসতো। পরে মাঝে মাঝে চালাত মণিকাও। রজত আপত্তি করতো, কিন্তু মণিকা মানতো না। বাহাদুর ভরসা যোগাতো—'কোন ভয় নেই স্যার, আমি তো পাশেই আছি!' পরে দেখলো মণিকার হাত বেশ পরিষ্কার, মনে হ'ল 'হিল ড্রাইভিং'-এ আগের অভিজ্ঞতা আছে। মণিকা বলে—বাবা যখন দার্জিলিং-এ পোস্টেড্, তখন গাড়ি চালাতাম।

সেদিন মণিকা খুব ভোরে উঠেছে। জানালা খুলে দেখে আকাশ খুব পরিষ্কার। মনে হচ্ছে সারাদিনটা আজ খুব ভাল যাবে! খুব ভাল আবহাওয়া থাকবে! রজত ঘুমোচ্ছেন তখনও। 'রজত, রজত' বলে ডাকতেই রজত চোখ বুঁজেই বললো—

—কি এত সকালে? কী ব্যাপার?

—দেখ সকালটা কি ব্রাইট্, চলো এক্ষুনি বেরিয়ে যাই, একটা 'মর্নিং ড্রাইভ' করে আসি কাছে কোথাও থেকে!···ওঠো না তাড়াতাড়ি, চেঞ্জ্ করে নাও···

বলেই পাশের ঘরে চলে যায়। তার অল্পক্ষণ পরেই তৈরি হয়ে রজতের কাছে আসে। তখনও দেখে রজত আড়মোড়া ভেঙে গড়াগড়ি দিয়ে বিছানার শেষ সুখটুকু নিংড়ে নিচ্ছে। চটে গিয়ে সে বলে—

—এখনও উঠতে পারোনি! ঠিক আছে, তুমি শুয়েই থাকো—আমি একাই একটু ঘুরে আসছি! বলেই হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায় মণিকা।

মণিকার বেরিয়ে যাওয়ার দু-চার মিনিট পর রজতের হুঁস হলো, সত্যিই বেরিয়ে গেল নাকি! ঝটপট্ উঠে, জামা কাপড় বদলে নিচে নেমে আসে। দেখে, বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছে। বাহাদুরকে জিজ্ঞেসা করে, গাড়ি কোথায়?

—স্যর গাড়ি নিয়ে তো মেমসাব বেরিয়ে গেলেন। রোজকার মত আজও ভোরে গাড়ি ধুয়ে, তেল মোবিল সব চেক করে গাড়ি রেডি করে রেখেছিলাম, মেমসাব বললেন বেরোবেন—

—তুমি সঙ্গে গেলে না কেন?

—আমি যেতে চেয়েছিলাম স্যর, কিন্তু উনি বললেন, কাছ থেকেই অল্পক্ষণ পরে ঘুরে আসবেন।···তা স্যর, আপনি কিছু ভাববেন না, ওঁর 'ড্রোইভিং'-এর হাত খুব ভাল!

রজত উপরে চলে যায়, কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তাড়াতাড়ি সারাদিনের মত তৈরি হয়ে নেয়। নিচে নেমে এসে রেন্টাল কার সার্ভিস থেকে আরেকটা গাড়ি নিয়ে বাহাদুরকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে মণিকার খোঁজে। পুলিশকেও জানায়। পুলিশ বেতার সংযোগে সব 'পোস্ট'গুলোকে জানিয়ে দেয়। পুলিশের গাড়ি সব দিকে ছড়িয়ে গিয়ে খোঁজ আরম্ভ করে। দিনের শেষে পুলিশ যে খবরটা নিয়ে আসে, সেটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। মণিকার চালানোর সময় গাড়িটা কেন জানি হঠাৎ বেসামাল হয়ে যায়। গাড়িটা কয়েকবার এদিক ওদিক করতে করতে একেবারে সোজা পড়ে যায় অনেক নিচে খাদে। খাদে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটায় আগুন ধরে যায়। ঐ অবস্থায় চালকের বাঁচার সম্ভাবনা কম। তবুও উদ্ধারের কাজ চলছে—কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। 'রেস্ক্যু-পার্টি' যা উদ্ধার করে আনে সেটা সনাক্ত করা সহজ নয়। গাড়িটায় যে রকম ভাবে আগুন ধরে যায় তাতে সম্পূর্ণ কোন মৃতদেহ পাওয়া অসম্ভব—পাওয়া যায় কেবল পোড়াকঙ্কালের অবশিষ্ট একটু অংশ। হাতের কঙ্কাল—দুহাতে দুখানা বালা—যা বিয়ের রাতে রজত মণিকার হাতে পরিয়ে দেয়। তা থেকেই রজত বোঝে সব শেষ। মণিকা আর নেই। নিয়মমাফিক পুলিশ সব হেফাজতে নেয় আর মণিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

রজত আর দার্জিলিং-এ থেকে কি করবে? পুলিশও তার কলকাতায় ফিরে আসায় কোন আপত্তি করে না। দুদিন পরেই রজত কলকাতায় ফিরে আসে তার ফ্ল্যাটে। খবরটা অনেক আগেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিল। আত্মীয় চেনা পরিচিতি কেউ কেউ এয়ারপোর্টে এসেছিল। তারপর কয়েকদিন অনেকেই এসেছে দেখা করতে। শোক প্রকাশ বা সমবেদনা জানাবার মত ভাষা কারুর

মুখে নেই। কেউ পিঠে হাত রেখে, বড়রা কেউ কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে আবার কেউবা হাতে হাত নিয়ে কিছুই না বলে চলে যেতে লাগলো। একমাত্র ব্যাংক-এর চীফ্ জেনারেল ম্যানেজার বললেন—তুমি যতদিন চাও ছুটিতে থাকতে পার। 'গো টু সাম্ কোয়ায়েট প্লেস এ্যাণ্ড কাম্ ব্যাক্ ওয়েন ইউ লাইক। আর কিছু দরকার হলে আমাকে জানাতে সঙ্কোচ কোর না।' তবু মন কি মানে? আস্তে আস্তে রজত আবার স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে।

একদিন সকালে ওর সঙ্গে দেখা করতে এলো প্রভাত সাহা—ইন্সিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট। সাধারণ কয়েকটা কথা যা এ অবস্থায় হয় তা বলার পর কাজের কথায় এলো প্রভাত সাহা।

—স্যর মনে আছে, বিয়ের পরই আমি আপনাকে দিয়ে দশ লাখ টাকার একটা জয়েণ্ট্ ইন্সিওরেন্স করিয়েছিলাম।—আপনি পঁচিশ হাজার টাকার একটা চেকও দিয়েছিলেন ফার্স্ট প্রিমিয়ম হিসেবে। তারপরই আপনি চলে যান—আপনাকে আমি পলিসিটাও দিতে পারিনি।···তারপর দেখুন কোথা থেকে কি হয়ে গেল। তা আমি পলিসিটা এনেছি, আর ক্লেম ফর্মটাও ফিল আপ করে এনেছি। আপনি শুধু সই করে দেবেন, তারপর বাকিটা আমি···

কথাটা শেষ করা হলো না, রজত একেবারে ভেঙে পড়লো।

—আপনি ওসব ছিঁড়ে ফেলে দিন। টাকা নিয়ে আমি এখন কি করবো।

—আ-হা-হা, আপনি একেবারে ভেঙে পড়বেন না। একটু শান্ত হোন আপনি। আমি তো জানি, আপনি নিজের জন্য ইন্সিওর করেন নি—করেছিলেন ফিউচার প্রভিশ্যনের জন্য। আর জয়েণ্ট পলিসি করেছিলেন বয়সের বেনিফিট্ পাওয়া যায় বলে। আর···আর আমার কথাতেই তো এ্যাকসিডেণ্ট্ ডাব্ল্ বেনিফিট যোগ করেছিলেন। সবই তো ভবিতব্য বই নয়!

—তবু কেন মনে মনে খুব খারাপ লাগছে।

—দেখুন স্যর, আপনার যা মনের অবস্থা তাতে প্র্যাকটিক্যাল ভিউ নেওয়া খুব কষ্টকর। তবু আমার কথাগুলো ভাল করে শুনুন আর ভেবে দেখুন। আপনি যদি ক্লেমটা ছেড়েও দেন, তাহলে কার লাভ। মোটা টাকা একেবারে অদানে অব্রাহ্মণে যাবে। টাকা পেয়ে যদি আপনি ভোগ না করতে চান, তাহলে আপনি কোন সৎকাজে দান করে দেবেন—কোন হাসপাতালে, কোন ইস্কুলে বা অন্য কোন ভাবে। বন্ধু হিসেবে আমার অনুরোধ, টাকাটা এরকম ন দেবায় ন ধর্মায় যেতে দেবেন না। আপনি কথাটা ভেবে দেখবেন।···ক্লেম ফর্মটা সই করে রাখবেন। আর প্রয়োজনীয় কাগজগুলোও ঠিক করে রাখবেন। আজ আমি চলি, আবার কয়েকদিন পর আসবো।

তিন চার দিন পর আবার প্রভাত সাহা এলো। এবার দেখলো রজত আরও

একটু স্থির হয়েছে। প্রভাতকে রিসিভ করে বসতে বলে। প্রাথমিক দু-একটা কথা হওয়ার পর প্রভাতই কথাটা পাড়লো।—

—আমার কথাগুলো ভেবে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, আপনার কথামত ক্লেম ফর্মটা সই করে, কাগজপত্রগুলোও জুড়ে রেখেছি। দেখুন সব ঠিক আছে কিনা!

কাগজপত্র সব হাতে নিয়ে প্রভাত এক এক করে সব দেখতে থাকে।···হ্যাঁ, এই পুলিশ রিপোর্ট···ডেথ্ সার্টিফিকেট···ক্লেম ফর্ম···হ্যাঁ সব ঠিক ঠিক লেখা হয়েছে···সই···হ্যাঁ করেছেন···ও মিঃ চৌধুরী আপনার দুটো সই-ই চাই··· আপনার অফিসিয়াল সই আর চৌধুরী করেছেন, আপনার পুরো নাম সই চাই··· আর আপনি সইটা এক জায়গায় করেছেন—ওটা দু-জায়গায় করতে হবে।··· করে দিন···

কাগজগুলো প্রভাতের হাত থেকে নিয়ে রজত ঐরকম সই করে প্রভাতের হাতে আবার কাগজগুলো ফিরিয়ে দেয়।

প্রভাত কাগজগুলো হাতে নিয়ে আবার চেক করে, বলে, 'এখন সব ঠিক আছে। আমার সামনেই সই করলেন, তাই উইট্নেস্ হিসেবে আমি সই করছি।' এটা একটা ফর্মালিটি মাত্র। কাগজগুলো ব্রীফ্ কেসে ভরে উঠে দাঁড়ায়। যাবার মুখে বললো, 'আপনি এই সপ্তাহের মধ্যেই ইন্সিওরেন্স অফিস থেকে খবর পাবেন।'

যেমন কথা তেমন কাজ। কয়েকদিন পরই ইন্সিওরেন্স অফিস থেকে রিজিওনাল ম্যানেজার চন্দন লাহিড়ী ফোন করলেন।

—মিস্টার চৌধুরী আপনার ক্লেমটা পাশ হয়ে গেছে, আপনার চেকও রেডী। আপনার চেক্টা বড় এমাউণ্টের—ডাব্ল্ এ্যাকসিডেণ্ট্ বেনিফিট বলে কুড়ি লাখ টাকা। এরকম চেক্ আমরা পোস্টে বা তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে পাঠাই না।···তা আপনি যদি একটু কষ্ট করে আমার অফিসে আসেন, তাহলে চেকটা ডিরেক্টলি আপনার হাতে দিতে পারি।

'কখন?'—'এই ধরুন, কাল সকাল এগারোটায়।'

—বেশ তাই হবে।

রজত কখনও এ্যাপয়েণ্ট্মেণ্ট্ ফেল করেনি, এবারও না। কথামত ঠিক এগারোটার সময় রজত চন্দন লাহিড়ীর অফিস চেম্বারে ঢুকলো। চন্দন লাহিড়ী রজতকে বসতে বলে। সোজা কথায় নামলো চন্দন লাহিড়ী—

—মিঃ চৌধুরী, আপনার অপেক্ষায়ই ছিলাম।···সমস্ত ব্যাপারটার জন্য আমরা সকলেই খুব দুঃখিত।···তা আপনার চেক্ রেডী আমার কাছে আছে।···চেক্টা হ্যাণ্ড-ওভার করার আগে ছোট একটা ফর্মালিটি—আপনি এই রসিদটাতে আপনার পুরো নামটা সই করে দিন।

রসিদটা হাতে পেয়ে মিঃ লাহিড়ী বললেন, 'ঠিক আছে রসিদটা, আর এই নিন আপনার চেক্‌টা' বলে চেক্‌টা যেই রজত চৌধুরীর দিকে বাড়িয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ লাহিড়ীর ঘরে ঢুকলো একজন পুলিশ অফিসার আর বললো, 'মিঃ লাহিড়ী, হোল্‌ড্ ইট। মিঃ চৌধুরী, ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট। এই আপনার এ্যারেস্ট ওয়ারেণ্ট্। মণিকা মিত্রের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। তার পিছনে আপনার হাত আছে। আপনি আমাদের সঙ্গে লালবাজারে চলুন। সেখানেই সব জানতে পারবেন!'

রজত এখন লালবাজারে পুলিশ হেফাজতে। তার কৌস্থলী মিস্টার সামন্তের পরামর্শ, সে যেন শুধু মণিকা মিত্রের ঘটনা সম্পর্কে যা জানে তাই যেন পুলিশকে বলে। যেন সত্যকথা বলে, মিথ্যার আশ্রয় না নেয়। ওয়ারেণ্ট্-এ শুধু মণিকার কথা আছে, কাজেই এর বাইরে পুলিশকে সে কোন কথা বলতে বাধ্য নয়। সে সব কথা যেন আদালতে তোলা হয়।···কিন্তু কৌস্থলির কাছে কোন কথা সে যেন গোপন না করে। পুলিশ যখন জিজ্ঞাসাবাদ করে, সে আইনজ্ঞের পরামর্শ মত কাজ করেছে। তাছাড়া সে নিজেও খুব উচ্চশিক্ষিত—এম. কম. চার্টার্ড্ অ্যাকাউণ্টেণ্ট্ আর যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। কাজেই পুলিশের জেরার মোকাবিলা করায় তার খুব অসুবিধে হল না।···

আর যখন একা তখন ভাবে অতীতের কথা—এই তো মাত্র দেড় বছর আগে কলকাতায় এসেছে। এসেছে ব্যাঙ্ক অফ্ সিঙ্গাপুরের কলকাতার মেন শাখায়। চীফ্ ফিনান্স্ এ্যাণ্ড অ্যাকাউণ্টস্ কণ্ট্রোলার হিসেবে। এই শাখায় প্রথম যেদিন যোগ দেয়, সেদিন চীফ্ জেনারেল ম্যানেজার টমকিন্ সাহেব নিজে ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। সবাই দেখলো একজন সুন্দর সুপুরুষ কেমন টান টান হয়ে চলে। আস্তে আস্তে সবাই দেখলো চোখে মুখে বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ—হাঁটা-চলায় কি আত্মবিশ্বাস। এই বয়সেই কত উন্নতি করেছে—বয়েস এমন কি আর হবে, এই চৌত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ অথবা তার একটু কমও হতে পারে। কলকাতায় আসার আগে কানপুরে ছিল—এক বহুজাতিক কোম্পানিতে, সেখানেও ছিল ফিনান্স্ ম্যানেজার। সেখানে বেশ ছিল—কিন্তু মাঝখান থেকে হঠাৎ কি যে হয়ে গেল। ঐ চাকরি করতে করতেই বিয়ে করে আর বিয়ের বছর খানেকের মধ্যে এক আকস্মিক-দুর্ঘটনায় স্ত্রীকে হারান। আর ভাল লাগল না কানপুরে।—একটা স্মৃতির তাড়নায় কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়ল সে। ঠিক করলো, কানপুরে আর থাকবে না। যখন কোয়ালিফিকেশন্ আছে, তখন চাকরির আর চিন্তা কি! কানপুরের চাকরিতে ইস্তফা দিল। দক্ষ অফিসার—কোম্পানি প্রথমে ছাড়তে চায়নি, কিন্তু রজত ছেড়ে যাবেই। অগত্যা বড় সাহেব রাজী হলেন। বিদায়কালে বললেন—

'মনে রেখো মাই ডোর ইজ্ অলওয়েজ ওপেন টু ইউ। কানপুর ভাল না লাগে, অন্য যে কোন ভাল পোষ্টিং পেতে পার—দিল্লি, বম্বে বা বাইরে কোথাও হংকং, সিঙ্গাপুর। ইউ হ্যাভ্ টু জাস্ট আস্ক্ ফর ইট।'

তারপর কয়েকমাস এদিক ওদিক ঘুরে শেষে কলকাতায় এই ব্যাঙ্কে। এসে কয়েকদিনের মধ্যেই কাজের আবহাওয়া বদলে ফেলেছে! কাজ ছাড়া ও যেন কিছুই বোঝে না। সব সময়ই নিজে কিছু করছে বা কারুর সঙ্গে কাজের কথা বলছে। কাজের বাইরে কোন কথা নেই, কাজের বাইরে কোন চিন্তা নেই।

কাজের শেষে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যায়। একা থাকে। ফ্ল্যাটে আছে এক কুক্-কাম্-বেয়ারা আর একজন জমাদার দিনে একবার এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। বিল্ডিং-এ নতুন এসেছে—কারুর সঙ্গে সে-রকম মেলামেশা নেই। লিফ্‌টে কারুর সঙ্গে দেখা হলে শুধু 'গুড মর্ণিং' বা 'হ্যালো'—আর কোন কথা নয়। কখনও কখনও ক্যালকাটা ক্লাবে যায়। সেখানেও খুব কম কথাবার্তা হয়। লাইব্রেরি ঘরে একটু বসে তারপর খানিকক্ষণ বারান্দায় একা বসে কখনও বৃষ্টি পড়া দেখে অথবা বই'র পাতা ওলটায় অথবা চা, কফি কিংবা 'বিয়ার' খায়। তারপরই ফিরে যায় ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটে ফিরে আবার বই-ম্যাগাজিন পড়া বা ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের রেকর্ড শোনা।

পোশাক পরিচ্ছদে বেশ রুচি-সম্পন্ন আধুনিকতা, হাঁটা চলায় দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের ছাপ, কাজে-কর্মে সুদক্ষ, কথা-বার্তায় খুব স্পষ্ট কিন্তু ঔদ্ধত্যের বা অহমিকার চিহ্ন নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বাইরের কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। একটা নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব। হাতে যখন কাজ থাকে না—এমন ঘটনা অবশ্য খুব কম—তখন কেউ কেউ দেখেছে সে ঘরের 'সিলিং'-এর এক কোণের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সেও খুব অল্প সময়ের জন্য। তারপরই সম্বিৎ ফিরে আসে আবার কাগজপত্রে বা ফাইলে মন দেয়।

নানা বয়সের নারী-পুরুষ নানা রকম লোক ব্যাঙ্কে আছে—সকলের সঙ্গে সম্পর্ক হল একেবারে খাঁটি ওয়ার্ক রিলেশন্‌শিপ। অনেক সময় কেউ কেউ কাজের ব্যাপারে ওর কাছে এসেছে আর তার জের টেনে একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু বৃথা। লোককে কাছ থেকে কথার কৌশলে সরিয়ে দেওয়ার 'আর্টটা' রজতের খুব ভাল করে জানা। তাই কারুর মনে কোন আঘাত না দিয়ে এবং সম্পূর্ণ ভদ্রতা রক্ষা করে যার যেখানে জায়গা তাকে ঠিক সেইখানে বসিয়ে দেয় রজত। সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না। আজকাল তো অনেক ভাল ভাল ঘরের 'মডার্ন' 'সফিস্টিকেটেড' মেয়েরাও ভাল ভাল অফিসে কাজ করে। এ ধরনের মেয়ে ব্যাঙ্ক অফ্ সিঙ্গাপুরেও আছে। অলকা বক্সী, চাঁদনী মেহেরা, রেশমী সিক্কেও আছে। রজতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, বা রজতের একটু কাছাকাছি হওয়ার কম্পিটিশন

অলকা-চাঁদনী-রেশমীর মধ্যেও হয়। কিন্তু কেউই কোন সুবিধে করে উঠতে পারেনি। এহেন লোক নিয়ে মানুষের জল্পনা-কল্পনারও শেষ নেই। একথাও লোকের কানে এসেছে, রজতের আর ঘর বাঁধবার কোন সখ নেই। কী আর বয়েস—এ বয়েসে কি আবার বিয়ে করা যায় না? বাইরের দু-একজন বন্ধু-বান্ধবও বোঝাবার চেষ্টা করেছে। তোমার সামনে কত বড় ভবিষ্যৎ পড়ে আছে—জীবনটাকে তুমি এভাবে নষ্ট করবে? কিন্তু রজতের দৃঢ়তায় কেউই ফাটল ধরাতে পারেনি।

এইভাবে চলেছে দিন; লোক আস্তে আস্তে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। অলকা-চাঁদনী-রেশমীও রজতের ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তারা নূতন শিকারের দিকে নজর দিয়েছে।

ব্যাঙ্কে যেমন কাজ চলে রোজ, তেমনি চলছে। একদিন একটি মেয়ে রজতের চেম্বারের বাইরে বেয়ারার হাতে তার কার্ড দিয়ে সাহেবকে দিতে বলে। কার্ডে সুন্দর অক্ষরে ছাপা নাম—মণিকা মিত্র, অ্যাকাউন্টস্ এক্জিকিউটিভ, প্রাইম্ ওভারসীজ এক্সিম্ ট্রেডিং (আদ্যক্ষরে পি. ও. ই. টি অর্থাৎ 'পোয়েট')। বেয়ারা রজতের চেম্বার থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে হাত দেখিয়ে ঢুকতে বলল।

সাধারণ সৌজন্য বিনিময়ের পরই রজত কাজের কথায় এলো। 'হোয়াট্ ক্যান্ আই ডু ফর ইউ?'

মণিকাও একজন দক্ষ অফিসার। সোজা একগোছা কাগজপত্র সামনে রেখে উত্তর দিল। 'আমরা একটা 'শিপমেণ্ট' জাপানে পাঠিয়েছি—তারই 'ডকুমেণ্টস্' সব এনেছি। ব্যাঙ্ক অফ্ টোকিও-র উপর এল. সি., বিল অফ্ লেডিং, 'কাষ্টমস্ সার্টিফিকেট', 'প্যাকেজিং লিষ্ট' এবং আমাদের ইন্‌ভয়েস্ সব এর মধ্যে আছে।

—এতো রুটিন ম্যাটার, কাগজপত্র তো লোক দিয়েও পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কোন অসুবিধে হতো না। তা ছাড়া 'পোয়েট' তো আমাদের পুরোনো বড় কাষ্টমার। উত্তর দেয় রজত।

—সাধারণত এসব ডকুমেণ্টস্ আমরা লোক দিয়েই পাঠিয়ে থাকি, রেগুলার প্রসেস্‌এ সব ঠিক হয়ে যায়। তবে এবার আমাদের এম. ডি. আমাকে বলেছেন, আমি যেন আপনার কাছে নিয়ে আসি ইমিডিয়েট্ অ্যাটেনশনের জন্য। এই শিপমেণ্ট-এর ইনভয়েস ভ্যালু হলো প্রায় পাঁচ লাখ ডলার। আর আট-দশ দিন পর হংকং থেকে আমাদের একটা ইম্‌পোর্ট শিপমেণ্ট এসে পৌঁছচ্ছে। তার জন্য আমাদের প্রায় সাড়ে তিন লাখ ডলার লাগবে। কাজেই জাপানে 'পেমেণ্ট'টা আমাদের পাওয়া খুব দরকার। 'তা না হলে' হংকং পার্টির কাছে আমাদের পোজিশন খুব খারাপ হয়ে যাবে। তাই—

—আই সি, আপনাদের কেস্‌টা প্রকাশ চাওলার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যদি কিছুর দরকার হয়, তাহলে চাওলা আপনাকে ফোন করে জানাবে।—আচ্ছা তাহলে···গিভ্ মাই রিগার্ডস্ টু ইওর এম. ডি. মিস্টার বার্কলি!

এরপর মণিকাও বেরিয়ে যায়।

ব্যাঙ্কে কেস যত আসে তার প্রত্যেকটির উপর রজতের সজাগ দৃষ্টি। মণিকার কাগজগুলোকে বিশেষ করে দেখার জন্য রজতের কোন আগ্রহ ছিল না। তবু কয়েকদিন পর রজত চাওলাকে ইণ্টারকমে একবার জিজ্ঞেস করে একেবারে রুটিন হিসেব।

—আচ্ছা চাওলা, 'পোয়েট'-এর কিছু খবর এসেছে?

—হ্যাঁ স্যর, আমি আপনার কাছেই আসছিলাম। ব্যাঙ্ক অফ্ টোকিও পেমেণ্ট রিলিজ করেছে—ফুল পেমেণ্ট উইদাউট্ এনি ডিডাকশন। আজকেই পার্টির একাউণ্টে ক্রেডিট্ হচ্ছে।

—বেশ, 'পোয়েট'কে জানিয়ে দাও ফোনে!

আবার আগের মতই সব কাজ চলছে। সাতদিনের মাথায় মণিকা আবার এলো রজতের কাছে। রজত মণিকাকে বসতে বলে। কোন ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করে—

—এবার কি ইম্‌পোর্ট ডকুমেণ্ট্‌স্?

—হ্যাঁ ঠিক তাই! হংকং-এর জাহাজ এসে গেছে। কালই মাল সব আনলোড করা হয়েছে। এই সব ডকুমেণ্ট্‌স্—দেখবেন সব ঠিক আছে। হংকং ব্যাঙ্কে পেমেণ্ট জমা দিতে হবে।

—এবারের কেস্‌টা অনেক সিম্পল্। 'পোয়েট'-এর অ্যাকাউণ্টে যথেষ্ট ফাণ্ড্‌স্ আছে। কাজেই কালকের মধ্যেই হংকং ব্যাঙ্কে ফাণ্ড্‌স্ ট্রান্সফার হয়ে যাবে। আচ্ছা একটা কথা, পেমেণ্ট করার জন্য কেন এত ব্যস্ততা?

—আসলে, আমাদের প্রিন্সিপাল্‌স্ হংকং ট্রেডিং কর্পোরেশন সব চেয়ে বড় এজেন্সী হাউস। চায়না, ফার ইস্ট্ আর সাউথ্ ইস্ট এশিয়ার পুরো মার্কেট কণ্ট্রোল করে। শুধু 'প্রম্প্ট্ পেমেণ্ট্'-এর ভিত্তিতে ওরা এজেন্সী রেটিং করে। আমাদের পেমেণ্ট্‌টার খবর ওদের কাছে পৌঁছবার পরই আমরা ওদের কাছ থেকে দশ মিলিয়ন ডলারের অর্ডার পাব। তাছাড়া জানেনই তো আমাদের এম. ডি. একজন খুব ভাল পে-মাস্টার। আচ্ছা, তাহলে চলি—থ্যাংস্ ফর ইওর কো-অপারেশন।···

বলেই মণিকা রজতের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কথাবার্তা খুব সংক্ষিপ্ত, কাজের বাইরে একটি কথাও নয়। এরপরও মণিকা কয়েকবার ব্যাঙ্কে এসেছে, তবে সব সময় রজতের কাছে নয়। কখনও প্রকাশ চাওলার কাছে আবার কখনও ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেণ্টের অশোক খাস্তগীর বা অন্য কারুর কাছে। অবশ্য

দু-চার বার রজতের কাছেও। তবে যখন রজতের ঘরে গেছে, তখন সকলেরই দৃষ্টি একবার সেদিকে গেছে। এরকম ভাবেই দিন যাচ্ছে তারপর একদিন···

রজত মারুতি গাড়ি চালিয়ে অফিসের থেকে ফেরৎ পথে দেখে মণিকা ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে এত বার মণিকা রজতের অফিসে আসা যাওয়া করেছে তাতে তার নাকের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়াটা খুব অশোভন। মণিকার সামনে গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে বলে, 'উঠে আসুন'। মণিকা গাড়িতে উঠলে রজত বলে, 'আমি থাকি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে, বলুন আপনাকে কতদূর লিফ্‌ট্ দিতে পারি?' মণিকা বলে, 'থ্যাঙ্কস্, আমি থাকি যোধপুর পার্কে। আমাকে অবশ্য মাঝখানে একজনকে কতকগুলো কাগজপত্র দিতে হবে! তাই একটা ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে একটা ট্যাক্সি ধরিয়ে দিলেই চলবে!'

রানী রাসমণি রোড ধরে চলতে গিয়ে এসপ্লানেডের কাছাকাছি জায়গায় একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল! রজত গাড়ি থামালে মণিকা নেমে বলে, 'থ্যাঙ্ক্‌স্ ফর্ দ্য লিফ্‌ট্···সি ইউ···বাই।' তারপর ট্যাক্সিতে উঠে মণিকা চলে যায় সোজা আর রজত ধরে পার্ক স্ট্রীট্।

আরও কয়েকদিন পর আবার বাড়ি ফেরার পথে রজত দেখে মণিকা দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সির অপেক্ষায়। আকাশে মেঘ, বৃষ্টিও পড়ছে দু-এক ফোঁটা। গাড়ি থামিয়ে রজত দরজা খুলে দেয়। বলে—

—'বৃষ্টিতে আর ভিজবেন না, গাড়িতে উঠে আসুন।' এ হেন সুযোগ হারানো যায় না—আকাশে যে রকম মেঘ! মণিকা গাড়িতে উঠে পড়ে চট্‌পট্। গাড়ি চালিয়ে দিয়ে রজতের কথা সুরু—

—আজ আমি যাচ্ছি গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে। চলুন আপনাকে আজ আপনাদের বাড়ি যোধপুর পার্কে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—আপনি আবার এতটা দূর যাবেন?

—আকাশে যেরকম মেঘ তাতে মনে হয় রাস্তাতেই বৃষ্টি নেমে যাবে। মেম-সাহেব, জলে ভেজার চেয়ে আমার 'কম্পানি'টা নিশ্চয়ই কম কষ্টদায়ক হবে।

এতদিনে অবশ্য ওদের দূরত্বটা খানিকটা কমে গেছে—সম্পর্কটাও অনেক সহজ হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তাও বেশ সহজ হয়েছে, কিন্তু অন্তরঙ্গতা হয়নি। অফিসিয়াল গন্ধটা এখনও পুরোপুরি যায়নি। এখন দুজন দুজনকে নাম ধরে সম্বোধন করে—এটা আজকালকার মারকেন্‌টাইল কালচার। তবে কথাবার্তার মধ্যে অনেক ইংরেজি কথা থাকে বলে তুমি-আপনির বিরোধটা আসে না। কথায় কথায় যোধপুর পার্ক এসে গেল, মণিকার নির্দেশ মত রাস্তা ঘুরে সঠিক ঠিকানায় গাড়ি থামায় রজত। দরজা খুলে মণিকা নেমে যায়।

—থ্যাংস্ রজত, ওল্ড ইউ কাম ইন ফর এ কাপ অফ টি?

—না, আজ থাক! পরে আরেকদিন হবে—কেমন—?···বাই।

—বাই···

ঐ পরের দিনটা এবার বেশ তাড়াতাড়িই এলো। এবার রজত সরাসরি প্রস্তাব দেয়। 'চলো ক্লাবে যাওয়া যাক্'—মণিকাও আপত্তি করে না। ক্লাবে ঘণ্টাখানেক কি দেড়ঘণ্টা কাটিয়ে ওরা বেরিয়ে যায়। ক্লাব থেকে বেরিয়ে মণিকা ট্যাক্সি নেয়। রজতও চলে যায় নিজের ফ্ল্যাটে, নিজের মারুতি গাড়িতে। এরপর রজত আর মণিকার মধ্যে দেখা বেশ ঘন ঘন হচ্ছে—কাজে আর কাজের বাইরেও। দুজনে একসঙ্গে বেরিয়েও যায়। আর শুধু ক্লাবে যাওয়া নয়। কখনও যাচ্ছে 'ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে', কখনও মিউজিক কন্‌ফারেন্স বা কখনও ইংরেজি ড্রামাটিক শো! আবার কখনও কখনও শহর থেকে একটু বাইরে ডায়মণ্ড হারবার বা কোন 'কান্ট্রি ক্লাবে'। তারপর একদিন তাজ বেঙ্গলে ডিনারে। হলে অল্প আলো, হাল্কা মিউজিক, বেশ রোমান্টিক পরিবেশ। খুব বেশি লোকের ভিড় হয়নি! এককোণে ওদের একটা টেবিল বুক্ করা ছিল। সুশীতল কক্ষে বসে বেশ ভাল লাগছিল দুজনের। রজত আস্তে করে মণিকার হাত ধরে বলে—

—মণি, তোমার কাছে হেরে গেছি!

—কেন রজত, কি ভাবে?

—তুমি আমার মনের কথাটা জেনে ফেলেছ, কিন্তু আমি এখনও তোমার মনের নাগাল পাইনি!

—সেকি আমার তো মনে হয়েছে, আমিই তোমার কাছে ধরা পড়ে গেছি!

—মণি, তোমাকে তো সব কথাই বলেছি! যখন কলকাতায় প্রথম আসি, তখন ঠিক করে ফেলেছিলাম, না আর নয়। সংসার করা আমার জন্য নয়।··· কিন্তু তুমিই আবার আমাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে আরম্ভ করলে! তাই বলছি···আমরা কি পারি না···আবার

—আমাকে একটু ভাববার সময় দাও রজত।

—ঠিক আছে, ভেবেই তোমার উত্তর দিও···তবে খুব বেশিদিন আমাকে সাস্‌পেন্সে রেখো না।

ডিনার শেষ হয়ে গেছে। কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে দুজনে উঠে পড়ে। হোটেল থেকে বেরিয়ে দুজনের মধ্যে আর কোন কথা নয়। রজত ওঠে নিজের মারুতি গাড়িতে আর মণিকা তার অফিসের গাড়িতে।

রজত যখন ফ্ল্যাটে পৌঁছলো তখন প্রায় রাত সাড়ে এগারোটা। জামা কাপড় বদলে সোফায় একটু বসলো! ভাবছিল, বিয়ের কথাটা কি খুব তাড়াতাড়ি বলা হয়ে গেল! আর কিছুদিন পরে কথাটা পাড়লে কি ভাল হতো না?···না, না··· দেরি করলে কি বড্ড বেশি দেরি হয়ে যেত না?···এই সব নানা কথা তার মনকে

দোল দিচ্ছে। রজত এখন আর সোফায় বসে নেই, কখন যেন তার অজানতেই উঠে পায়চারি করতে থাকে। এমন সময় বেজে উঠলো টেলিফোনটা···

—হ্যালো···

—এখনও ঘুমোয়নি রজত? মণিকার ফোন।

—এই তোমার কথাই ভাবছিলাম মণি! এত রাত্তিরে ফোন?···

—আমি তোমার কথায় রাজি। কাল অফিসের পর সুইমিং ক্লাবে আসতে পারবে? কিছু কথা আছে···

—কি কথা মণি?

—আমাদের দুজনেরই আরেকটু পকিক্কার হয়ে নেওয়া দরকার। কালই সব কথা হবে···গুড নাইট।

রজতের ঘুম আসছিল না। একটা 'কামপোজ' খেয়ে শুয়ে পড়লো।

রজত সুইমিং ক্লাবের মেম্বার নয়—তবে আগে কয়েকবার এখানে এসেছে অফিসের পার্টিতে বা অন্য কোন ব্যাপারে। মণিকাই এখানকার মেম্বার। অফিসের পর রজত আসে সুইমিং ক্লাবে। লবিতে আগে থেকেই মণিকা বসে একটা ম্যাগজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। রজতকে আসতে দেখে দুজনে একটা কোণ-টেবিল বেছে বসে। মণিকা অর্ডার দেয়—চা, চিকেন প্যাটিস আর মাফিন।

কথা আরম্ভ করে রজত।—বলো, কি জন্য এই জরুরী তলব?

কথাবার্তা একেবারে সোজাসুজি মণিকার।

—দেখ রজত, আমাদের জানাশোনা খুব বেশি দিনের নয়। কাজের সূত্রেই আমাদের আলাপ—তারপর সেখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি এতদূর এগিয়ে এসেছি। আমাদের পরস্পরকে জানা-টা আরো একটু স্বচ্ছ হওয়া দরকার।

—তাহলে মণি বিয়ের জন্য আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদের?

—না না অপেক্ষা খুব বেশি করতে হবে না। আমরা পরস্পরকে জানা-জানিতে যতদূর এগিয়েছি তাতে বিয়েটা করে ফেলা যেতে পারে। আর পরস্পর-কে আরো ভাল করে জানার পালাটা সুরু হবে তারপর।

—তুমি কি ঠাট্টা করছো?

—না না, আই এ্যাম্ ডার্ন সেরিয়াস! তারপর জানোই তো, ম্যারেজ ইজ নট এ জোক! আমার কথাগুলো খুব ভাল করে শোনো, তাহলে দেখবে, দেয়ার ইজ লট অফ্ গুড সেন্স ইন হোয়াট আই সে···

—আচ্ছা বেশ বলো···

—বিয়েটা হবে খুব সিম্পল্—রেজিষ্টি করে হবে। বিয়ের পর যেমন একটা রিসেপশন হয় তেমনি···তারপর হনিমুন! বিয়ের পর আমরা এক ফ্ল্যাটে থাকবো যাতে আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি আরো কাছে থেকে। শুধু ক্লাবে বসে আর

দূরে কোন রেস্তরাঁয় বসে কি মানুষ চেনা যায়! মানুষ চিনতে হলে জীবনকে এক সঙ্গে দেখতে হয়।

—তাহলে তো সবই ঠিক আছে, তবে আর কথা কি?

—না, না, রজত আমার কথা এখনও শেষ হয়নি! আমরা এক ফ্ল্যাটে থাকবো, কিন্তু এক ঘরে নয়। এ রকম চলবে মাসখানেক কি মাস দুয়েক। তারপর তুমি তোমার স্বামীত্ব ফলাতে পারবে আমার ওপর।

—এতো একেবারে বিয়েতে বিপ্লব! এর কারণ?

—তা চারদিকে এত বিপ্লব হচ্ছে—শিল্প-বিপ্লব, কৃষি-বিপ্লব, সাংস্কৃতিক-বিপ্লব—তা বিয়েতে একটা বিপ্লব হলে ক্ষতি কি? বরং একটা লাভ আছে—যদি বিয়ের পরে পরেই কোন গরমিল ধরা পড়ে তাহলে দুজনেই একেবারে অক্ষত অবস্থায় দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারবো। কারুরই কোন আক্ষেপ থাকবে না!

—তাহলে কি এটা একটা কণ্ট্রাক্টি ম্যারেজ হবে?

—না না, তা কেন? কণ্ট্রাক্টের কি দরকার—যেমন সিভিল ম্যারেজ হয় তেমনি হবে। আর বাকি যে সব কথা হলো তার জন্য তো মুখের কথাই যথেষ্ট। একেবারে যাকে বলে জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট্। কি রাজী?

—বেশ, রাজী তোমার সব কথায়। তোমার কথামত দু-এক মাস কেন আমি আরো দু-চার মাস অপেক্ষা করতে পারি।

—সো বি এ গুড্ বয়! তাহলে এবার ওঠা যাক্। তুমি মাসখানেকের মধ্যে তারিখটা ঠিক করে ফেল আর কালই চলো ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন অফিসে নোটিশ দিয়ে আসা যাক্—

তারপর বিয়ে, রিশেপ্শন হনিমুন···

রজত যে চিন্তার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল, তা থামলো একটা ঘন্টার শব্দে। পর পর শুনলো রজত···এক, দুই, তিন···দশ, এগারো, বারো। রাত বারোটা হলো। এবার একটু ঘুমোতে হয়, কাল সকালে তো পুলিশ রজতকে আদালতে উপস্থিত করবে।

এর মধ্যেই বাংলা ইংরেজি সব কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় রজত চৌধুরীর ছবি সমেত ছাপা হয়েছে। প্রথমদিন সকল স্তরের লোক আদালতের সামনে হাজির। আদালত ভর্তি লোক। বিচারক আদালতে প্রবেশ করার পর আসন গ্রহণ করলে সকলেই বসলো। ওঁর আদেশে আদালতের কাজ আরম্ভ হলো। যথারীতি শপথ বাক্য পাঠ করার পর বিচারক তমোনাশ ভট্টাচার্য পাব্লিক প্রসিকিউটারকে চার্জগুলি পেশ করতে বলেন।

পাব্লিক প্রসিকিউটার মিঃ নৃসিংহ ভাদুড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিচারকের উদ্দেশ্যে

বলেন, 'ইওর অনার, আমার প্রাথমিক বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত। আসামী রজত চৌধুরী একজন সুন্দর স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। তাছাড়া খুব মেধাবী ছাত্র ছিল সে। সে খুব বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষ। তার কর্মকুশলতা সব সময়ই কতৃপক্ষকে মুগ্ধ করেছে। সব মিলিয়ে তার যে গুণ তাতে তার ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এর জন্য চাই একটু ধৈর্য—আর তার কাছে ধৈর্য মানে সময় নষ্ট। এক সর্বগ্রাসী লোভয়ের শিকার হয় সে—যা তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক টাকার মালিক হতে চায়। তার যা চেহারা, তার যা ব্যক্তিত্ব আর তার কর্মকুশলতা সহজেই মেয়েদের আকৃষ্ট করে। সুকৌশল তাদের প্রণয়জালে আটকায় তাদের তারপর বিবাহ। তারপর সুযোগ বুঝে স্ত্রীকে সরিয়ে ফেলে চিরদিনের জন্য এবং ঘটনার পরম্পরায় এমন ভাবে পরিস্থিতিকে সাজিয়ে ফেলে যে মনে হবে একটা ইনোসেন্ট্ এ্যাকসিডেন্টের মধ্য দিয়ে মৃত্যুটা ঘটেছে। আগেই একটা মোটা টাকার ইন্‌সিওরেন্স করা থাকতো। মৃত্যুর পর ঐ মোটা টাকা বীমা কোম্পানির কাছে ক্লেম করে টাকা পাওয়ার একটা সহজ উপায় বের করে নেয় রজত চৌধুরী। সব জায়গাতে ঐ একই ষ্ট্র্যাটেজী খাটিয়েছে সে। মণিকাকেও ঐ একই ভাবে সরিয়ে একলাফে কুড়ি লাখ টাকার পাওয়ার মতলব করেছিল। কিন্তু এবার তা করে উঠতে পারেনি। এখানে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এর আগেও রজত চৌধুরী একে একে দুই স্ত্রীকে হত্যা করে এবং বীমা কোম্পানি থেকে মোটারকম টাকা ক্লেম করে আত্মসাৎ করেছে···

—অবজেকশন ইউর অনার, প্রতিবাদ করেন ডিফেন্স কাউন্সেল মিঃ অমল সামন্ত।—এই মামলা মণিকা মিত্রকে কেন্দ্র করে। রজত চৌধুরীর আগের দুই স্ত্রীর মৃত্যু-সম্পর্কিত ক্লেম বীমা কোম্পানি আগেই সেট্‌ল্ করেছে, কাজেই আমার বিনীত আবেদন, লার্নেড প্রসিকিউটার যেন তাঁর বক্তব্য মণিকা মিত্রের এ্যফেয়ার্স-এর মধ্যে সীমিত রাখেন।

পাল্টা আবেদন করেন মিঃ ভাদুড়ি।—ইওর অনার, আমার লার্নেড ফ্রেণ্ড ভুলে গেছেন, বীমা কোম্পানি আগে যে দুটো ক্লেম সেট্‌ল্ করেছে তা ক্লেমেন্ট-এর উপর সরল বিশ্বাসে এবং সেই সেট্‌ল্‌মেণ্ট্ কোন আদালতে এখনও বিচারসিদ্ধ হয়নি। কাজেই প্রসঙ্গত তার সম্বন্ধে যদি কোন প্রশ্ন ওঠে এবং তা যদি উল্লেখ করতে না দেওয়া হয়, তাহলে সুবিচারের পথে বাধা আসতে পারে।

—অবজেকশন পার্টলি সাসটেইন্‌ড্। বিচারকের রুলিং। রুলিংয়ে আরো বলা হয়, প্রসিকিউশন যেন শুধু মণিকা মিত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর বক্তব্য রাখেন। পরে অবশ্য শুনানী চলাকালীন অবস্থায় যদি একটা ডেভলেপ্‌মেণ্ট্ আসে যাতে আসামীর আগের দুই স্ত্রীর উল্লেখ অপরিহার্য, সে ক্ষেত্রে প্রসিকিউশনকে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

—ধন্যবাদ ইওর অনার। এখন আমি আসামীকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

বিচারপতির অনুমতির সঙ্কেত পেয়ে মিঃ ভাদুড়ি আসামীর কাঠগড়ার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন। মিঃ চৌধুরী, আপনি কি মণিকা মিত্রকে হত্যা করার অপরাধ স্বীকার করেন?

—না, আমি মণিকার মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুই জানিনা। আমি নিরাপরাধ। আর মৃত্যুবাদে বীমা কোম্পানি থেকে যে টাকা প্রাপ্য হয় তার প্রতি আমার কোন লোভ ছিল না এবং ঐ টাকা আমি নিতেও চাইনি।

—আচ্ছা ঐ টাকা নেবার ইচ্ছে যদি না-ই ছিল তাহলে আপনি ক্লেম ফর্ম সই করলেন কেন? আর বীমা কোম্পানির অফিস থেকে আপনি চেকটা আনতেই বা গেলেন কেন?

—বীমা কোম্পানির এজেণ্ট প্রভাত সাহা যখন আমার কাছে আসে তখন ক্লেম ফর্ম সই করতে চাইনি। কিন্তু প্রভাত আমাকে পরামর্শ দেয়, ঐ টাকা তুলে আমি নিজের ভোগে না লাগিয়ে কোন সৎকাজে টাকাটা দান করে দিতে পারি। এবং ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই আমি বীমা অফিসে যাই কিন্তু আমার কিছু করার আগে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে।

—আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, মণিকা দেবীর সঙ্গে আপনার বিয়েটা কি আপনার প্রথম বিবাহ?

—না, এর আগে আমি আরো দুবার বিয়ে করি।

—প্রথমবার বিয়ে আপনি কবে করেন—না একজ্যাক্‌ট্ তারিখ বলার দরকার নেই—মোটামুটি ক'বছর আগে বললেই চলবে।

—তা আজ থেকে প্রায় ছ-সাত বছর আগে।

—তখন আপনি কোথায় ছিলেন? আর কাকে বিয়ে করেছিলেন?

—তখন আমি ছিলাম ব্যাঙ্গালোরে। বিয়ে করি আমারই একজন সহকর্মী কাবেরী চ্যাটার্জিকে।

—আচ্ছা কাবেরীদেবী এখন কোথায় আছেন?

—তিনি আর বেঁচে নেই।

—আপনাদের বিয়ের কতদিন পর তিনি মারা যান?

—বিয়ের এক বছরের কিছু পরে।

—কি ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল একটু সংক্ষেপে বলবেন?

—বিয়ের পর এক বছর পার হয়ে যাওয়ার পর আমি কাবেরীকে নিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে যাই। ফেরার পথে শ্রীনগর থেকে দিল্লি প্লেনে আসি। দিল্লি থেকে সাদার্ন মেলে ফিরছিলাম, আমরা একটা কুপে পেয়েছিলাম। হঠাৎ গভীর

রাতে সাড়ে বারোটা-একটার সময় আমার শরীর খুব খারাপ লাগে। আমি কাবেরীকে না বলে কামরা থেকে বেরিয়ে দরজার দিকে যাই। দরজাটা একটু খুলে গায়ে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে থাকি। বেশ ভাল লাগছিল, আর বেশ একটু সুস্থ বোধ করছিলাম। এদিকে কাবেরীর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, আমাকে না দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। আমাকে দেখে বলে, ও তুমি এখানে? এখানে কি করছো? আমি বললাম, আমার শরীরটা ভাল লাগছিল না, তাই এখানে এসেছি। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় এখন বেশ ভাল লাগছে। কাবেরী খোলা দরজার আরো কাছে এসে বলে, বাঃ হাওয়াটা তো খুব ভাল। তুমি সরে এসো, আমিও দেখি হাওয়াটা কেমন লাগে! আমি বারণ করলাম। কিন্তু ও শুনলো না। আমি ভেতরে আসতেই ও বাইরে এসে দাঁড়ায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে বলি, কিন্তু ও জেদ করে বাইরে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগলো··· এমন সময় একটা দমকা হাওয়ায় দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় আর কাবেরী চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে চেন টানলাম, কিন্তু ট্রেন খুব জোরে চলছিল বলে থামলো প্রায় এক-দেড় মাইল দূরে। রেলের সব লোক কাবেরীর বডি ট্রেনে তুললো, আর পরের ষ্টেশনে 'বডি' আর আমাকে নামিয়ে দিল। ষ্টেশনের রেল পুলিশ গার্ডের 'ষ্টেট্‌মেণ্ট' নিল আর আমারও। রেল পুলিশ বডি আর আমাকে নিয়ে রেল হাসপাতালে এলো। রেলের ডাক্তার দেখে বললেন সব শেষ হয়ে গেছে। বডি হাসপাতালের মর্গে থাকে। রেল এবং পুলিশ তাদের ফর্মালিটি শেষ করে কাবেরীর মৃতদেহ দাহ করার ব্যবস্থা করে।'—একটানা কথাগুলো বলে রজত থামল।

—ভেরী স্যাড্। আচ্ছা, কাবেরী দেবীর জন্য কি কিছু বীমা করা ছিল?

—হ্যাঁ।

—কত টাকা পেয়েছিলেন বীমা কোম্পানি থেকে?

—পাঁচ লাখ টাকা।

সেদিনকার মত শুনানী স্থগিত হয়ে যায়। পরের দিন আবার শুরু—

—আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, দ্বিতীয়বার বিয়ে আপনার কবে এবং কোথায় হয়?

—কাবেরীকে হারাবার পর আমি ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে কানপুর চলে আসি। আর দুবছর পর উজ্জলা ভৌমিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। উজ্জলা ছিল কানপুর টেক্স্ লিঃ-এর চীফ্ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার সুধীর ভৌমিকের মেয়ে। উজ্জলার সঙ্গে কিছুকাল মেলামেশা করার পর বিয়ের প্রস্তাবটা ওর বাবা মার কাছ থেকেই আসে। তারপরই বিয়েটা হয়ে যায়।

—উজ্জলা দেবী এখন কোথায়?

—ও আর বেঁচে নেই! আমাদের বিয়ের বছর দেড়েক পর এক নৌকো-

দুর্ঘটনায় ওর মৃত্যু হয়।

—কোথায় কিভাবে এই এ্যাকসিডেণ্টটা হয় একটু সংক্ষেপে আদালতকে বলবেন?

—বিয়ের বছর দেড়েক পর আমরা হলিডে করতে যাই নৈনিতালে। সন্ধে-বেলার দিকে নৈনিতাল লেকে বেড়াতে যাই। কয়েকবার লেকটা ঘোরার পর দেখি ততক্ষণে বেশ চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমা ছিল না তবে আকাশ পরিষ্কার ছিল বলে অর্ধেক চাঁদের আলো লেকটার ওপর ছড়িয়ে পড়ে, সব মিলিয়ে বেশ রোমান্টিক পরিবেশ। উজ্জলা বায়না ধরলো নৌকো করে লেকে মুন লাইট বোটিং করবে। আমি আপত্তি করেছিলাম কিন্তু ও একেবারে নাছোড়বান্দা—নৌকো করে যাবেই। অগত্যা আমি রাজী হলাম। একটা মোটর বোট নিলাম। ষ্টায়ারিং আমার হাতে। তারপর লেকের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বোটের ইঞ্জিনটা কেন জানি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। আমি ইঞ্জিনটার কাছে একটু খুটখাট করছি যাতে মোটরটা আবার ষ্টার্ট করা যায়। আমি কি করছি দেখার জন্য ধারে বসে উজ্জলা দেখতে থাকে এমন সময় মোটরটা একটা ঝটকা দিয়ে ষ্টার্ট হয়ে যায় আর উজ্জলা ছিটকে জলে পড়ে যায়। ইঞ্জিনটা অফ করে আমি সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দি, ততক্ষণে চাঁদের আলোটা কিছু কমে আসে, তাই ভাল করে দেখতে পেলাম না। আমি তাড়াতাড়ি নৌকোতে উঠে এলার্ম সাইরেন বাজালাম। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে অনেকগুলো নৌকো কাছে এসে গেল। রেসকিউ বোটও এলো খোঁজাখুঁজি অনেক হলো কিন্তু রাত্তিরে কিছু পাওয়া গেল না। তবু সন্ধান চালিয়ে গেল রেসকিউ পার্টি আর পুলিশ। শেষে ভোরের দিকে পাওয়া গেল উজ্জলার ভাসমান দেহ। পুলিশ ডেড্‌বডি নিয়ে যায় পোষ্টমর্টেমের জন্য, আর আমার আর কয়েকজনের ষ্টেট্‌মেণ্ট নিল। পোষ্টমর্টেমে রিপোর্টে লেখা হলো 'ডেথ্ ডিউ টু এ্যাকসিডেণ্টাল ড্রাউনিং। শরীরে কোথাও কোন অস্বাভাবিক চিহ্ন দেখেনি।'

—ভেরী স্যাড্ ভেরী স্যাড্। আচ্ছা উজ্জলা দেবীর কি কোন ইন্‌সিওরেন্স কভার ছিল।

—হ্যাঁ ছিল। বিয়ের আগে ওর বাবা ওর নামে পলিসি নিয়ে রেখেছিলেন। উনিই প্রিমিয়াম দিতেন, তাতে ইন্‌কাম ট্যাক্সের কিছু ছাড় পেতেন। বিয়ের পর আমাকে 'নমিনী' করেন। কথা ছিল আমাদের সন্তানাদি হলে তাদের 'নমিনী' করে দেওয়া হবে আমার জায়গায়। আর আমিও একটা জয়েণ্ট পলিসি করাই।

—আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আপনি কি বীমা কোম্পানির কাছে ক্লেম করেছিলেন?

—হ্যাঁ করেছিলাম এবং সব মিলিয়ে আমি বারো লাখ টাকা পেয়েছিলাম।

এবার মিঃ ভাদুড়ি জজসাহেবের দিকে ফিরে বলেন—মহামান্য আদালতের দৃষ্টি একটা বিষয়ের দিকে আমি আকর্ষণ করতে চাই। দুর্ঘটনা যে সব ঘটেছে তা সব স্বাভাবিক বাসস্থানের বাইরে একটা ছুটি কাটাবার সময়, এমন সময় এমন জায়গায় যে কাছে কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই। মণিকা মিত্রের এ্যাকসিডেন্টও যে ঘটেছে তা 'নর্মাল প্লেস অফ রেসিডেন্স' কলকাতার বাইরে, হনিমুন করার ছুটির সময়, এমন একটা রাস্তা থেকে গাড়িটা খাদে পড়ে যায় যেখানে সাধারণত লোকজন বেশি যাতায়াত করে না এবং একেবারে ডাইরেক্ট উইটনেস্ কেউ নেই। সব মিলিয়ে বেশ একটা প্যাটার্ন ফুটে বেরোচ্ছে।

—একস্‌কিউজ মি ইওর অনার, এসবই অনেকটা আমার লার্নেড ফ্রেণ্ড-এর কল্পনাপ্রসূত। এটা নিছক কো-ইনসিডেন্স বই নয়। বলেন বিবাদী কৌঁসুলী মিঃ সামন্ত।

—ইওর অনার, এতে আমার লার্নেড ফ্রেণ্ড-এর উত্তেজিত হবার কিছু নেই। আমিও স্বীকার করছি এটা একটা কো-ইনসিডেন্স হতে পারে—কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই কো-ইনসিডেন্সটা ন্যাচারাল না আর্টিফিশিয়াল। সেটা বেরিয়ে আসবে বিচারকালীন সওয়াল জবাবে। আর এটাই আমি মহামান্য আদালত আর আমার লার্নেড ফ্রেণ্ডকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করছি। বলেন মিঃ ভাদুড়ি।

—ইওর পয়েন্ট ইজ্ ওয়েল টেকেন। বিচারের রুলিং। আপনি যদি আসামীকে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, তাহলে করতে পারেন।

—না, আমার এখন আসামীকে আর জিজ্ঞেস করার কিছুই নেই। আমি এখন ড্রাইভার বাহাদুরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই...

—বেশ করুন।

বাহাদুর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালো। তাকে শপথবাক্য পাঠ করানো হলো। মিঃ ভাদুড়ি আরম্ভ করলেন।

—আচ্ছা বাহাদুর, তোমার কাছে ঘটনার দিন যখন মেমসাহেব এসেছিলেন তখন কটা বেজেছিল।

—প্রায় সকাল সাড়ে ছটা।

—তুমি কি রাত্রিবেলা হোটেলেই ছিলে ?

—না, রাত্তিরে আমি কাছে বস্তিতেই থাকি, গাড়ি রাত্রিবেলা হোটেলে পার্ক করা থাকে। আমি ছ'টার আগেই হোটেলে এসে যাই।

—ছটায় এসে কি কর ?

—গাড়ি প্রথমে ধুয়ে পরিষ্কার করি। তারপর তেল, জল, হাওয়া চেক করি।

—শুধু তেল, জল হাওয়া চেক কর না আরো কিছু চেক কর ?

—পাহাড়ি এলাকায় চলে বলে সব কিছু ভাল করে চেক করতে হয়।

ব্রেক, স্টীয়ারিং, চাকা, হর্ন সব ভাল করে দেখে নিতে হয় কেননা একটু এদিক-ওদিক হলে একেবারে নিচে খাদে পড়ে যাওয়ার ভয়।

—তা ঘটনার দিন তুমি সব চেক করেছিলে ?

—হ্যাঁ, বাবা কেদারনাথের দিব্বি করে বলছি স্যর—আমি সব ঠিকমত চেক করেছি।

—আচ্ছা, মেমসাহেব যখন নিজে একা গাড়ি নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন তুমি আপত্তি করনি ?

—করেছিলাম স্যর, উনি কিছুতেই শুনলেন না। গাড়ি ষ্টার্ট করে বেরিয়ে গেলেন।

—তোমার একটুও ভয় করলো না ?

—না স্যর, উনি তো খুব ভাল গাড়ি চালান। আমার সামনে গাড়ি চালিয়েছেন, সাহেবও সঙ্গে ছিলেন। খুব ভাল কন্‌ট্রোল। আমাদের কারুর চেয়ে খারাপ চালান না, খুব সাবধানী। কোনদিন কোন ভুল করতে দেখিনি।

—ইওর অনার, বাহাদুরকে আমার আর জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। ডিফেন্স ওকে যদি কিছু জিজ্ঞেস না করতে চায় তাহলে আমি পরের সাক্ষী পুলিশ অফিসার মিঃ নন্দীকে জিজ্ঞাসবাদ করতে চাই।

এবার পুলিশ ইনভেষ্টিগেটিং অফিসার মিঃ নন্দী সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। শপথবাক্য পাঠ করানোর পর জেরা সুরু করলেন মিঃ ভাদুড়ি।

—মিঃ নন্দী, ঘটনার দিন ক'টার সময় প্রথম খবর পান এবং কার কাছ থেকে ?

—খবরটা পাই সকাল নটার পরই। থানায় মিঃ চৌধুরী আসেন। বলেন, তাঁর স্ত্রী মণিকা দেবী একা গাড়ি নিয়ে সকালে বেরিয়ে গেছেন, বলে গেছেন কাছেই অল্প সময়ের জন্য যাচ্ছেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবেন। দেখতে দেখতে দুঘণ্টা পার হয়ে গেছে, তবু ফেরেননি বলে মিঃ চৌধুরী উদ্বিগ্ন হয়ে থানায় আসেন। আমি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর কাছ থেকে গাড়ির -বিবরণ নিয়ে ওয়েরলেস্‌এ খবরটা চারদিকে দিয়ে দিলাম। শাদা রঙের এ্যাম্বাসাডার গাড়ি, নম্বর ডি এইচ ওয়াই ৩৭৬৯, একা ভদ্রমহিলা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। চারদিক থেকে রেসকিউ স্কোয়াড বেরিয়ে যায়। এরপর মিঃ চৌধুরীর কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে ডায়েরি করি আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের জীপে মিঃ চৌধুরীকে নিয়ে নিই আর বাহাদুর আরেকটা গাড়িতে আমাদের 'ফলো' করতে থাকে। চলতে চলতে রেডিও ফোনে ঘন ঘন যোগাযোগ করতে থাকি। কিন্তু কোথা থেকেও কোন পজিটিভ ফীড্‌ব্যাক পাচ্ছিলাম না। শেষে প্রায় সাড়ে বারোটার সময় একটা দলের কাছ থেকে খবর পেলাম। মানকুণ্ডি গ্রাম বস্তির উপর থেকে কয়েকজন লোক দেখেছে একটা শাদা গাড়ি বেসামাল হয়ে চলতে চলতে

একেবারে নিচে পড়ে যায় আর গাড়িটা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে আগুন ধরে যায়। অনেক উঁচু থেকে দেখে বলে কেউ গাড়ির নম্বরটা বুঝতে পারেনি আর গাড়িতে কে ছিল তাও দেখতে পায়নি। কথাটা শুনে মিঃ চৌধুরী কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন। অনেক কষ্টে আমরা শান্ত করি। আর বাকি সব টীমকে বেতার যোগে বলে দি সবাই যেন একটা পয়েন্টে মিলিত হয় মানকুণ্ডি গ্রামের কাছে। আর আমরাও সেদিকে যাই। সবাই যখন পৌঁছলাম তখন দেড়টা দুটো বেজে গেছে। আমরা দূর থেকে বাইনোকুলার দিয়ে গাড়ির নম্বরটা পড়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখলাম, কিন্তু পারলাম না। তারপর সবাই মিলে রেসকিউর রুটটা ঠিক করে ফেললাম। আর যা যা দরকার আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলাম। সারারাত ধরে উদ্ধার কাজ চলবে, তাই আমরা একরকম জোর করে বাহাদুরের সঙ্গে মিঃ চৌধুরীকে হোটেলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম। ওঁকে আমরা কথা দিলাম আমরা থানার মারফৎ হোটেলে থেকে থেকে খবর দেব।

—আপনাদের উদ্ধার কাজ কখন শেষ হলো?

—প্রায় সকাল সাতটা নাগাদ।

—আচ্ছা, গাড়িটা তো পড়ে গিয়ে আগুন ধরে যায়, তা আগুনটা কতক্ষণ জলেছিল।

—কেউ সঠিক বলতে পারলো না। কেউ বলে তিন ঘণ্টা আর কেউ চলে চার ঘণ্টা।

—আচ্ছা ঐ আগুন কেউ কি গিয়ে নেভায়? না নিজে নিজেই নিভে যায়?

—ওখানে কে আর নেভাতে যাবে? যখন জলবার মত জিনিস আর কিছু ছিল না তখন নিজে নিজেই নিভে গেছে।

—আচ্ছা, ঐ অবস্থায় তো হিউম্যান বডিও তো শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, তাহলে আপনারা গাড়ির প্যাসেঞ্জার বা প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কি পেলেন?

—বলতে গেলে কিছুই পাইনি। কেবল একজনের স্কেলিটনের কিছু অংশ—এই দুটো হাতের কিছু অংশ মাথার একটু আর মেরুদণ্ডের কিছুটা। বাকী সব পুড়ে শেষ হয়ে যায়।

—আপনারা স্কেলিটনের যে অংশ পেয়েছেন তাতে কি একটা পুরো মানুষকে সঠিকভাবে সনাক্ত করা যায়?

—না, তা করা যায় না।

—তাহলে আপনারা এ্যাকসিডেন্ট্-এর ভিকটিমকে সনাক্ত করলেন কি করে?

—আগেই বলেছি, স্কেলিটনের হাতের কিছু অংশ ছিল। হাত দুটোতে বালা ছিল। ঐ বালাদুটো মিঃ চৌধুরী সনাক্ত করেন। ঐ বালা দুটি উনি বিয়ের রাতে মণিকা দেবীকে পরিয়ে দেন।

—ঐ বালা দুটোর সত্যতা সম্বন্ধে আর কিছু আপনারা অনুসন্ধান করেছেন?

—হ্যাঁ, বালা দুটি মিঃ চৌধুরী যখন কেনেন তার রসিদের জেরক্স কপি ওঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়। ঐ রসিদ দেখে আমরা জুয়েলারকে ডাকাই। জুয়েলার ডিজাইন দেখে মিলিয়ে কনফার্ম করেছেন ঐ বালাজোড়া ওঁর কাছ থেকেই মিঃ চৌধুরী কিনেছেন।

—আচ্ছা ঐ বালাজোড়া কি মেটালের ছিল?

—কেন?—সোনার।

—সেটা কি কোন পরীক্ষা করা হয়েছে?

—আপনি কি রকম পরীক্ষার কথা বলছেন স্যর?

—এই ধরুন, যে জুয়েলার কলকাতা থেকে এসেছিলেন তিনি কি কষ্টিপাথরে ঘসে বালাদুটোকে সোনা বলেছেন?

—না, উনি ও সব যাচাই করেননি।

এবার বিচারকের দিকে ফিরে মিঃ ভাদুড়ি বলেন,

—ইওর অনার, এক্ষেত্রে এ্যাকসিডেন্ট-এর ভিকটিমকে সনাক্ত করার একমাত্র এভিডেন্স হলো বালা। এই এভিডেন্সটা একেবারেই সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত হওয়া দরকার। আমরা যদি কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে বালাজোড়াকে সোনা বলে ধরে নিই তাহলে ইনভেস্টিং প্রসেসে একটু গ্যাপ থেকে যাবে। মহামান্য আদালতের কাছে তাই আমার নিবেদন বালাজোড়াকে কেমিক্যাল টেষ্টের জন্য পাঠানো হোক!

—আই এগ্রি উইথ্ ইউ। বালাজোড়া কেমিক্যাল টেষ্টের জন্য পাঠানো হোক। জজ সাহেব আদেশ দিলেন।

এখন মিঃ ভাদুড়ি বলেন পুলিশকে তাঁর আর জিজ্ঞেস করার কিছুই নেই। মিঃ সামন্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইওর উইটনেশ।' মিঃ সামন্ত উত্তর দেন, নো কোশ্চেন!'

মিঃ ভাদুড়ি বলেন, 'তাহলে এখন আমি ডাঃ বিমল রায় চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা-বাদ করতে চাই।' ডাক্তার রায় চৌধুরী সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করানো হলো। মিঃ ভাদুড়ি জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন।

—আচ্ছা ডাঃ রায় চৌধুরী, আপনি তো এ্যাকসিডেন্ট ভিকটিম-এর বডির অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা করেছেন?

—হ্যাঁ।

—যে ধরনের আগুন ধরেছিল এবং যতক্ষণ ঐ আগুন ছিল তাতে হিউম্যান বডির কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকা সম্ভব?

—আগুনটা আমি নিজের চোখে দেখিনি, যা শুনেছি তাতে বডির কিছুই

অবশিষ্ট থাকবার কথা নয়। তবে বডির কিছু অবশিষ্ট অংশ যখন পাওয়া গেছে, তখন মনে হয় শরীরের কিছু কিছু অংশে হয়তো আগুনের তাপটা পুরোপুরি পৌঁছয়নি।

—এটা কি আপনার অনুমান ?

—বলতে পারেন অনুমান অথবা প্রোবাবেল্ এক্সপ্ল্যানেশন ফর দ্য আনবার্ন্ট রেসিডিউ।

—আচ্ছা হিউম্যান বোনের জেনারেল কম্পোজিশন কি ?

—মোষ্টলি ক্যালসিয়াম ফস্ফেট, কার্বন, হাইড্রোজেন, আর অন্যান্য কিছু মিনারেলস্।

—স্কেলেটাল রেসিডিউ যা পেয়েছেন তা কি কেমিক্যাল এ্যানালিসিস্ করে দেখেছেন তা হিউম্যান বোনের কম্পোজিশন্-এর সঙ্গে ম্যাচ করে কিনা।

—না, সে এ্যানালিসিস্ করা হয়নি। শুধু ফিজিক্যাল এ্যাপিয়ারেন্স্ দেখা হয়েছে।

আবার জজ সাহেবের দিকে ফিরে মিঃ ভাদুড়ি বলেন—ইওর অনার, এখানেও ইন্‌ভেষ্টিগেশনে একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। আমার বিনীত আবেদন, মাননীয় আদালত এক্ষেত্রেও কেমিক্যাল এ্যানালিসিসের আদেশ দিন।

কিন্তু আপত্তি তুললেন মিঃ সামন্ত। বললেন, ইওর অনার, এতে অনর্থক সময় অনেক নষ্ট হবে। কাজেই যা তথ্য হাতে আছে তার ভিত্তিতে বিচারের কাজ চলুক।

পাল্টা আপত্তি তুললেন মিঃ ভাদুড়ি—না ইওর অনার, ত্রুটিপূর্ব তথ্যের ভিত্তিতে আদালতের কাজ এগুলে সুবিচার হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া, এগুলো খুবই সাধারণ এ্যানালিসিস—এগুলো দু-তিন দিনের বেশি লাগার কথা নয়। তাই আমার আবেদন, আদালত এ্যানালিসিস-এর জন্য আদেশ দিন এবং রেজাল্ট না আসা পর্যন্ত এক সপ্তাহের জন্য শুনানী মূলতুবী করা হোক।

জজ সাহেবের আদেশ শোনা গেল। 'স্কেলেটাল রেসিডিউ বলে যা পাওয়া গেছে তা এ্যানালিসিস করে দেখা হোক তা মানুষের হাড়ের সঙ্গে মেলে কিনা। আর এক সপ্তাহের জন্য শুনানী মূলতুবী থাকবে।

এক সপ্তাহ পর আদালত আবার বসলো। আজ আদালত কক্ষ লোকে ঠাসা, কোর্টের সমস্ত উকিল-ব্যারিষ্টার, প্রেসের লোক, জনসাধারণ, নারী-পুরুষ সকলে উপস্থিত। তিল ধারণের জায়গা নেই। জজসাহেব আদালতে ঢুকে আসন গ্রহণ করেই আদেশ দিলেন আদালতের কাজ সুরু করতে।

মিঃ ভাদুড়ি জজসাহেবকে অভিবাদন করে বললেন—ইওর অনার, পুলিশের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় এ্যানালিসিস রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। এই সেই

রিপোর্ট,' বলে কাগজ দুটি পেশকারের হাতে দিলেন। জজ সাহেবের হাতে পৌঁছবার পর, রিপোর্ট দুটি পড়লেন এবং রেজাল্ট ঘোষণা করলেন।—

—বালা দুটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ওগুলো সোনার নয়, ব্রোঞ্জের আর স্কেলেটাল রিমেন্স্ বলে' যা মনে করা হয়েছে তা মানুষের হাড় নয়। ওটা তৈরি হাই মেল্টিং পয়েন্ট্ সেরামিক সিলিকা-এ্যালুমিনা সেরামিক মেটিরিয়াল দিয়ে।

ঘোষণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালত কক্ষে বেশ একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। জজ সাহেব বলে উঠলেন—

—অর্ডার, অর্ডার, আদালতের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে দিন।

সবাই চুপ করলে মিঃ ভাদুড়ি তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন—

—ইওর অনার, বালা দুটি যখন সোনার নয়, তখন বোঝাই যাচ্ছে বালার ভিত্তিতে তথাকথিত অ্যাকসিডেন্ট ভিকটিমকে যে মণিকা দেবী বলে সনাক্ত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল। তাছাড়া স্কেলেটাল রিমেইন্স্ যখন মানুষের হাড় নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে তখন তো এই সিদ্ধ হয়, গাড়িটা যখন নিচে পড়ে যায় তখন তার মধ্যে কোন মানুষই ছিল না। অতএব ঐ সময় গাড়ির মধ্যে মণিকা দেবীর থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে এখন প্রশ্ন জাগে মণিকা দেবী তবে গেলেন কোথায় ? এমনকি তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকেও একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না।

ঠিক ঐ মুহূর্তে মিঃ সামন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—

—ওর অনার, তাহলে তো আসামীর বিরুদ্ধে মণিকা দেবীকে হত্যা করার অভিযোগ খারিজ হয়ে যায়। তাহলে বর্তমান মামলা এখানেই শেষ করে দেওয়া উচিৎ।

মিঃ ভাদুড়ি উত্তরে বলেন,

—ইওর অনার, আমার লার্নেড্ ফ্রেণ্ড ভুলে যাচ্ছেন যে এই আদালতের একমাত্র উদ্দেশ্য রজত চৌধুরীকে তার স্ত্রী মণিকাকে হত্যা করার দায়ে অভিযুক্ত করা নয়। আদালতের উদ্দেশ্য প্রকৃত সত্যকে নিরূপণ করা। অতএব আদালতের কাজ চলতে দেওয়া হোক।

জজ সাহেব বললেন, 'ইউ মে প্রসিড।'

এবার মিঃ সামন্ত প্রশ্ন তোলেন, 'আমার লার্নেড্ ফ্রেণ্ড্ যখন বলছেন মণিকা দেবি বেঁচেও থাকতে পারেন তাহলে তিনি মণিকাকে আদালতে উপস্থিত করার ব্যবস্থা করুন।'

—ইওর অনার, মণিকার প্রশ্নে আমি একটু পরে আসতে চাই। আমি বলতে চাই, এই মামলায় বীমা কোম্পানি হলেন প্রধান কন্‌প্লেইন্যান্ট। তার বক্তব্য শোনার জন্য আমি আদালতের কাছে প্রার্থনা করছি। মাননীয় আদালতের

অনুমতি পেলে আমি বীমা কোম্পানির ল অফিসার বিক্রম সান্যালকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি। বলেন মিঃ ভাদুড়ি।

বিক্রম সান্যাল সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালে, তাকে শপথ বাক্য পড়ানো হয়। মিঃ ভাদুড়ি সওয়াল আরম্ভ করলেন—

—মিঃ সান্যাল, রজত চৌধুরী যখন আপনাদের অফিসে কুড়ি লাখ টাকার চেক নিতে আসে, ঠিক সেই সময় পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশকে কে খবর দিয়েছিল ?

—আমরাই বীমা কোম্পানীর পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম।

—এর পেছনে আপনাদের কোন পরিকল্পনা ছিল ?

—হ্যাঁ ছিল। প্রথম যখন কাবেরী চ্যাটার্জির মৃত্যু হয়, তখন আমরা ওটাকে নিছক দুর্ঘটনা বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আবার উজ্জ্বলার মৃত্যু হলো তখন আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। একই লোকের স্ত্রী পরপর দুজন প্রায় একরকম সারকাম্‌স্টান্‌সেসের মধ্যে এ্যাকসিডেন্ট-এ মারা গেল তখন ব্যাপারটাকে একেবারে কো-ইনসিডেন্স্ বলে মেনে নিতে পারলাম না।

—তা আপনারা কি করলেন ?

—আমাদের হাতে কোন প্রমাণ না থাকায় আমরা রজত চৌধুরীর ক্লেম কোন প্রশ্ন না করে সেট্‌ল করে পেমেণ্ট করে দিই। আর গোপনে একটা প্রাইভেট্ ডিটেকটিভ্ এজেন্সীকে কমিশন করি রজত চৌধুরী সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতে।

—খোঁজ খবরে জানতে পারলাম, ওর ছোটবেলাটা খুব কষ্টে কেটেছে। ওর বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার। স্কুলের মাইনে আর টিউশনির টাকায় সংসার চালানো বেশ কষ্টকর ছিল। তবে রজত খুব বুদ্ধিমান আর মেধাবী ছিল। তবে আর্থিক সাচ্ছন্দ্য ছিল না বলে তাকে বহু জায়গায় অবহেলা আর তাচ্ছিল্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই তার মনে একটা চাপা অভিমান ছিল। কিন্তু তার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। মেধাবী বলে বৃত্তি পেয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করে। তারপর সে কলকাতায় আসে। দিনে চাকরি করে আর রাত্তিরে কমার্স পড়ে। এইভাবে সঙ্গে এম. কম পাশ করে কৃতিত্বের সঙ্গে। তারপর দিনে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট্‌স্ ফার্মে-আর্টিকিল শিপ করে আর রাত্তিরে কলেজে পড়ায়। এভাবে সে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট্ হয়। প্রথম থেকেই সে একটা ভাল চাকরি করতে থাকে। কর্মদক্ষতার জন্য আস্তে আস্তে উন্নতিও করতে থাকে। কিন্তু সে ভাবলো চাকরি করে কত টাকা আর রোজগার করতে পারবে। তাকে যেন একটা নেশায় পেয়ে বসলো। তাড়াতাড়ি অনেক টাকার মালিক হওয়ার জন্য সে ক্রাইমের রাস্তা নিল। আর এক এক করে দুটি স্ত্রীকে সে খুন করে। আমরা জানি, লোভের হাত ক্রমেই লম্বা হয়। সে দুটো খুন করেই থামবে না। তাই প্ল্যান করে থার্ড মার্ডারের

জন্য আমরাই একটা টোপ ফেললাম ওর সামনে।

মিঃ ভাদুড়ি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই টোপটা কি ?'

—এই টোপ হলো মণিকা মিত্র।

এখন আবার জজসাহেবের দিকে মুখ করে বললেন—

—ইওর অনার, আমার শেষ সাক্ষী মণিকা দেবী। বিয়ের আগে মণিকা মিত্র, বিয়ের পর মণিকা চৌধুরী।

জজসাহেব মণিকা দেবীকে আদালতে উপস্থিত করার অনুমতি দিলেন। মণিকা কোর্টে ঢুকতেই একটা গুঞ্জন শোনা গেল। জজ সাহেব বললেন, 'অর্ডার, অর্ডার।' মণিকা ততক্ষণে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। শপথবাক্য পাঠ করানো হলে মিঃ ভাদুড়ি জেরা আরম্ভ করলেন,

—আচ্ছা, আপনার নাম ?

—বিয়ের আগে মণিকা মিত্র এবং বিয়ের পর এখন মণিকা চৌধুরী।

—আচ্ছা, অনেক সময় একই চেহারার দুজনকে দেখানো হয়। আপনি যে সেরকম একজন নকল মণিকা দেবী হতে পারেন এমন প্রশ্নও তো অনেকের মনে উঠতে পারে। সে সম্বন্ধে আপনার কি বলার আছে ?

—বিয়ের সময় ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে আমার সই নেওয়া হয়, তাছাড়া ব্যাঙ্কে, অফিসে আমার অনেক সই আছে, সেগুলো মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। তারপর বিয়ের পর জয়েণ্ট ইন্‌সিওরেন্স করা হয়, সেই সময়ও আমার সই নেওয়া হয়। সেই সময় আমার ডিটেইল্‌ড্ মেডিক্যাল একজ্যাম করা হয়। তাতে আমার ব্লাড গ্রুপ, অন্যান্য ব্লাড টেষ্ট্ ও এক্স-রে প্লেট আছে। সে সব থেকেই মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

—আচ্ছা, এই আদালতে বলা হয়েছে আপনাদের বিয়ের রাতে রজত চৌধুরী আপনাকে একজোড়া বালা উপহার দেন। এটা কি সত্যি ?

—হ্যাঁ সত্যি।

—ঐ বালা জোড়া আপনি কোর্টে পেশ করতে পারবেন ?

—হ্যাঁ, ঐ বালা জোড়া বীমা কোম্পানির স্থানীয় জেনারেল ম্যানেজার চন্দন লাহিড়ীর কাছে রাখা আছে। আপনি ওঁর কাছ থেকে তা পেতে পারেন।

মিঃ ভাদুড়ি বীমা কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার চন্দন লাহিড়ীর হাত থেকে একটা বাক্স নিলেন। খুলে দেখলেন, তার মধ্যে আছে একজোড়া বালা আর জুয়েলারের রসিদ এবং সার্টিফিকেট। মিঃ ভাদুড়ি বললেন, 'এটা আমি কোর্টে এক্‌জিবিট্ হিসেবে পেশ করার আগে আসামীকে দেখিয়ে আইডেন্টিফাই করিয়ে নিতে চাই।' জজসাহেবের কাছে অনুমতি পেয়ে আসামীর কাঠগড়ার কাছে গিয়ে তিনি বললেন,

—দেখুন তো মিঃ চৌধুরী, এই বালা জোড়া চিনতে পারেন কিনা!

বালা জোড়া দেখেই রজত কান্নায় ভেঙে পড়ে, আর চিৎকার করে বলতে থাকে—

—হ্যাঁ এই সেই বালা জোড়া, এই বালা জোড়াই আমি বিয়ের রাতে মণিকাকে পরিয়ে দিয়েছিলাম। মণিকা, আমার মণি বেঁচে আছে—এই অনেক। আমি আর কিছু চাই না। ধর্মাবতার, বিশ্বাস করুন, আমি মণিকে খুন করতে চাইনি, ওকে খুন করার আমার কোন মতলব ছিল না। আমি স্বেচ্ছায় স্বীকার করছি, কাবেরী আর উজ্জলা আমার হাতেই খুন হয়েছে। আগের বয়ানে আমি সব মিথ্যে বলেছি, আবার আমি নতুন করে সব বলতে চাই, সব স্বীকার করবো···

যতক্ষণ রজত উত্তেজিত অবস্থায় সব বলতে থাকে, জজসাহেব বারংবার 'অর্ডার, অর্ডার, অর্ডার প্লীজ' বলতে থাকেন। সকলের চেষ্টায় রজত যখন একটু শান্ত হলো, তখন মিঃ ভাদুড়ি জজসাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

—ইওর অনার, আসামী খুব আপসেট হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আদালতের কাজ চালালে সুবিচারের পথে বাধা পড়তে পারে। তাই মহামান্য আদালতের কাছে আমার সবিনয় প্রার্থনা, শুনানী সাময়িকভাবে স্থগিত করা হোক।

বিচারপতি আদেশ করলেন, 'কোর্ট উইল নাউ রাইজ ফর লাঞ্চ রিসেস। দুটোর সময় আবার আদালত বসবে। এর মধ্যে দরকার হলে আসামীকে মেডিক্যাল এইড্‌ও দেওয়া চলবে।

ঠিক দুটোর সময় আবার আদালত বসলো। বিচারপতি মিঃ সামন্তকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আসামী স্বাভাবিক হয়েছে?'

—হ্যাঁ, ইওর অনার।

মিঃ ভাদুড়ি আবার সাক্ষীর কাঠগড়ার কাছে এসে বললেন,

—আগে আমি মণিকা দেবীর জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করতে চাই। আচ্ছা মণিকা দেবী, আপনি আসল বালা জোড়া আদালতে পেশ করেছেন। কিন্তু আরও কয়েকটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যার উত্তর আদালতের শোনা দরকার। প্রথমতঃ নকল বালা তথাকথিত স্কেলেটাল রিমেইনস্-এর হাতে গেল কি করে? গাড়িতে নকল হাড়ের হাত, মেরুদণ্ড আর মাথার কিছু অংশ এল কি করে আর বাকী অংশ গেল কোথায়? তারপর গাড়িটাই বা পড়ল কি করে এবং আপনিই বা বাঁচলেন কি করে? এই প্রশ্নগুলো মনে রেখে আপনি আমার কথার উত্তর দেবেন। আপনি তো একটি এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট কোম্পানির একজেকিউটিভ্ হিসেবে রজত চৌধুরীর সামনে আসেন। ওটাই কি আপনার আসল পরিচয়?

—না, আমি আসলে প্রিমিয়ার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির ইনভেষ্টিগেটার।

—তাহলে আপনি ঐ টেডিং কোম্পানিতে এলেন কি করে।

—আমাকে এখানে প্ল্যান্ট করা হয়। বীমা কোম্পানির বড় রকমের ইনভেষ্টমেন্ট আছে এই কোম্পানিতে, তাই কোন অসুবিধে হয়নি।

—এই কাজে যখন এলেন তখন আপনার ভয় করেনি?

—না, আমাদের প্রফেশ্যনে ভয়ের কোন স্থান নেই। আর সব কাজেই তো কিছু প্রফেশ্যনাল হ্যার্জার্ড থাকেই। খানিকটা ঝুঁকি তো নিতেই হয়, বলতে পারেন ক্যালকুলেটেড রিস্ক। তাছাড়া আত্মরক্ষার জন্য আমাদের সব রকম ট্রেনিং দেওয়া হয়—ফিজিক্যাল ফিটনেস, ক্যারাটে, শুটিং ইত্যাদি সব শিখতে হয়।

—এবার বলুন, সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় গেলেন, আর কি কি করলেন?

—আগেই তো বলেছি আমি একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ্ এজেন্সী থেকে এসেছি। আমাদের এজেন্সী একটা বড় রকমের প্ল্যান করেছিল। সেই অনুসারে বম্বে থেকে আসে চারজন খুব ভাল 'ষ্টান্টম্যান যারা ফিল্ম লাইনে দুঃসাহসিক কাজ করে। তারাও আসে দার্জিলিং-এ আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তাছাড়া নেপালী ড্রাইভার বাহাদুরও আমাদের লোক। আমি বেরিয়ে রাস্তার এক কোণে ষ্ট্যান্ট্‌ম্যানদের হাতে গাড়িটা তুলে দিয়ে অন্য একটা গাড়িতে উধাও হয়ে যাই। আর ঐ স্ট্যান্ট্‌ম্যানরাই নামার পথে উল্টোপাল্টা গাড়ি এমন ভাবে চালায় যে লোকে মনে করে গাড়ির কোন কন্ট্রোল নেই। তারপর একটা নির্জন রাস্তায় গাড়িটা থামিয়ে ড্রাইভারের সীটে একটা ডামী বসিয়ে দেয়—ডামীর সারা শরীর তৈরি ছিল প্লাষ্টিক দিয়ে, হাত আর কিছুটা অংশ ছিল সেরামিক মেটিরিয়াল দিয়ে। আর ডামীর হাতে পরিয়ে দেওয়া নকল বালা জোড়া যা তৈরি করা হয়, হুবহু আসল বালার ডিজাইনে। তারপর ষ্টান্ট্‌ম্যানরা গাড়িটা একটু ঠেলে নিচে ফেলে দিয়ে ওখান থেকে উধাও হয়ে যায়। যাতে কেউ দেখতে না পায় সময়টাও সেই ভাবে বেছে নেওয়া হয়।

এরপর মিঃ ভাদুড়ি মিঃ সামন্তর উদ্দেশ্যে বললেন,

—ইওর উইটনেস্।

মিঃ সামন্ত সাক্ষীর কাঠগড়ার কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

—আচ্ছা, মণিকা দেবী, আপনার সঙ্গে সবসময় কি রিভলভার বা ঐ জাতীয় কোন আগ্নেয়াস্ত্র থাকতো?

—হ্যাঁ থাকতো।

—আপনার কখনও কি ওটা ব্যবহার করার দরকার হয়?

—না, রজতের ক্ষেত্রে সে দরকার কখনও হয়নি।

—আচ্ছা বিয়ের আগে আপনাদের মধ্যে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয় যে

বিয়ের পর আপনারা আলাদা ভাবে থাকবেন এবং আপনাদের মধ্যে কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হবে না।

—হ্যাঁ।

—রজত কি কখনও সে চুক্তি ভঙ্গ করার চেষ্টা করেছে?

—নাঃ, একদম না।

—আপনি ক্যারাটে বা আত্মরক্ষার কৌশল জানেন, তা কি কখনও প্রয়োগ করার দরকার হয়েছিল?

—না, কখনও না। কেননা রজত কোনদিন আমার সঙ্গে কোনরকম অশোভন আচরণ করেনি।

—আমার শেষ প্রশ্ন, প্রভাত সাহাও কি আপনাদের প্ল্যান্টেড্ লোক?

—হ্যাঁ।

—থ্যাঙ্ক ইউ, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

এবার মিঃ ভাদুড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিচারকের উদ্দেশে বললেন,

—ইওর অনার, আমি এবার আসামী রজত চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।

—ইউ মে প্রসিড্। প্রসিকিউটার এখন আসামীর কাঠগড়ার কাছে এগিয়ে এসে বললেন।

—আপনার প্রথম স্ত্রী কাবেরী দেবী তো রেল গাড়ি থেকে পড়ে মারা যান।

—না, ট্রেন থেকে পড়ে যায়নি কাবেরী, আমিই ওকে ঠেলে ফেলেছি!

—ঘটনাটা একটু গুছিয়ে আদালতকে বলুন।

—আমরা কাশ্মীর বেরিয়ে ট্রেনে দিল্লি থেকে ব্যাঙ্গালোর ফিরছিলাম। রাত্রি সাড়ে বারোটা-একটার সময় উঠে আমি কাবেরীকে জাগাই। মিথ্যে মিথ্যে বলি, আমার শরীরটা অস্থির অস্থির লাগছে, আমাকে ধরে দরজার কাছে নিয়ে যেতে বলি। নিয়ে যাবার সময় দেখে নি যে সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে, এমনকি এ্যাটেন্-ডেন্টও এককোণে ঘুমোচ্ছে। কাবেরী ছিল আমার বাঁদিকে, ওর ডান হাতটা ছিল আমার কাঁধে আর আমার বাঁ-হাত দিয়ে ওর বাঁ-হাতটাও ঘিরে রেখেছিলাম যাতে ওর দুটো হাতই আটকা থাকে আর আমার ডান হাতটা থাকে ফ্রী। এভাবে চলতে চলতে দরজার কাছে যাই, আর দরজাটা খুলে দি আর গায়ে হাওয়া নেওয়ার ছলে ধারের দিকে এগিয়ে যাই, কাবেরী বারণ করছিল কিন্তু আমিই জোর করে এগিয়ে নিয়ে যাই এবং যখন সুবিধেমত জায়গায় এসে পড়ি, তখন এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাবেরীকে ঠেলে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দি, আর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দি। আর তার একটু পরে চেন টানি। গাড়ি থামে। তারপর তো সব জানা।

রজত চৌধুরীর কথা শেষ হলে মিঃ ভাদুড়ি বললেন,

—মিঃ চৌধুরী এবার তাহলে বলুন কিভাবে উজ্জ্বলা দেবীর মৃত্যু হয়।

—ওকেও আমিই মোটর বোট থেকে জলে ঠেলে ফেলে দি। আমারই সব প্ল্যান করা ছিল। ঠিক করেছিলাম সন্ধ্যার চাঁদ উঠলে আমরা বোটিং করব। সেইমত আমি বোটে উঠি। ষ্টিয়ারিং আমার হাতেই ছিল। লেকের মাঝখানে আমরা থেমে গল্প করি আর একটু ড্রিংক করি। আমার কাছে দুটো বোতল ছিল। একটাতে জিন্ উজ্জ্বলার জন্য আর একটাতে জল মেশানো কোকো কোলা, বললাম রাম। উজ্জ্বলা বেশি ড্রিংক করতে পারতো না, দু-একটা ছোট পেগ জিন খেলেই ওর কাজ হতো। এর পরই আমি আবার বোট চালাতে আরম্ভ করি, তারপর সুবিধেমত একজায়গায় মোটর বন্ধ করে দি, বলি নিজে নিজে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ইঞ্জিনটা দেখার ভান করছিলাম আর একটু খুট খাট করছিলাম। আমি কি করছি দেখার জন্য ও ঝুঁকে দেখছিল, ঠিক ঐ সময় হঠাৎ ষ্টার্ট করেছি আর একটা জার্ক দিয়ে বোট চলতে আরম্ভ করে আর ও বেসামাল হয়ে যায়। ও সামলে উঠবার আগেই ওকে এক ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম ও সাঁতার কাটতে পারে না। ও জলে পড়ে যাওয়ার পর বোতল দুটো জলে ফেলে ডুবিয়ে দিলাম। তারপর জলে ঝাঁপ দিই এবং ওকে যেন তোলার চেষ্টায় সাঁতার কাটি। তারপর সাইরেন বাজাই আর সকলে সন্ধান চালায়। এরপর আগে যা বলেছি···

রজত থামলে মিঃ ভাদুড়ি বললেন, 'আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। তারপর বসে পড়লেন।

এখন ডিফেন্স কাউন্সেল, অমল সামন্তের বক্তব্য শেষ করার পালা। তিনি বক্তব্য আরম্ভ করলেন।

—ইওর অনার আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। আসামী তার অপরাধ স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছে। সে এখন অনুতপ্ত এবং মানসিক ভাবে অসুস্থ। আমি মহামান্য আদালতের কাছে 'মার্সির' জন্য আবেদন করছি। সে ঘোরতর অপরাধ করেছে, কিন্তু তাঁকে ঠিক 'বর্ণ-ক্রিমিনাল বলা যায় না। নিম্নবিত্ত লোকেদের প্রতি সমাজের যে ঘৃণা ও অবহেলার মনোভাব সেটাই তাকে হিংস্র করে তোলে। তাকে প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তোলে। তার ক্রাইমের পথে অর্থ আহরণের মূলে আছে সমাজের কাছে তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছে। সে বুদ্ধিমান, মেধাবী এবং উচ্চ-শিক্ষিত, তার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। মণিকা দেবীকে জিজ্ঞাসা-বাদ করার সময় এটা জানা গেছে সে তার সঙ্গে কোন দিন কোনো অশোভন আচরণ করেনি। নিজেকে সংশোধন করার প্রবল ইচ্ছা না থাকলে এরকম সংযত ব্যবহার সম্ভব নয়। আর তার কুড়ি লাখ টাকার উপর লোভ ছিল কিনা সেটা

নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়নি। এটাও আদালতে প্রকাশ পেয়েছে যে প্রভাত সাহা যাকে আমরা বীমা এজেন্ট বলে জানি সে ডিটেকটিভ্ এজেন্সির লোক। ঐ চেক সংগ্রহ করার জন্য বীমা কোম্পানির অফিসে যে রজত যায়, তারজন্য প্রভাত সাহাও তাকে প্রভাবিত করে। আর এ ব্যাপারে পুলিশও একটু 'হেষ্টি' এ্যাকশন নিয়েছে। প্রভাত সাহা আর পুলিশের নাটকীয় ভূমিকা—এই দুটো ফ্যাক্টর বাদ দিলে রজত কি করতো সে সম্বন্ধে একটা বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্ন থেকে যাচ্ছে। সে দিক থেকে তাকে কিছু কন্‌সিডারেশন দেখানো যেতে পারে। অবশ্য একথা আমি মোটেই বলতে চেষ্টা করছি না যে তার অপরাধের গুরুত্ব তাতে কমেছে। অনুতাপে দগ্ধ সে, এখন যদি সে একটু করুণা পায় এবং মনস্তাত্ত্বিক সংশোধনী চিকিৎসার সুযোগ পায় তাহলে পরে তার প্রতিভা কল্যাণকর পথে যেতে পারে। সে যে রকম অপরাধ করেছে তাতে সাধারণ ভাবে প্রাণদণ্ডই বিধেয়। আমার সানুনয় প্রার্থনা, তাকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে করুণার দৃষ্টিতে বিচার করে তাকে দীর্ঘ-মেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হোক। তাহলে সে হয়তো সমাজের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হতে পারবে।

এবার বিচারক ঘোষণা করলেন, পরের দিন তিনি তাঁর রায় দেবেন। পরের দিন বিচারকের রায় শোনার জন্য কোর্টভর্তি লোক। দশটার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিচারক কোর্টে ঢুকলেন। তিনি আসন গ্রহণ করলে সবাই বসলেন। বিচারকের রায় প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী। তিনি শুধু পড়লেন শেষ অংশ, "আমি উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ শোনার পর এবং উভয় পক্ষের কৌঁসুলির যুক্তি ও বিশ্লেষণ শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে আসামী রজত চৌধুরী দোষী এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী তাকে আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। তার মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে জেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিচ্ছি সে যেন উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার সুযোগ পায়।

বিচারের রায় শোনার পর মণিকা চলে যায় নিজের কর্মস্থলে, আর কৌঁসুলি দুজন পরস্পরকে অভিনন্দন জানিয়ে করমর্দন করলেন। কেননা দুজনের ধারণা দুজনেই জিতেছেন! আর রজতকে নিয়ে যাওয়া হলো আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। কোর্টের আদেশমত সেখানে তার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। কলকাতার বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শুভাশীষ মুখার্জিওর চিকিৎসার ভার নিলেন। তাঁর চিকিৎসায় খুব তাড়াতাড়ি খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। তার আচরণে, তার মনোভাবে, তার ব্যক্তিত্বে তার ছাপ পড়ে। আগে বীমা কোম্পানি থেকে যত টাকা পেয়েছিল, তার একটি পয়সাও সে নষ্ট করেনি। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে রাখে। সে সমস্ত টাকা তুলে সুদ সমেত বীমা কোম্পানিকে ফেরৎ দিল। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কাজেই জেল কর্তৃপক্ষ, বীমা

কোম্পানি এবং অন্যান্য সকলের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলল। সব সংবাদপত্রে রজতের ছবি সমেত খবরটা ছাপা হলো। এর ফলে বেশ ভাল রকম রেমিশন পেল রজত চৌধুরী।

পরবর্তী ঘটনা আরো নাটকীয়। জেল কর্তৃপক্ষকে জেলের মধ্যে একটা স্কুল খোলার প্রস্তাব দিল রজত। সে-ই স্কুলের ভার নেবে আর জেলবন্দীদের লেখা-পড়া শেখাবে। এ কাজে জেলার সাহেব খুব উৎসাহ দিলেন। সরকারি আনুকূল্য পাওয়া গেল। দিনের কাজের শেষে নিজের সেলে বসে রাত্রি বেলা একটা বই লিখতে শুরু করল। লেখা শেষ হলে বইটা এক প্রকাশকের কাছে পাঠায় ছাপার জন্য। 'মনেটারি ফ্রড ইন্ কোম্পানীজ' নামে বইটা প্রকাশ পেলে বাজারে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খুব বিক্রি হলো বইটা—শুধু দেশে নয় বিদেশেও। বই-এর জন্য যা 'রয়্যালটি' পেল তার সমস্ত টাকা জেল কল্যাণ তহবিলে দান করে দিল রজত। জেলার সাহেব বললেন, 'একি করছেন আপনি, সব টাকা দিয়ে দেবেন। একদিন তো জেল থেকে বেরোবেন, তখন তো আপনার টাকার দরকার হবে, তখন কি করবেন?'

হাসিমুখে রজত উত্তর দেয়, 'তখন দেখা যাবে, এখন তো আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন!'

যতই দিন যাচ্ছে জেলারের শ্রদ্ধাও বেড়ে যাচ্ছে রজতের প্রতি। একবার রাজ্যপাল এলেন জেলে, 'স্বাধীনতা দিবস' অনুষ্ঠান উপলক্ষে। তিনি নিজেই জেলারকে বললেন, তিনি রজতকে দেখতে চান আর তার সঙ্গে কথা বলতে চান। রজতকে ডাকা হলো এবং রাজ্যপালের কাছে উপস্থিত করলেন। রাজ্যপাল বললেন।

—আমি তোমার কথা সব কাগজে পড়েছি আর জেলারের কাছে শুনেছি। তোমার এখানে থাকতে কোন কষ্ট হচ্ছে না?

—না, আমি বেশ আছি। উত্তর দেয় রজত।

—তোমার কোন আর্জি আছে? আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারি?

—আপনার অনেক দয়া, আমার কোন আর্জি-আবেদন নেই।

খুবই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার। রজত চলে গেলে জেলার রাজ্যপালকে বললেন, 'ও এখন সমস্ত কিছু চাওয়ার উর্ধ্বে। ও নিজে থেকে মুক্তির জন্য আবেদন করবে না।···কিন্তু ওর মত লোককে জেলের মধ্যে আটকে রেখে আমরাই নিজেদের অপরাধী বোধ করছি। আপনি ওর মুক্তির আদেশ দিন!'

এর কয়েকদিন পরই রজতের মুক্তির আদেশ এলো। এর মধ্যে জেলে আট বছর কখন কেটে গেছে রজত যেন বুঝতেই পারেনি। আজ তার মুক্তির দিন। সকলের কাছ থেকে জেলার সাহেবের ঘরে এলো রজত। জেল থেকে বেরোবার

আগে কাগজপত্রে সই করার সামান্য ফর্মালিটি। সব শেষ হলে জেলার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন যাবেন কোথায়?' 'জানিনা', রজতের উত্তর।

'চলুন, আমার কোয়ার্টারে চলুন, আমরা একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করবো।' বলেন জেলার সাহেব।

জেলার সাহেবের কোয়ার্টারে ব্রেকফাস্ট প্রায় শেষ—এমন সময় একটা গাড়ি ঢুকলো। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রমহিলা হাল্কা কালো চশমা চোখে।

জেলার সাহেব বললেন, 'ফিরে দেখুন তো মিষ্টার চৌধুরী—ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারেন কিনা?'

রজত উঠে ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে যায়, বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, 'কে—মণিকা?'

—হ্যাঁ, আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি!

—কোথায়?

—কেন, আমাদের ফ্ল্যাটে। একসঙ্গে থাকবো আমরা।

—বড্ড দেরি হয়ে গেছে, এখন কি আবার নতুন করে জীবন শুরু করা যায়?

—কেন নয়, জানো তো ইংরিজিতে একটা কথা আছে, লাইফ্ বিগিন্স্ এ্যাট ফরটি!

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

—

উৎসব

এখন আনোয়ার আলির বেশ মুডে থাকার কথা। এই তো কিছুক্ষণ আগে সে বড়োলোক বন্ধুর বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে ধানমণ্ডির মস্ত এক বাড়িতে গিয়েছিলো। ভিতর ধানমণ্ডির খুব সুসজ্জিত, অভিজাত ও আধুনিক বাড়ি। প্রচুর পরিমাণে ভালো-ভালো মেয়ে দেখা গেছে, কয়েকজনের সঙ্গে এমনকি আলাপও হলো। সমস্ত বিয়েবাড়ির কুলীন কলরব অন্তত সপ্তাহখানেক শরীরে সুখ উদ্রেক করবে।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ওদের সরু গলির মুখে ঢুকেই আনোয়ার আলি বিরক্ত ও দুঃখিত হয়ে পড়লো। তার বিরক্তির কারণ এইসব: গলির নালায় কালচে হলদে রঙের ঘন জল ল্যাম্পোস্টের ফ্যাকাশে আলোতে ঘোলাটে চোখে নির্লিপ্ত তাকিয়ে থাকে। নালার তীরে মানুষ ও কুকুরের অপকর্ম কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমায়। আর, আর এইসব লোকজন। পাড়ায় অধিবাসীরাও তার বিরক্তির একটি কারণ। নাইট শো ছবি ভাঙতে এখনো আধঘণ্টা, পাড়ার তরুণ সমাজ মেয়ে দেখবে বলে এখন থেকেই পাঁয়তারা কষে। গলির বাঁ দিকে বড়ো রাস্তায় চলছে জুয়ার জমাট আড্ডা। আহমদিয়া হোটেল এ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টে বিশ বছর আগেকার 'ছোড়ে বাবুল কা ঘর' বিরতিহীন বাজে। এখন রাত্রি সোয়া এগারোটা, আরো ঘণ্টা দুয়েক এই কর্কশ কোলাহলের কাল।

আনোয়ার আলির দুঃখের কারণ: এই অঞ্চল এবং সন্ধ্যাবেলার উৎসবমুখর বাড়ি ও ঐ এলাকা তার বিরক্ত চিত্তে পাশাপাশি অবস্থান করে। ধানমণ্ডির রাস্তা সবই চওড়া, মসৃণ, নোতুন ও টাটকা। দুধেল আলোর নিচে গা এলিয়ে তারা আলো পোহায়; শুয়ে-শুয়ে দেখে, মাথার ওপর অনন্তকাল বিরাজ করছে রহস্যময় মহাশূন্য। দেশি-বিদেশি মেয়েমানুষভরা গাড়ি একেকটা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, উড়াল দিচ্ছে অন্য কোনো ইন্দ্রপুরীর দিকে। সম্মানজনক দূরত্ব নিয়ে পকেটে-হাত দাঁড়িয়ে আছেন মণিমুক্তাখচিত বড়ো-বড়ো সব প্রাসাদ। বোঝা যায় ঐসব নিষিদ্ধ গ্রহ-নক্ষত্রে কোয়ার্টার ডজন হাফ ডজন রূপসী অন্য কোনো ভাষায় বাক্যালাপ করে। এই সেতারে মালকোষ ধরলো কি হাই তুলতে-তুলতে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে মন্থর আঙুলে। মুনতাসির কি ইশতিয়াক কি আহরার

এলে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এল পি চালিয়ে দিয়ে স্যোসালিজম সম্বন্ধে গল্প করছে কি নরম গলায়। আবার এরই ফাঁকে-ফাঁকে সময় করে লোনলিনেসে কি মিষ্টি কষ্ট পায়। তখন আর উপায় থাকে না, পুরো দুটো ঘণ্টা এয়ার কণ্ডিশনের ওপর ফুল স্পিড পাখা চালিয়ে ডিউক এলিংটন শোনে।

আর দেখো এখানে! এই দুপুর রাতে আটটা-নটা কুত্তা দৌড়ে বেড়াচ্ছে একবার গলির এমাথায়, একবার ওমাথায়। কুকুর কি আর ওদিকে নেই? ওদিকেও আছে। বিয়ে বাড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন। কি গম্ভীর তাঁর মুখ, কি তাঁর চেহারা! কি ডাঁটে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছিলেন মৃদু-মৃদু। মনে হয় বাঙলা ফিল্মের জমিদারবাবু দোতলার ব্যালকনিতে ডেক চেয়ারে বসে পা দোলাতে-দোলাতে সূর্যাস্ত উপভোগ করছেন। এইসব কুকুর দেখলেও মনের মধ্যে ভক্তিভাব জেগে ওঠে।

আর দেখো, পাড়ার কুত্তার বাচ্চাদের একবার দেখো! সবগুলো শালা নেড়ি, গায়ে লোম নেই একফোঁটা, শরীর ভরা ঘা নিয়ে কেবল কুঁইকুঁই গোঙায়। একেকটা আবার কোনো কোনো ছোটো লোকের বাচ্চার মতো যা-তা খেয়ে ধ্যাবড়া মোটা হয়েছে, তাকিয়ে থাকে ভাবলেশহীন চোখে, ল্যাম্পোস্ট পেলেই ছিরছির পেচ্ছাব করে।

নিজের ঘরে ঢুকলে মনে হয়, এই ঘর ঐ গলিরই একটা বাইলেন। সেই ভিজেভিজে ভ্যাপসা ভোঁতা গন্ধ, ৪০ পাওয়ারের টকটক আলোর ভেতরে ঘুম-থেকে-ওঠা সালেহা বেগমের পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা হলুদাভ ও একটা শাদা দাঁত নির্লজ্জ উঁকি দেয়। সালেহা বেগম তার স্ত্রী, তার স্ত্রীর ঠোঁটের কোণে লালার আভাস, সমগ্র মুখমণ্ডলে গ্রাম্যতা, কেবল গ্রাম্যতা তোতলায়।

'পলির মা, আমার লুঙিটা কোথায়?' আজ অক্টোবরের ৫ তারিখ, মাসের প্রথম দিকে সে তার স্ত্রীকে সালেহা বলে সম্বোধন করে, রিকশায় উঠলে বলে শেলী। কিন্তু দুঃখ ও বিরক্তি তাকে দিয়ে আজ প্রথা ভাঙায়।

সালেহার ঘুমঘুম হাসি এড়াবার জন্য আনোয়ার আলি উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে লুঙি পরতে থাকে। তার ক্ষোভ হয়, এই মেয়েটা বছরখানেক হলেও তো কলেজে পড়েছে, বিয়ের আগে এমনকি একটু প্রেম মতোনও করলো। অথচ এমন জবুথবু হয়ে থাকে কেন? শাড়ির ভেতর বুক নেই পাছা নেই, দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা বেঢপ কোলবালিশ।

'রাত অনেক হলো, না? ক'টা বাজে, এ্যাঁ?'—বলতে-বলতে সালেহা বেগম চলে গেলো উঠানে। কলতলায় দুটো ইঁটের ওপর ধ্যাবড়া দুটো পা রেখে সে এখন গ্যালন খানেক পেচ্ছাব করবে। মেয়েমানুষের এরকম বারবার পেচ্ছাব পায়খানা করা, দলা থুতু ফেলা—এসব আনোয়ার আলির মনঃপুত নয়। তো কি

আর করা যাবে? এসব মেয়েমানুষ শোধরায় না কোনোদিন। করুক, সালেহা যতো খুশি পেচ্ছাব করুক, এই ফাঁকে সন্ধ্যেবেলাটা ভেবে নেওয়া যাক। এক হাত আলনায় প্যান্টের ওপর রাখা, আরেক হাতে স্যাঁতস্যাঁতে হলুদাভ আণ্ডারওয়্যার—ছোটো ঘরের স্বল্প শূন্যতায় উৎসব দেখার জন্য আনোয়ার আলি নিবিষ্টচিত্ত হলো।

কিন্তু উৎসব, বা উৎসবের কোনো মহিলা গোটা শরীরে কখনো আসে না। ঝলমল আলোর নিচে সমস্ত বিবাহ উৎসব কখনো একটিমাত্র ঝাপসা চিত্রে, কখনো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে চোখের লাল-লাল রেখায় চোখ টেপে। একবার মনে হয়, এ বিয়েতে না গেলেই ভাল হতো। কাইয়ুম তার কি এমন বন্ধু? সেদিন স্টেডিয়ামে হঠাৎ দেখা না হলে সে তো এই বিয়ের কথা জানতেও পারতো না। কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলো বছর দুয়েক, একই ছাত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলো বলে এবং একটা ধর্মঘট আয়োজন করবার সময় দুজনে একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো। বেশ বড়োলোকের ছেলে, বামপন্থী রাজনীতি করে, ছাত্রও খুব তুখোড়, সবাই কাইয়ুমের কাছে ঘেঁষতে চাইতো। এই বিয়েতে না এলে কে আর ওর অভাব বোধ করতো? এসে দু' তিনজন পুরোনো সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হলো।

কে কাইয়ুমের বেশি কাছে ঘেঁষতে পারে, এই নিয়ে হাফিজের সঙ্গে ওর একটু প্রতিযোগিতা মতো ছিলো। ওকে দেখে দশ বছর পর সেই ঈর্ষাবোধ কিলবিল করে উঠলো। প্রথম যখন কলেজে ভর্তি হয়, হাফিজ তখন একটু গ্রাম্য ধরনের ছেলে, উচ্চারণে আঞ্চলিক টান এখনো কানে বাজে। ছাত্রজীবনে চাঁদা তুলে একুশে ফেব্রুয়ারির সংকলন বার করতো, এখন এখানেই কোন কলেজে বাঙলা পড়ায়, একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতি দায়িত্ব আজো পালন করে চলেছে। লোকটা বড়ো বকে, বড়ো বেশি কথা বলে। উৎসবের রূপসীরা চোখের সামনে আসে, ফের চলে যায়, কিন্তু হাফিজের আত্মজীবনীপাঠ বিরতিহীন, 'আমি ভাই এইসব ফাংশন এ্যাভয়েড করি। আমি বাবা প্রফেসর মানুষ, পড়াশোনা নিয়েই সময় কাটে। হৈ চৈ ভাল্লাগে না। পলিটিক্স তো ছেড়ে দিয়েছি ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েই। লেখাও স্টপ; তা রেডিও টিভির লোক পেছনে লেগেই আছে, ওদের চাপেই এখনো গান লিখি, এই গানই লিখি কেবল।'

আনোয়ার আলির এক হাত তখনো প্যান্টের ওপর রাখা, এক হাতে খামচে ধরে আছে নরম আণ্ডারওয়্যার। আহমদিয়া রেস্টুরেন্টে উচ্চকণ্ঠে লতা মঙ্গেসকর বাজে, রেকর্ডে অধ্যাপক ও গীতিকার হাফিজুর রহমানের আত্মজীবনী শোনা যায়। আনোয়ার আলি এদিক দেখে, ওদিক দেখে, মেয়ে কোথায়, ভালো ভালো মেয়ে খুব ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার। একসঙ্গে এতো ভালো মেয়ে আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না। জায়গাটা ও পেয়েছিলো সবচেয়ে ভালো। ঘন

সবুজ লনে অজস্র চেয়ার ছড়ানো। অনেকে বসেছে, কেউ কেউ ঘুরে ঘুরে কথা বলছে। বাইরে বিশেষ ট্রাফিক পুলিস, গাড়ি পার্ক করে রেখে লোকেরা মেয়েরা লনে আসছে। কাইয়ুম কিম্বা কাইয়ুমের বাবা প্রায় সকলের সঙ্গেই একটু হাসছে। খুব সামান্য রসিকতা কিম্বা অরসিকতাতেও লোকেরা মেয়েরা হো হো করে দমকা হাসি ছাড়ছে। কোনো কোনো মহিলা লন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে, ঐ জায়গাটাও আনোয়ার আলির চেয়ার থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

একটি কোণে আলোকিত কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বাঙালি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র চর্চায় কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ লোক ও মেয়ে বেশ সুন্দর একটি কর্নার তৈরি করে নিয়েছে। আনোয়ার আলির কাঙাল সাধ হয় সেও ঐখানে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যায়। এদের মেয়েরা অল্পের মধ্যে সুন্দর সাজতে পারে। খুব মনোহারী কণ্ঠে কি সুন্দর বাচনভঙ্গি এদের। আজকাল ১৪/১৫ থেকে ৩০/৩২, এমনকি কোথাও কোথাও ৩৯/৪০—এই বয়সের অনেক মেয়ে এদের কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গি নকল করে। তবে বাইরে ইমিটেশন শোনা এক কথা, আর একেবারে ওরিজিন্যাল শোনা—কোনো তুলনা হয়? ওখানে যাওয়ার জন্যে সে উসখুস করে, কিন্তু ওখানে কাউকেই তো চেনে না, কি করে যায়?

'তোমার ভাবী, বুঝেছো, এসব ব্যাপারে খুব ইন্সপায়ার করে। আমার মাদার-ইন-ল ওয়েস্ট বেঙ্গলের খুব এ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির মেয়ে। সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবদের সঙ্গে রিলেটেড, খুব কালচার্ড ফ্যামিলি। আমার মেজো শালাকে চিনবে, শাহরিয়ার, সৈয়দ শাহরিয়ার হোসেন, এবার সিএসেসে এ্যাপিয়ার করেছিলো, সিভিল সার্ভিসই পেয়েছে, লাহোরে ট্রেনিং চলছে, সেও গান-বাজনার ভক্ত। আমার একটা গান শুনেছো বোধহয়? খুব পপুলার হয়েছে, প্র্যাকটিক্যালি ওরই ইনিশিয়েটিভে রেকর্ড হলো। খোন্দকার রফিক আহমেদ গেয়েছে খুব হিট গান, 'ওগো বন্ধু, আমায় তুমি দিলে ওগো কেয়ার কাঁটা আজ, কারে তুমি পরালে গো কেয়াফুলের সাজ?' —তো এই গান'—কাইয়ুম একজন যুবতীকে নিয়ে এদিকে এলে হাফিজের আত্মজীবনী পাঠের আকস্মিক বিরতি ঘটে। যুবক সুবেশধারী ও সুপুরুষ, তার চেহারা খুব ধারালো। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় কাইয়ুম হাফিজের সাহিত্যকীর্তির প্রশংসা করলে আনোয়ার আলির বুকটা চিনচিন করে ওঠে। ঐ যুবকের নাম ইকবাল হোসেন চৌধুরী, পশ্চিম ইউরোপের এক রাজধানীতে পাকিস্তানী দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি। ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে ছাত্র ছিলো যখন, সে আজ ১৩/১৪ বছর তো হবেই, বাম রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায়ই আমতলায় বক্তৃতা করতো, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত এই দুই ধরনের গান গাইতো এবং তখনকার নিয়ম অনুসারে সংগ্রামী কবিতা লিখতো। সেই সময় তার লেখা একটি কবিতা 'আমরা সূর্যটা আনবোই'

পড়ে আনোয়ার আলি অন্তত দিন তিনেক খুব চাঙা সময় যাপন করেছিলো। প্রাক্তন কবি ইকবাল হোসেন চৌধুরী আজ ফের অনুপ্রেরণা দিলো গীতিকার অধ্যাপক হাফিজুর রহমানকে। তার আত্মচরিত বর্ণনা করবার প্রধান ইন্দ্রিয় জিহ্বা রূপান্তরিত হয় একটি ল্যাজে, লোমহীন ছোটো ল্যাজ মুগ্ধস্বরের ধ্বনিপুঞ্জে কি কারুকাজ করে যার ফলে এই সব বাক্য উৎসারিত হতে থাকে, 'আপনার নাম আমি বহুদিন থেকেই জানি। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, লেখা ছেড়ে দিয়ে আপনি ভারি অন্যায় করেছেন। রাদার, শুড আই বি এ্যালাউড টু সে দ্যাট ইউ কমিট এ ক্রাইম? উই হ্যাভ বিন গিফটেড উইথ এ্যান এ-ক্লাস ডিপ্লোম্যাট, নো ডাইট এ্যাবাউট ইট, বাট এ্যাট দ্য কস্ট অফ এ্যান এ-ক্লাস পোয়েট।'

ইকবালের তৈরি-করা ইউরোপিয়ান হাসি দেখে আনোয়ারের ঠোঁট একটু-একটু ব্যথা করে। এর মধ্যে লোকজন অবিরাম আসছেই। কাইয়ুম গেটে গিয়ে শেরোয়ানি পরা একজন নামকরা রাজনীতিবিদ ও তাঁর তিনজন স্তাবককে নিয়ে বারান্দায় চলে গেলো। সংস্কৃতি কর্নারের পরিমিত হাসি হঠাৎ একটু উচ্চকণ্ঠে শোনা গেলে আনোয়ার আলির শরীরে বড়ো কোলাহল সৃষ্টি হয়। কাইয়ুম ফের এদিকে এলো, তখনো হাফিজের লাঙ্গুলচর্চা চলছেই, 'আমি বলি, লোকে যাই বলুক না, আমি অলথ্ বলে আসছি, আমার ছাত্রদেরও বলি, এই ফরেন সার্ভিস, সিভিল সার্ভিসের কিছু এনলাইটেণ্ড লোকের জন্যেই আমাদের আর্ট কালচার এখনো টিকে আছে। কর্তাদের যা এ্যাটিচুড, অন্তত সো ফার এ্যাজ আর্ট এ্যাণ্ড কালচার ইন কনসার্নড, সেটা ঠিক, আই মিন'—

'নট ভেরি এগ্রিয়েবল।' ইকবাল নিজেই হাফিজের বাক্য সম্পূর্ণ করে দিলে কাইয়ুম আনোয়ার আলির সঙ্গে ইকবালের পাঞ্জাবী স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দেয়, 'উই আর ফ্রেণ্ডস সিন্স আওয়ার আলি ইউথ।'

মিসেস ইরশাত হোসেন চৌধুরী আনোয়ারের চোখের মণিতে ও বুকের খাঁচায় লাল ও শাদা হাসি ফোটায়, 'আচ্ছা! আপনারা কি য়েক সোঙে সকুলে পোঢ়তেন?' এই বাঙলা শুনতে বেশ মিষ্টি কিন্তু কামোদ্রেক করে না।

কাইয়ুম বলে, 'না, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়তাম। উই সাবসক্রাইবড টু দ্য সেম পলিটিক্যাল ভিউজ। কলেজে খুব পলিটিক্স করতাম আমরা।'

'ইজ ইট?' রূপসীর কণ্ঠ, নেত্রকোণ ও ঠোঁটে ছায়াছবির পর্দা কাঁপে, 'মাই গড! আই অ্যাম এ্যাফরেড অফ পলিটিশিয়ান্স। পলিটিক্স টেরিফাইস মি লাইক এনিথিং।'

আনোয়ার আলি ও সালেহা বেগমের ছেলে কলি একটা পা তুলে দিয়েছিলো তাদের মেয়ে পলির গায়ের ওপর। ছেলেমেয়ের মা ছেলেমেয়েদের ঠিকঠাক করে শুইয়ে একপাশে সরিয়ে রাখে। ছেলেমেয়ে অঘোরে ঘুমায়। বাইরে দ্বৈতকণ্ঠে কারা 'আরমান' চলচ্চিত্রের একটি গানের একটুখানি গেয়েই

থেমে গেলো। সালেহা ফ্যাসফ্যাসে গলায় কি বলে, আনোয়ার আলি তার কথাও শোনে, কয়েক ঘণ্টা আগে শোনা মিসেস ইরশাত হোসেন চৌধুরীর গুঞ্জরণও তার কানে বাজে। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সামনে সরকার বিরোধী কথা বলবার তৃপ্তিতে হাফিজ খুব অভিভূত হয়ে পড়েছে। মিসেস চৌধুরীর কথার জবাবে আনোয়ার কী বলবে কী বলবে ভাবতে ভাবতে রূপসীর মনোযোগ চলে যায় অন্য কোথাও, অন্য কোনো প্রসঙ্গে। আনোয়ার আলি শোনে হাফিজ তার কানের কাছে মুখ এনে বলছে, 'আমি কাউকে কেয়ার করি নাকি? দেখলে না, কেমন মিষ্টি কথায় গভমেণ্টকে দিলাম এক চোট।' মিসেস চৌধুরীর চেহারা একটুও মনে নেই। তার সংলাপ সবই স্পষ্ট মনে পড়ে, কিন্তু চেহারা কোথায়? মেয়েটাকে কতো মনোযোগ দিয়ে দেখলো, এদিক থেকে দেখলো, ওদিক থেকে দেখলো, কয়েকটা ঘণ্টা যেতে-না-যেতেই সমস্ত ভুলে বসে আছে। দিনদিন স্মৃতিশক্তি ক্ষয় হতে-হতে কোথায় এসে ঠেকলো? বয়স বেড়ে যায়, এতো তাড়াতাড়ি বয়স বাড়লে কি পোষায়? আনোয়ার আলি খুব জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এই দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত উৎসব একটু উড়ে গিয়ে বড়ো এলোমেলো হয়ে যায়।

সালেহা বেগম বালিশ সাজায় পাশাপাশি। 'কী গরম! ইস্ কী পচা গরম' বলতে বলতে সে গলায়, ঘাড়ে ও বগলে পাউডার ঢালে। এসব দেখে আনোয়ার আলি বড়ো বিব্রত হয়। চোখের ঘুমঘুম ছায়া কেটে যাচ্ছে সালেহার, ঘুমের জায়গায় আসছে কাম, সরাসরি কাম। তার ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠ ক্রমশ ঘর্ঘর হচ্ছে, তার কথাও বেশ বোঝা যায় এখন: 'আসতে এতো দেরি করলে কেন? খুব খেয়েছো, না? তোমার বন্ধু খুব বড়োলোক, না? ধানমণ্ডিতে কি নিজেদের বাড়ি? মেয়ে দেখতে কেমন? মেয়ের বাবা কি কি দিলো তোমার বন্ধুকে? তুমি কোনো কাজের না। আমি গেলে ঠিক জেনে আসতাম, বুঝলে! খুব লোক হয়েছিলো, না? কি খাওয়ালো, এ্যাঁ?'

শুয়ে পড়তে-পড়তে আনোয়ার আলি তার স্ত্রীর প্রশ্নমালার সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি সন্তোষজনক উত্তর দেয়। এখন নিয়মিত প্রাক-নিদ্রা রতিক্রিয়ার পালা। এই মেয়েটিকে অন্তত মিনিট বিশেক ভালোবাসতে হবে। ভয় হয়, সালেহা তার মূল্যবান সন্ধেবেলাটা তছনছ না করে ফেলে। তবে ভালো-ভালো মেয়ে দেখা গেছে বহু, সুখ তো আজ ওদের নিয়ে, সালেহা উপলক্ষ মাত্র।

আনোয়ার আলি অভ্যস্ত হাতে স্ত্রীর ব্লাউজের বোতাম, ব্রার হুক খুলতে গেলে সালেহা নিয়মিত ও ঘর্ঘর কণ্ঠে আওয়াজ করে, 'উহু, আজ থাক।' এবং আনোয়ারের আরো কাছে সরে আসে। অথচ আনোয়ারের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে ঠাণ্ডা সর পড়ছে। শীতল শরীরে একটু ধ্বনি শোনা যায়: কী হলো, আজ একটুও ইচ্ছা করছে না কেন? কোনো কোনো দিন দুপুরবেলা

অফিসে বসে সে পর্নোগ্রাফি পড়ে, সেদিন রাত্রিবেলা কিন্তু এই মেয়েটার শরীরেই বেশ টাটকা স্বাদ পাওয়া যায়। আজ ক্ষোভ হয়: যতোই সেক্সি হোক না, কায়দাটা এরা ঠিক রপ্ত করতে পারে না,—এই সালেহা টাইপের মেয়েরা। অথচ পারভেজের বৌটাকে দেখো। পারভেজের বৌও তো বড়োজোর আই এ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। বিয়ের সময় কলেজে কেবল ভর্তি হয়েছিলো, পরে আই এ কি আর পাস করেছে? অথচ দেখো তার কথা বলবার ঢং কী, কী তার তাকাবার কায়দা। মেয়েটার সঙ্গে আলাপ হলো একেবারে শেষের দিকে, ওরা তখন বেরিয়ে যাচ্ছে, আনোয়ার আলির ঘাড়ে হাত দিলো পারভেজ।

'আমি অনেকক্ষণ থেকে মার্ক করছি। অনেক মোটা হয়ে গেছো আনোয়ার, চিনতে অসুবিধা হয়।'

তারপর পরিচয় করিয়ে দিলো পাশে দাঁড়ানো বৌয়ের সঙ্গে, 'আমার স্কুলের বন্ধু। আমরা একই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছি, একই কলেজে পড়েছি, কলেজ থেকে বেরিয়ে আমি ইঞ্জিনিয়ারিঙে গেলাম, ও গেলো ইউনিভার্সিটি।'

আনোয়ার আলি ইউনিভার্সিটিতে পড়েনি। ঐ কলেজেই ১ বার ফেল করে অন্য কলেজ থেকে বি কম পাস করেছিলো। তার শৈশবকালের বন্ধু এ খবরটিও জানে না দেখে আনোয়ার বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে মেয়েটিকে দেখে। যে ধরনের চেহারা তাতে তার চোখেমুখে কলকল করে কথা বলবার কথা। কিন্তু সে খুব নিবিষ্টচিত্তে সংস্কৃতিসেবীদের অনুসরণ করছে। সুতরাং তার কণ্ঠে রুগ্ন সৌজন্য ও উচ্চারণে ঝাপসা কাম, 'ওর ছেলেবেলার বন্ধু আপনি? কতোকাল থেকে আলাপ আপনাদের, অথচ একদিনো তো আসেননি আমাদের বাসায়, কি আশ্চর্য!'

আনোয়ার সমস্ত মন দিয়ে স্থায়ীভাবে তার স্মৃতিতে এঁকে নিতে চেষ্টা করছে মেয়েটাকে। সমস্ত শরীর দেখছে গোগ্রাসে, দেখে নিচ্ছে তার জামা, তার জামদানি শাড়ির কারুকাজ, কপালের লাল টিপ, হাতের রোগা চুড়ি, ফর্সা আঙুল, নখের রঙ।

'তুই তো অনেক আগেই বিয়ে করেছিস, না? ছেলেমেয়ে কটা হলো? আয় না একদিন।' আনোয়ার আলি পারভেজের ঠিকানা নেয়, তার কথার যথাযথ জবাব দেয় আর সুগঠিত একটি বাক্য বোনে পারভেজের বৌয়ের উদ্দেশ্যে, 'কতোকালের বন্ধুত্ব, কিন্তু দেখাও তো হয় না কতোকাল। যাবো, একদিন অবশ্যই যাবো, আপনাদের বিরক্ত করে আসবো।' কিন্তু বলবো-বলবো করতে-করতে পারভেজের বৌ বলে, 'মিসেসকে নিয়ে চলে আসুন না একদিন, যে কোনো রোববার সকালে আসবেন। প্লীজ আসবেন। না এলে ভারি রাগ করবো কিন্তু।'

পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে হাতের তালুতে খেলা করতে-করতে

পারভেজ চলে গেলো বৌকে পাশে নিয়ে। এতো সাজানো বাক্যটি আনোয়ার আলির বলাই হলো না। এরকম সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে?

মৃদু সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো মেয়েটার শরীর থেকে। খুব মৃদু গন্ধ, খুব স্নিগ্ধ। এইতো কিছুক্ষণ আগে এতো কাছে দাঁড়িয়ে কথা হলো, অথচ মনে হয় কতো-কাল আগেকার কথা। আবার দেখো, এর চেয়েও কতো কাছে হাতের একে-বারে ভেতরে সালেহার স্তন, এতো কাছে, তবু তাকে স্পর্শ করা যায় না কেন? দুটো ফাঁপা বেলুনের মতে স্তনজোড়া ধরে আছে যে হাত সেই হাতে কি রাবারের পুরু গ্লাভস?

'প্লীজ আসবেন, না এলে খুব রাগ করবো কিন্তু।' সংলাপ মনে থাকে, নাকে এসে লাগে সুবাস, কিন্তু তবুও উৎসব, উৎসবের মহিলারা কতো দূরে রয়ে যায়। এদিকে সালেহার মুখ থেকে, বুক থেকে, হাত থেকে রক্তের নোনা ধোঁয়া বেরিয়ে ঘর মেঘলা করে দিলো। তার স্তনজোড়া ফুটছে টগবগ করে। কিন্তু আনোয়ার আলির শক-প্রুভ গ্লাভস খুলবে কে?

রেস্টুরেন্টের মাইকে এখন 'আওয়ারা হুঁ।' সিনেমা হল থেকে ফিরে যাচ্ছে সুখী জনগণ, তারা সবাই এ ছবির নায়ক, তাদের কারো-কারো কণ্ঠে এই ছবির হিট গান। মাত্র ১ বার খুব জোরে সিটি দেওয়ার আওয়াজ শোনা গেলো, বোঝা যায় মেয়েদের সংখ্যা কম। সাময়িক নীরবতার পর সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি ক্রমেই বাড়তে থাকে। জুয়ার আড্ডায় কি কোনো গোলমাল হলো? কিন্তু এই ধ্বনির টোন থেকে বোঝা যায়, উল্লসিত জনগণ কোনো সুখের ঘটনা উদযাপন করছে।

কিন্তু আওয়াজ তো ওখানেও ছিলো। কতো লোক এসেছিলো বিয়ের অনুষ্ঠানে, কতো মেয়ে। কি শান্ত, কি স্নিগ্ধ সেই ধ্বনি, আস্তে আস্তে চলছিলো টেপরেকর্ডার। বেশির ভাগই ওয়েস্টার্ন মিউজিক, মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'এসো, এসো আমার ঘরে এসো, আমার ঘরে' এই গান শুনতে-শুনতে একজন মহিলা বললো, 'বৌভাতের ফ্যাংশনে খুব এ্যাপ্রোপ্রিয়েট, না?' সেই মহিলা কে?

এখানে সমবেত ধ্বনির সঙ্গে 'আওয়ারা হুঁ' অস্পষ্ট হয়ে আসছে। একবার রেকর্ড পাল্টানো হলো। এবার গানের কোনো কথাই আর বোঝা যাচ্ছে না। জনতার এতো উল্লাস কি নিয়ে?

আনোয়ার আলি তার শরীরের ভঙ্গি একটুও না পাল্টে কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করে শব্দটা কিসের। সালেহার উত্তপ্ত মুখ থেকে বলকানো শব্দ বেরিয়ে আসে, 'কি হলো বাবা এতো রাতে? ইস্! মড়ারা কি নিয়ে হৈচৈ করে?'

'দমাদম মস্ত কালান্দার'—কার ভরা-স্বরে তীব্র আওয়াজ হলে জনতা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বাইরের প্রবল শব্দে আনোয়ার আলির শিথিল হাত

কাঠের টুকরার মতো পড়ে যায় তার নিজের ঠাণ্ডা বুকের কাছে। সে উঠে বসলো, 'দেখি তো এতো রাত্রে শালাদের কিসের এত সুখ, দেখে আসি।'

দরজা খুললেই সরু বারান্দা, ৩ ধাপ সিঁড়ি, তারপরই রাস্তা। এই গলির মুখে ক্ষুদ্র ১টি জনতার ভিড়। এই ভিড়ে নানা বয়সের লোক, ছোটো ছোটো ছেলেও আছে কয়েকটি। এরা কোনো বাড়ির না, বস্তিরও নয়। বাজারে ঝাঁকা বয়ে, সিনেমায় টিকেট ব্ল্যাক করে ও লোহার পুলে রিকশা ঠেলে ওরা দিনাতিপাত করে এবং ওর বারান্দায় ও ফুটপাথে ঘুমিয়ে ও না ঘুমিয়ে এরা রাত্রিযাপন করে। এদের ১ জনকে আনোয়ার আলি ডাকলো, 'এই ব্যাটা, কি হইছে?' ছোকরা তার দিকে একবার তাকায়, তারপর প্রবল স্বরে চেঁচায়, 'দমাদম মস্ত্ কালান্দার।'

গোটা দৃশ্য এবার স্পষ্ট হলো। ওদের গলির মুখে খিরিজ আলি বাকেরখানির দোকানের গা ঘেঁষে, ১টা ল্যাম্পোস্টের নিচে ১টি পুরুষ কুকুর ও ১টি মহিলা কুকুর যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। জনতা কুকুররতি দেখার উৎসবে মুখর, তারা নানাভাবে কুকুরদের উৎসাহিত করে। বড়ো রাস্তার উঁচু রোয়াকে জুয়াড়িদের আড্ডা থেকে কে ১টি গানের কলি ভাঁজছে, ১টি জনপ্রিয় গানের প্যারোডি, 'এই কার্তিক মাসে, দুই কুকুর এসে'—কিন্তু ঐ আড্ডা থেকেই আরেকটি উচ্চকণ্ঠ ধ্বনি ওঠে 'আব্বে হালায়, এক খামচা নিমক লইয়া আয় না বে। নিমক দিলেই তো দুইটা যায় গিয়া; যা না পিচ্চি, লইয়া আয় না হালায়, কইতাছি নিমক দিয়া ফালা!' ফলে গানের বাকি অংশ আর শোনা যায় না। কিন্তু কে যাবে লবণ আনতে? কেউই তার অবস্থান পরিবর্তন করতে চায় না। জুয়াড়িদের জায়গাটা এমন যে এখান থেকে খেলতে-খেলতেও সমস্ত দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখা যায়।

চার চাকার ঠেলাগাড়িতে স্তিমিত চুলার ওপর রাখা শাহী হালিমের মস্ত ডেকচি; এই পাড়ার ১জন লোক রোজ সন্ধ্যা থেকে রাত্রি ১২টা সাড়ে-১২টা পর্যন্ত হালিম বিক্রি করে রথখোলার মোড়ে। রাত্রি ১টার দিকে তার গাড়ি ঠেলে-ঠেলে এই গলির ভেতর দিয়ে সে ঘরে ফেরে। গলির মুখে ভীড়, লোকটা বাধ্য হয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে উৎসবে যোগ দেয়। ছোটো মাটির মালসায় করে হালিম ঢেলে দিচ্ছে সে; তলানির হালিম, ১ টুকরা গোশ্ত্ও দেওয়া যাচ্ছে না। অল্প দামে প্রায় ঠাণ্ডা হালিম কিনে খাচ্ছে লোকজন। আহমদিয়া রেস্টুরেন্টের সামনে যে ছেলেটা রেকর্ডের গানের সঙ্গে শিস দিয়ে পান বিড়ি সিগ্রেট বেচে, জুয়াড়িদের রোয়াক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে এখন হালিম খাচ্ছে। জুয়ার আড্ডা থেকে ১ স্কুটার ড্রাইভার তাস ফেলতে-ফেলতে কুকুরজোড়া দেখে এবং ১ মিনিট পর-পর সিগ্রেট-ওয়ালাকে ধমকায়, "আব্বে দে না হালায় চুতমারানি।" কিন্তু সিগ্রেটওয়ালার গলায় ঝোলানো পান বিড়ি সিগ্রেটের ডালা, ১ হাতে হালিমের বাটি, আরেকটা হাতে এ্যালুমিনিয়ামের চামচ, তার ২ হাত জোড়া, কি করে সে সিগ্রেট দেয়?

'এই যে আনোয়ার সাব', আনোয়ার আলি ঘুরে দেখলো নসরুল্লা সর্দার তার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। নসরুল্লা সর্দার এককালে এই মহল্লার প্রধান ছিলো; নবাব সলিমুল্লাহ সাহেব নিজে নসরুল্লার বাবাকে সর্দারীর তাজ দিয়েছিলেন ১৯০৭ সালে। এখন নসরুল্লার তেমন পাত্তা নেই। আনোয়ার আলি তার জানলার কাছে এসে দাঁড়ালে সর্দার সাহেব গজগজ করে, 'শুওরের বাচ্চাগো কারবারটা দ্যাহেন। হালায় বেশরম বেলাহাজ মানুষ, কি কই এ্যাগো, কন? মহল্লার মইদ্যে কতো শরিফ আদমি আছে, ঘরে বিবি বালবাচ্চা আছে, আর দ্যাখছেন খানকির পুতেরা কি মজাক করতাছে রাইত একটার সময়? দ্যাখছেন?'

নসরুল্লা নিজেও বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। এই জায়গাটা তার জন্যে ভালো হয়েছে, আনোয়ার আলির জন্যেও। এখান থেকে গোটা দৃশ্যের সম্পূর্ণটা চোখে পড়ে।

'আপনাগো অফিসের মইদ্যে ছাটাই ছুটাই হইলো?' বোঝা যায় নসরুল্লা আনোয়ারের সঙ্গে জমাতে চাইছে। '৩০৩-এর মইদ্যে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ আমাদের চেয়ারম্যান তো আপনার প্রথমদিকেই আছে।'

'মালপানি তো বহুত বানাইয়া রাখছে আগেই। অহন অগো ধইরা ফায়দা কি?' কিন্তু আনোয়ার আলি কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। এই লোকটা সুযোগ পেলেই আত্মজীবনী বলতে শুরু করে। আত্মজীবনীর ব্যাকগ্রাউণ্ডে নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব হাবিবুল্লাহর সময়ের সৎ বৃটিশ রাজপুরুষদের সঙ্গে পাকিস্তানী সরকারি কর্মচারীদের তুলনামূলক আলোচনা।

১ হাতে পানির বালতি, বালতিতে ছোটো কাঁচের গ্লাস, অন্য হাতে ছোটো ১টি কয়লার উনুনে চায়ের কেতলি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় 'চা-গ্রাম'। আপন মনে বিড়বিড় করতে-করতে নসরুল্লা ঘরে চলে যায়। জানলা দিয়ে কুকুরজোড়া শেষবারের মতো দেখে নিয়ে সে সশব্দে জানলা বন্ধ করে।

নসরুল্লার জানলা বন্ধ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১টা কুকুরের গায়ে এসে পড়লো ইটের ছোটো ১টি টুকরা। দম্পতি লজ্জা কিংবা ভয়ে, অথবা লজ্জা এবং ভয়ে একটু-একটু সরতে থাকে। কিন্তু এই অবস্থায় হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া ওদের পক্ষে অসম্ভব। কিংবা সেরকম ইচ্ছাও বোধহয় ওদের নাই।

হেমন্তকালের আকাশ জুড়ে গাভীর মতো চরে বেড়ায় মেষশাবকের দল। পাতলা স্বচ্ছ কুয়াশার জলে লালচে হলদে রঙের মস্ত চাঁদ; চাঁদ থেকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে ফর্সা হাওয়া বয়ে এসে আনোয়ার আলির করোটির ভেতর সুড়সুড়ি দিলে তার বড্ডো হাসি পায়। ওর ভাগ্যটা ভালো, জুয়াড়িদের আড্ডা থেকে ১টা তীক্ষ্ণ ধ্বনি শোনা গেলো, 'হায়রে বাইল্য বন্ধু!' সমস্ত জনতা ফেটে পড়লো

অট্টহাসিতে। আনোয়ার আলিও প্রাণ খুলে হাসে। সম্প্রতি ১টা বাঙলা ফিল্মে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। আনোয়ার আলি সেই ছবি দেখেছে, ছবি দেখতে-দেখতে সালেহা বেগমের সঙ্গে সেও খুব হেসেছিলো।

রাস্তায় অন্যান্য কুকুর বড়ো রাস্তার অন্যদিকে জটলা পাকায়। শুয়ে আছে কেউ শিথিল ভঙ্গিতে, কেউ দাঁড়িয়ে ঘেউ-ঘেউ করে হাসে। নিঃসঙ্গ ১জন কুকুর, মানুষ ও বোধহয় কুকুরদেরও দুর্বোধ্য কোনো যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ১জন আবেগপ্রবণ কুকুর উৎসব থেকে একটু দূরে, রাস্তার মোড়ে রাখা ঠেলাগাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গোলগাল মিষ্টিমিষ্টি চাঁদের দিকে বিষণ্ন চোখ তুলে মাঝে-মাঝে বিরতি দিয়ে খুব করুণ সুরে কাঁদে।

'জুম্মন আলি, আব্বে জুম্মন আলি', ১টি নতুন কণ্ঠস্বরে কুকুর ও মানুষ সবাই ফিরে তাকায়। রুটির দোকানের মালিক তোতামিয়া তার বালক কর্মচারীর খোঁজে চিৎকার করে, 'আব্বে চুতমারানী, এহেনে খাড়াইয়া কিয়ের রং দ্যাহো? রাইত বাজে একটা, আর তুমি হালায় খানকির বাচ্চা এহেনে রঙবাজি করো? তোমার কোন বাপে গিয়ে কাউলকা দোকান খুলবো?'

জুম্মন আলি একটু আবদেরে গলায় বলে, 'কি হইছে? ব্যাকটি রুটিই তো পাকিন কইরা রাখছি।'

'আব্বে মাদারচোদ, তামানটি রাইত বায়োস্কোপ মারলে বিয়ানে দোকান খুলবার পারবি?' জুম্মন আলি খুব পরোয়া করে বলে মনে হয় না। শেষবারের মতো কুকুররতি দেখে তোতামিয়ার সঙ্গে চলে গেলো।

জুয়াড়িদের ভেতর থেকে কে যেন জোরে বললো, 'জুম্মন আলি তো কুত্তার বায়োস্কোপ দেইখা গেলো, অহন তুমি হালায় বায়োস্কোপ মারো জুম্মনরে লইয়া, হেইডা দ্যাখবো ক্যাঠায়?'

কুকুরজোড়ার ধার ঘেঁসে আরেকটি ঢিল পড়লো। এই ঢিলটা তাক করা হয়েছিলো ল্যাম্পোস্টের বাল্বে। ল্যাম্পোস্টে টং করে আওয়াজ করে ঢিল ফিরে আসে। স্যাঁতস্যাঁতে আলোর ঘোলাটে বাল্ব অখণ্ড প্রতাপে জ্বলতেই থাকে।

ঘরে ঢুকে আনোয়ার আলি দরজা বন্ধ করতে-করতে খুব ভরা ও সম্পূর্ণ কণ্ঠে ডাকলো, 'সালেহা!'

ঘুমঘুম গলায়, আদুরে ভঙ্গিতে সালেহা বলে, 'এতোক্ষণ তুমি কি করছিলে, এ্যাঁ? বাইরে কি হয়েছে, বলো না!'

'বাইরে লোকজনের জটলা দেখে একটু মোড়ে গিয়েছিলাম।'

বিছানায় শুয়ে 'আমার শেলী' বলে আনোয়ার আলি স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলো।

'এতো হৈ চৈ কিসের এ্যাঁ, বলো না?'

'আর বলো না শেলী, দুটো কুকুরের ইয়ে দেখে লোকজন শালা— !'

আনোয়ার আলির হাত থেকে রবারের পুরু গ্লাভস খুলে গেছে। চামড়ার আবরণটাও উঠে যাচ্ছে নাকি?

'রাত একটার সময় আর কাজ নেই, যতো সব ভালগার লোকজন!'

সুখ ও উত্তেজনায় আনোয়ার আলির উত্তপ্ত কণ্ঠ থেকে, মুখ থেকে আঠালো ধ্বনি চুঁয়ে পড়ে।

নয়নতারা

রাজা মিত্র

অভিনয় শিল্পী :

নয়নতারা : মমতাশংকর
কুমার : শাশত চট্টোপাধ্যায়
নববাবু : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
শৈলবাবু : রবি ঘোষ
মানিক দত্ত : স্বরূপ দত্ত
রেখা : লাবণী সরকার
কমলা মাসী : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
ফটিক : পার্থসারথী দেব।

অন্যান্য ভূমিকায়

দেবাশীষ নাহা, নিরঞ্জন রায়, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীতা ব্যানার্জী, দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত, বাবু দত্তরায়, কমল চ্যাটার্জী, মুনমুন মুখার্জী, প্রদীপ্ত সেন, রজতাভ দত্ত, মাধুরী চ্যাটার্জী, মিঠু পণ্ডিত, কৃষ্ণা দত্ত, বাবু সমাদ্দার।

চিত্র গ্রহণ : ধ্রুবজ্যোতি বসু ও কমল নায়েক।

সম্পাদনা : উজ্জল নন্দী

চিত্রনাট্য সংগীত ও পরিচালনা : রাজা মিত্র

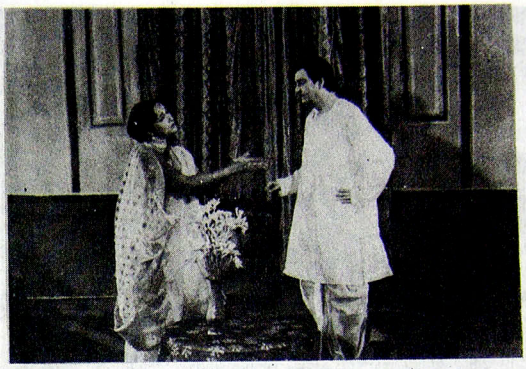

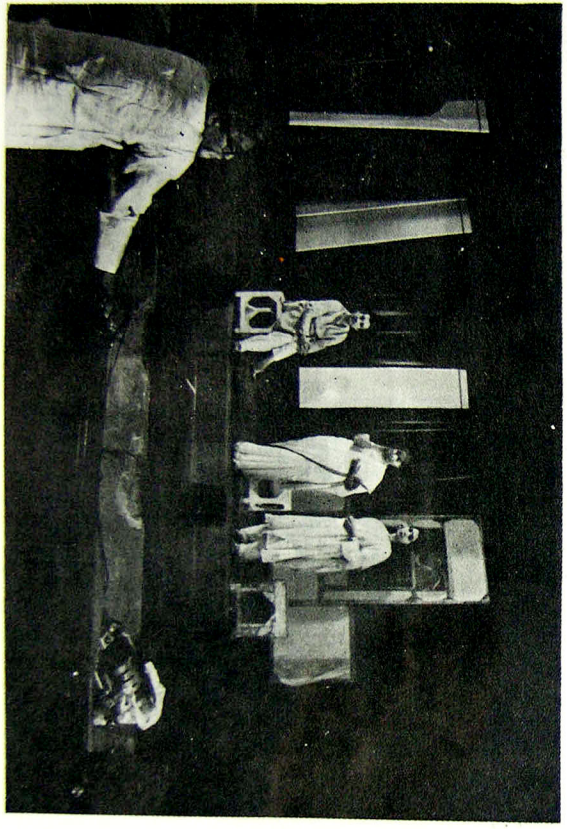

প্রসঙ্গ 'নয়নতারা'

পশ্চিমবাংলায় একধরনের অভিনেত্রী আছেন যাঁরা অফিস ক্লাব, বোর্ড থিয়েটার-এ বদলের কাজ, ওয়ান ওয়াল, বা সিনেমা সিরিয়ালে ছোটখাটো অভিনয় করে সংসার চালান। এঁরা অনেকেই বড় অভিনেত্রী হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অভিনয় শিল্পীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে এঁরা অভিনয় এবং সংসার জীবন—এর দুটোর কোনওটাই পরিপূর্ণ সার্থক ভাবে যাপন করে উঠতে পারেন না। কিন্তু এ দুটির প্রতিই এঁদের আগ্রহ নিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষার অভাব ছিলো না। এই নারী শিল্পীদের জীবন ও করুণ পরিণতি 'নয়নতারা' ছবির প্রতিপাদ্য। বহুদিন ধরেই এই ধরনের মহিলা শিল্পীরা এবং তাঁদের সংসার জীবনযাপন করার প্রণালী—যা বোধকরি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বিশেষত যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে প্রতিকূলতার মধ্যে এঁদের বেঁচে থাকতে হয়, লড়াই করতে হয়, তা আমার কাছে আগ্রহের বিষয় ছিলো। বিমল করের 'গ্রন্থি' রচনাটির মধ্যে সেই উপাদানের আভাস পাওয়া গিয়েছিলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কাহিনীচিত্র তৈরির প্রস্তাব আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেহেতু 'গ্রন্থি' উপন্যাসটিকে পরিবর্তিত করে নয়নতারা ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করি এবং সরকারি অর্থানুকূল্যে এই ছবি তৈরি করার সুযোগ পেলাম। এই ছবির মুখ্য অভিনেত্রী হিসেবে মমতাশঙ্কররে সঙ্গে কাজ করা আমার একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। ওঁর মতো চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বাংলাদেশে বিরল বলেই আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়-এর পুত্র শ্বাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ও আমার ধারণায় অমিত সম্ভাবনাময় একজন নবীন অভিনেতা। একজন পরিচালক অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে দিয়ে তার বক্তব্যকে উপস্থাপিত করে—সেদিক থেকে আমার ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য এবং এই ছবি যদি কিছুটা সার্থক হয়ে উঠে থাকে তাহলে এঁদের কৃতিত্ব এবং দক্ষতার কাছে আমার অপরিমিত ঋণ থেকে যাবে।

কাহিনী থেকে চিত্রনাট্য তৈরি করার বা রূপান্তরিত করার আদর্শ সত্যজিৎ রায়। ওঁর চিত্রনাট্য পড়ে এবং ছবি দেখে আমি শিখেছি কিভাবে চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ লিখতে হয়। এই ছবিতে আমি ফ্লাশব্যাক সিকোয়েন্স এমনভাবে সাজিয়েছি তা বর্তমান ঘটনার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এটা একটা নতুন ধরনের প্রয়াস। আবহসংগীতের ক্ষেত্রেও আমি যথাসম্ভব সংযত ও পরিমিত ব্যবহারের চেষ্টা করেছি।

এই চিত্রনাট্য প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য শ্রী সমরেন্দ্র সেনগুপ্তকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বাংলার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ওঁর 'বিভাব' পত্রিকার গুরুত্ব ক্ষুদ্র হলেও অপরিসীম। বিভাব-এর দৌলতে এই চিত্রনাট্য যদি আগামী দিনের চলচ্চিত্রকার চলচ্চিত্র-প্রেমীদের সামান্যতম দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করবো।

১৫.১২.৯৬ রাজা মিত্র

চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে

সম্ভাব্য কোনও ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় কাল। চিত্রনাট্য কোনও সাহিত্যকর্ম নয়। ছবির চরিত্রগুলির উচ্চারিত সংলাপ লিখতে গেলে যেটা দরকার তা হলো বাস্তববোধ, চরিত্রগুলি সম্বন্ধে সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সংলাপ রচনার যথার্থতা। সাহিত্যের সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। পর্দায় খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলি এবং শব্দসংগীত সেভাবে সাজানো হবে তারই একটা নির্ঘণ্ট। চিত্রনাট্য যে লিখবে বা পাঠ করবে তার কল্পনাশক্তি যদি প্রবল না হয় তাহলে চিত্রনাট্য থেকে সম্ভাব্য ছবিটি শেষ পর্যন্ত কি হবে তা উপলব্ধি করা কঠিন। চিত্রনাট্য যদি ছবির কাঠামো হয় তাহলে সেটি ছবির টেক্‌নিকের একটা অঙ্গ। যখন কোনও ছবির সমালোচনা করা হয় তখন তার টেক্‌নিক্যাল দিকগুলো নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে সাধারণত ছবির ফটোগ্রাফি, শব্দগ্রহণ, ক্যামেরা মুভমেণ্ট ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় অথচ ছবির চিত্রনাট্যও যে ছবির অবিচ্ছেদ্য টেক্‌নিক্যাল অংশ সেটা প্রায়শঃই স্মরণে আসে না। অর্থাৎ ছবির দৃশ্যগুলিকে কি ভাবে পরপর সাজানো হয়েছে, আবহসংগীতকে কি ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সংলাপ রচনা কতখানি স্বাভাবিক এবং ছবির সূচনা ও সমাপ্তি কতটা তাৎপর্যময়—এ সবই ছবির নির্মাণশৈলী বা টেক্‌নিকের মধ্যে পড়ে। চিত্রনাট্য সেই কারণেই চলচ্চিত্রের শিক্ষার্থীদের কাছেই পাঠ্যবস্তু, সাধারণ পাঠকের কাছে চিত্রনাট্য সুখপাঠ্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

চিত্রনাট্য রচনা ব্যাপারটা হয়তো বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধরনের। আমরা যখন ছবি তৈরি শেখার ইচ্ছে নিয়ে ষ্টুডিও চত্বরে ঘোরাঘুরি করতাম তখন শুনতাম অমুক পরিচালক অমুক ছবির স্ক্রীপ্ট লেখার জন্য অমুক স্বাস্থ্যনিবাসে বা পর্যটন কেন্দ্রে সদলবলে কাগজ কলম ও রাইটারসহ দিনযাপন করতে যাচ্ছেন। আবার এমন পরিচালক দেখেছি যিনি নিজের বাড়িতেই একটি ঘরে রুদ্ধদ্বারে তপশ্চর্যার মত দিনের পর দিন চিত্রনাট্য লেখায় ব্যাপৃত হয়ে আছেন। আমার ক্ষেত্রে চিত্রনাট্য রচনা খুবই সাধারণ দৈনন্দিন কাজকর্ম করার মত। সাংসারিক ও রুজিরোজগারের রোজকার কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে আমি অল্প অল্প করে চিত্রনাট্য লিখতে অভ্যস্ত। চিত্রনাট্য লেখার জন্য বিশেষ কোনো সময় পরিমণ্ডল বা মনঃসংযোগের প্রয়োজন আমার হয় না। বরঞ্চ সাংসারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে লেখার সময় আমি আমার চারিদিকে উচ্চারিত সংলাপ, আমার মা-বাবা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, আমি যখন পথে বিপথে ঘুরে বেড়াই তখন যে সমস্ত

মানুষজনদের সঙ্গে আমার দেখা হয় যাদের কথাবার্তা আমি প্রতিনিয়তই শুনে থাকি, তার মধ্যে থেকেই আমি আমার চিত্রনাট্যের সংলাপ পারিপার্শ্বিকতাকে নির্মাণ করতে থাকি সংশোধন করতে থাকি এবং শেষ পর্যন্ত একটা চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকি। অর্থাৎ আমার সামাজিক পরিমণ্ডলই আমার চিত্রনাট্য রচনার শিক্ষক। তথাপি চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে একজন চলচ্চিত্রকারকেই আমি আদর্শস্থানীয় বলে মনে করি, বলাবাহুল্য তিনি সত্যজিৎ রায়। এবং এই বাংলার অন্যান্য চলচ্চিত্রকারদের চিত্রনাট্য কখনও সখনও পাঠ করে থাকি। সত্যি বলতে কি চিত্রনাট্য লেখার সময় সেগুলো পরিহার করার প্রয়োজনে, বিশেষত সেই চিত্রনাট্যগুলি যেখানে চিত্রনাট্যকার পরিচালক নন অন্য কেউ, কারণ আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না পরিচালক তাঁর ছবির চিত্রনাট্য অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেন কোন যুক্তিতে।

নয়নতারা আমাদের এই প্রদেশের এক বিশেষ শিল্পী সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত। নাট্যমোদী বাঙালি হিসেবে আমাদের জাতির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। এক-ধরনের প্রফেশনাল মহিলা আছেন যাঁরা অফিস ক্লাব, বোর্ড থিয়েটার, গ্রুপ থিয়েটার, ওয়ান ওয়াল-এ ভাড়াটিয়া অভিনেত্রী হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। একদিন তাঁরা অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন নিয়ে এই অভিনয়-শিল্পীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের ভাগ্যে যৎসামান্য খ্যাতি বা স্বীকৃতি জুটে থাকে। তাঁদের শিল্পী বা সংসার জীবন কোনওটাই সম্পন্নভাবে যাপন করা হয়ে ওঠে না। অথচ আমাদের মঞ্চাভিনয়ের ঐতিহ্যের তাঁরাও অংশভাগী। নয়নতারা ছবিতে তেমনই এক মহিলা শিল্পীর সাফল্য অসাফল্য ভাগ্য-বিড়ম্বনার আলেখ্য যথাসম্ভব আন্তরিক ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। বাংলা নাট্যমঞ্চের দ্বিশতবর্ষে এটাই আমার বিনীত একটি শ্রদ্ধার্ঘ।

রাজা মিত্র

দৃশ্য ১

চলমান একটি ভ্যান গাড়ি। ভোর বেলা। ভ্যান-এর মাথায় ট্রলি, প্ল্যাংক, রিফ্লেকটার ইত্যাদি গাদা করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। মনে হয় আউটডোর স্যুটিং শেষ করে একটি ফিল্ম ইউনিট ফিরছে।

ভ্যানের ভিতরে সারিবদ্ধভাবে দুধারে বেশ কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ বসে আছে। ওদের মুখে পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি। কেউ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে ঢুলছে। এরা ফিল্ম-এর ছোটখাট অভিনেতার দল। গাড়ির ড্রাইভারের পাশে চোয়াড়ে চেহারার একটি লোক সিগারেট টানছে।

ভ্যানের জানলা দিয়ে অপসৃয়মান বাইরের দৃশ্য দেখে বোঝা যায়—কলকাতার কাছেই মফঃস্বল অঞ্চল। ভ্যান কলকাতার দিকে ফিরছে।

ভ্যানের ভিতরে সারিবদ্ধ স্ত্রী-পুরুষেরা একে একে দৃশ্যমান হয়। তাদের মধ্যে একজন নারী বসে আছেন। এঁরও মুখে ক্লান্তি ও পরিশ্রমের সাথে কেমন যেন রুগ্নতার ছাপ। ভ্যানের জানলায় মাথা রেখে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। বয়েস ৫৮/৫৯, বহুদিন প্রসাধন করা এবং তোলার ফলে মুখের চামড়া কর্কশ ও রুক্ষ। মহিলা বয়স্কা কিন্তু এখনও এই অবস্থাতেও যৌবনের রং ও সৌন্দর্যের রেশ রয়ে গেছে।

চলমান ভ্যান, ভ্যান-এর বাইরের অপসৃয়মান দৃশ্যাবলী। ভিতরের মানুষজন সব মিলিয়ে একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া।

দৃশ্য ২

টালিগঞ্জ অঞ্চলের একটি স্টুডিওর চত্বর। সকাল ৯টা সাড়ে ৯টা। চত্বরের একধারে ঐ আউটডোর স্যুটিং-এর ভ্যানটা দাঁড়িয়ে। ভ্যানের মাথা থেকে প্রোডাকশনের লোকেরা স্যুটিং-এর মালপত্র নামাচ্ছে। চত্বরের ভেতর অভিনেতারা একক বা দলবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। একটি ক্যানটিন বয় মাটির ভাঁড় ও কেৎলী হাতে সকলকে চা বিতরণ করে চলেছে।

এই ভীড় থেকে একটু দূরে ঐ মহিলা একটা বারান্দার ধারে একা দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর কাঁধে একটা কিট্‌ব্যাগ।

দৃশ্য ৩

স্টুডিওর একটা ঘর। ঘরের ভেতর নড়বড়ে টেবিল চেয়ার। চতুর্দিকে স্যুটিং-এর নানান মালপত্তর ডাঁই করে রাখা। অনেকগুলো ষ্টিলের ট্রাংক, নানান আসবাব-পত্র, বাতিল ক্ল্যাপষ্টিক, বইয়ের র‍্যাক ইত্যাদি।

ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটি বিল ভাউচার ইত্যাদি নিয়ে বসে আছে। 'একট্টা' অভিনেতারা একে একে করে ঢুকছে এবং পেমেণ্ট নিচ্ছে। বলা বাহুল্য পেমেণ্ট সংক্রান্ত কথা কাটাকাটিও চলছে। যেমন—

: ফেরার গাড়ি ভাড়া পাঁচ টাকা? আমি সেই বরানগর থেকে আসছি।

: তিন সিফট্-এ কাজ হল। দু সিফটের টাকা নেব না। একি কাণ্ড কারবার—

: ছিটের ব্লাউজ করিয়ে আনতে বললেন, তার টাকাটা তো দেবেন—ইত্যাদি। এরই মধ্যে প্রোডাকশনের লোকটি গলা তুলে বলে—নয়ন দিদিকে ডাকো।

একটি লোক গলা বাড়িয়ে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ মহিলা বা নয়নতারাকে ডাকে।

: দিদি, এদিকে একবার আসুন।

নয়নতারা ঘরে ঢোকেন। প্রোডাকশনের লোকটি ওঁর দিকে একটা ভাউচার এগিয়ে দেয়। নয়নতারা সই করেন। দু-তিনটে একশো টাকার নোট প্রোডাকশনের লোকটি গুনতে থাকে—

লোকটি : পনেরো টাকা কনভেন্স দিলাম দিদি। আপনাকে তো সেই নর্থ-এ ফিরতে হবে।

নয়নতারা মৃদু হাসেন। হাত বাড়িয়ে টাকা নেন। ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখেন।

(কাট্)

দৃশ্য ৪

উত্তর কলকাতার পুরোনো ঘিঞ্জি একটা অঞ্চল। পুরোনো জীর্ণ একটা বাড়ির একতলা। দেওয়ালে বহুকাল রং হয়নি। পলেস্তরা মাঝে-মাঝে খসে গেছে। সামনে এক চিলতে উঠোন, শেওলা ধরা চৌবাচ্চা। ভারি পুরোনো বিবর্ণ দরজা-জানলা।

উঠোনের চৌবাচ্চায় স্নান সেরে একটি যুবক গায়ে গামছা দিয়ে উঠোন থেকে দুধাপ উঁচুতে রোয়াকে ওঠে। রোয়াকের দুদিকে দুটি ঘর। একটি ঘরের দরজায় তালা বন্ধ। যুবক রোয়াক দিয়ে তালাবন্ধ ঘর অতিক্রম করে অন্য ঘরের ভেতর ঢুকে যায়।

যুবকের বয়স ২৬।২৭। ছিপছিপে লম্বা, গাল ভাঙা, মাথায় লম্বা রুক্ষ চুল।

দৃশ্য ৫

ঘরের ভেতর ঐ যুবক। ঘরে একটি তক্তাপোষ জাতীয় খাট। একটা টেবিল—

টেবিলের ওপর কিছু সাধারণ বইপত্তর। বিল-ভাউচার প্যাড, কয়েকটা নতুন-পুরোনো অডিও ক্যাসেট-একটা দিশী ক্যাসেট প্লেয়ার।

যুবক জানলার ধারে দাঁড়িয়ে জানলার গরাদে একটা ছোট হাত আয়না লাগিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। গুন গুন করে গান গাইছে।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। যুবক উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

দৃশ্য ৬

উঠোনের ধারে সদর দরজা। কড়া বেজে ওঠে আবার। তারপর ভেজানো ভারী দরজা কেউ বাইরের থেকে ধীরে ধীরে ঠেলে খুলতে থাকে।

যুবক নিজের ঘর থেকে রোয়াকে এসে দাঁড়ায়। বিস্মিত ভাবে লক্ষ্য করে দরজা ঠেলে বাইরে থেকে একটি অল্পবয়েসী মেয়ের মুখ ভেতরে উঁকি মারছে।

মেয়েটির মুখ ভিতরে এদিক-ওদিক তাকায়। রোয়াকে দাঁড়ানো যুবকের দিকে চোখ পড়ে। মেয়েটি এবার দরজা ঠেলে উঠোনে এসে দাঁড়ায়।

মেয়েটি : এটা কি নয়নতারা দত্তের বাড়ি?

কুমার সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

মেয়েটি : আমি, মানে আমি চুঁচড়ো থেকে আসছি।

কুমার : ও, তা আসুন।

মেয়েটি উঠোন পেরিয়ে রোয়াকের কাছে চলে আসে।

কুমার : আপনি কি নয়নতারা মানে ওঁর কাছে এসেছেন? উনি তো নেই।

মেয়েটি : না, না। আমি আপনার কাছেই এসেছি। আপনি তো কুমারবাবু। ইয়ে, একগ্লাস জল হবে?

কুমার মেয়েটির ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকায়। মাথা নেড়ে দুটো ঘরের মাঝখানে এক চিল্‌তে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকায়। একটা ছোট রুমাল বার করে মুখের ঘাম মোছে। কুমার রান্নাঘর থেকে এক গ্লাস জল এনে মেয়েটিকে দেয়। ঢক ঢক করে জলটা খেয়ে নেয় মেয়েটি। কুমার ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে একটা পাঞ্জাবী চড়িয়ে দরজার কাছে আসে।

কুমার : ভেতরে আসুন।

দৃশ্য ৭

কুমারের ঘরে ঢুকে কিঞ্চিৎ আড়ষ্টভাবে মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকায়। ঘরের একমাত্র চেয়ার এগিয়ে দেয় কুমার। নিজে তক্তাপোষে বসে।

মেয়েটি : আপনি তো লালুদাকে চেনেন।

কুমার : লালু মানে, নব কিষেণ স্ট্রীটের লালু মুখার্জি ?
মেয়েটি : হ্যাঁ। লালুদা আমাদের ওখানে যাতায়াত করে—
কুমার : লালু আপনাকে পাঠিয়েছে ?
মেয়েটি : ঠিক পাঠায় নি। দেখা করতে বলেছিলো। আমার নাম রেখা। সবাই অবশ্যি আমাকে ময়ী বলে ডাকে।
কুমার : ময়ী ?
মেয়েটি : আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি তো ছেলেবেলা, তাই, মরা থেকে ময়ী।
কুমার : ও।
মেয়েটির এই কথায় কিঞ্চিৎ কৌতুক বোধ করে কুমার।
রেখা : আচ্ছা, উনি কোথায়, আপনার মা ?
কুমার : নেই, বাইরে গেছে।
রেখা : বাইরে, স্যাটিং-এ ?
কুমার : হ্যাঁ। আমার মাকে আপনি চেনেন ?
রেখা : ওঁকে তো অনেকেই চেনে। সেদিনই একটা সিরিয়ালে উনি করলেন—
কুমার : ও। আচ্ছা কি ব্যাপার বলুন তো ?
রেখা : হ্যাঁ। এ পাড়ার একটা ছেলে—নকুল। আমাদের ওখানে যেতো। আমার মাকে বুঝিয়ে কি একটা শেয়ার কিনিয়ে দেবে বলে ক হাজার টাকা নিয়েছে।
কুমার : ক হাজার ?
রেখা : আট হাজার। টাকা তো নিয়েছেই, আরও খারাপ কাজ করেছে।
রেখা এক মুহূর্ত ইতঃস্তত করে। কুমার তাকায়।
রেখা : আমার বোনের সঙ্গে ওর ভাব হয়েছিলো। বলেছিলো বিয়ে করবে—তারপর আর ওমুখো হচ্ছে না।
কুমার : নকুল খুব বাজে ছেলে। আপনারা ওর পাল্লায় পড়লেন !
রেখা : আমি না। মা আর বোন। আসলে আমার মা খুব ভালোমানুষ। মাসীমা মাসীমা বলে ভুলিয়েছিলো।
কুমার মেয়েটির থেকে চোখ সরিয়ে নেয়—
কুমার : কিন্তু আমি কি করতে পারি ?
মেয়েটি কি বলবে বুঝতে পারে না।
রেখা : লালুদা বলেছিলো আপনাকে বলতে। আপনি নাকি কিছু করলেও করতে পারেন। আমাদের বাবা নেই তো। খুব কষ্টের জমানো টাকা।
কুমার চুপ করে বসে থাকে। কি যেন ভাবে—
কুমার : আচ্ছা দেখি। আমি এখন বেরোবো। দোকানে যেতে হবে।

রেখা : আপনার দোকানে আমি গিয়েছিলাম। ঐ ভদ্রলোক—
কুমার : ফটিক। ফটিকদা।
রেখা : হ্যাঁ, উনিই তো এই বাড়ির ঠিকানা দিলেন।
মেয়েটিও উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটির পেছন পেছন কুমার বাইরে বেড়িয়ে আসে।

দৃশ্য ৮

বাইরের রোয়াকে বেড়িয়ে আসে দুজনে। রেখা তালাবন্ধ ঘরের দিকে তাকায়।
রেখা : আপনার মা—উনি এই ঘরে থাকেন ?
কুমার মাথা নেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। রেখা নয়নতারার একটা পাল্লা খোলা জানলা দিয়ে একমুহূর্ত ঘরের ভেতর তাকায়। আধো অন্ধকার ঘর। দেওয়ালে শুধু একটা আয়না নজরে পড়ে।
দরজার কাছ থেকে কুমার রেখার এই কৌতূহল লক্ষ্য করে। রেখা মুখ ঘোরালে সেও মুখ ঘুরিয়ে নেয়।
সিঁড়ির ধাপ দিয়ে রেখা উঠোনে নেমে আসে।

(কাট্)

দৃশ্য ৯

উত্তর কলকাতার একটা গলি দিয়ে নয়নতারা রিক্সা করে ফিরছেন। পায়ের কাছে কিট্ ব্যাগটা রাখা।

দৃশ্য ১০

উত্তর কলকাতার একটা রাস্তা ও গলির মুখে অডিও ক্যাসেটের দোকান। উঁচু গ্রামে গান বাজছে। দোকানে মোটা সোটা চশমা পরা ফটিক বসে আছে। ক্যাসেট ছাড়াও দোকানে দু-চারটে ছোট দিশী ট্রানজিস্টর সাজানো। কুমার এসে দোকানের সামনে দাঁড়ায়। একটু দূরে রেখা মেয়েটিও কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।
কুমার : কিরে ফটিকদা। একটু দেরি হয়ে গেল।
ফটিক একটু দূরে দাঁড়ানো রেখার দিকে তাকায়—
ফটিক : হুঁ।
কুমার : কিছু হল ?
ফটিক : ধুস্। উল্টে যে ট্রানজিস্টারটা নিয়েছিলো ঐ নস্কর বাগানের পার্টি, কমপ্লেন করে গেল নবটা ঘুরছে না।
কুমার : গ্লোব কোম্পানির সাপ্লাই আর নেব না। চা খাবি।

কুমার উল্টো দিকের একটা ফুটপাতের চায়ের দোকানীকে হাঁক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনটে আঙুল তুলে দেখায়। রেখা দোকানের দিকে একটু এগিয়ে আসে।

রেখা : আমি তাহলে এবার যাই।

কুমার : দাঁড়ান একটু চা খেয়ে যান। বাড়িতে তো সুবিধে নেই।

ফটিক এর দিকে তাকায় কুমার—

কুমার : এই যে এর নাম—

ফটিক : জানি, একটু আগে তো দোকানে এসেছিলেন। আপনি আর এর আগেও তো একদিন এসেছিলেন তাই না ?

রেখা মাথা নাড়ে, কুমার-এর দিকে তাকায়।

রেখা : হ্যাঁ, আমি আর একদিন এসেছিলাম। আপনি ছিলেন না।

কুমার : ও।

রেখা চারিদিকে তাকায়।

রেখা : আপনাদের এখানে টেপরেকর্ডার সারানো হয় ?

ফটিক : না, বিক্রি হয়। দিশী মাল।

রেখা : আমাদের একটা ছিল, খারাপ হয়ে পড়ে আছে—

ফটিক : নিয়ে আসবেন চেনা লোককে দিয়ে সারিয়ে দেবো—

চায়ের দোকানের ছোকরা তিন গ্লাস চা নিয়ে কাউন্টারে নামিয়ে রাখে।

(কাট্)

দৃশ্য ১১

কুমার ও নয়নতারার বাসা বাড়ি। ভেজানো দরজা ঠেলে শৈলবাবু ঢোকেন। শৈলবাবুর বয়েস ৬০। ৬২। কালো বেঁটেখাটো চেহারা। মাথায় স্বল্প চুল। পরনে পরিষ্কার কাচানো ধুতি-পাঞ্জাবী।

উঠোনে দাঁড়িয়ে শৈলবাবু গলা তুলে ডাকেন—

: নয়ন দিদি আছেন নাকি, কুমার—

নয়নতারার ঘরের দরজার দিকে তাকান। ভেতর থেকে নয়নতারার গলা ভেসে আসে।

: আসুন, শৈলবাবু—ভেতরে আসুন।

(কাট্)

দৃশ্য ১২

নয়নতারার ঘর। ঘরে সামান্য কিছু ভারী পুরানো ধরনের আসবাব। একটা খাট। পুরোনো ডেস্ক, গ্রামাফোন একটা। দেওয়ালে থিয়েটারের সাজঘরে

ব্যবহৃত একটা ভালো আয়না। নয়নতারা শুয়ে ছিলেন। শৈলবাবুর সাড়া পেয়ে উঠে বসেন। গায়ের কাপড় ঠিকঠাক করেন। শৈলবাবু দরজায় এসে দাঁড়ান।

শৈলবাবু : আজই ফিরলেন ?

নয়নতারা মাথা নাড়েন।

শৈলবাবু : বর্ধমানের ওদিকে স্যুটিং ছিল না, কেমন হল কাজকর্ম ?

শৈলবাবু ঘরের একধারে একটা ডিভান মত বসার জায়গায় এসে বসেন।

নয়নতারা : ঐ হল আর কি। পি. ডবলু. ডির বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করেছিলো।

শৈলবাবু নয়নতারার দিকে তাকান।

শৈলবাবু : শরীর ঠিক ছিল, কেমন যেন শুকনো মত লাগছে—

নয়নতারা বিছানা থেকে নামেন।

নয়নতারা : না শৈলবাবু। শরীরটা ঠিক ভালো যাচ্ছে না। রাস্তাও ভাল না। গাড়িতে কি ঝাঁকুনি। সারাক্ষণ গা গুলোচ্ছে। একটু চা করি।

নয়নতারা ঘর থেকে বেড়িয়ে দু ঘরের মাঝখানের এক চিলতে রান্নাঘরের দিকে চলে যান। শৈলবাবু বসে থাকেন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই বার করেন।

ঘরের দরজা দিয়ে দেখা যায় নয়নতারা একটা কেৎলী নিয়ে উঠোনের কলে জল ভরছেন।

শৈলবাবু : পেমেণ্ট করেছে ?

উঠোন থেকে নয়নতারা উত্তর দেন। —হ্যাঁ, তা করেছে।

শৈলবাবু : ভালো। এই সিনেমার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না। পেমেণ্ট নিয়ে খুব ঘোরায় শুনেছি—

রান্নাঘর থেকে নয়নতারা গজ গজ করেন—

: দেশলাইটা যে কোথায় গেল। ঐ কুমার নেবে, ঠিক জায়গায় রাখবে না।

এ ঘরে আসেন নয়নতারা। শৈলবাবু নিজের দেশলাই এগিয়ে দেন—এই নিন্।

দেশলাই নিয়ে নয়নতারা আবার চলে যান। শৈলবাবু ঘরের চতুর্দিকে তাকান। দেওয়ালে একটা দাগ। অনেকদিন একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি টাঙানো ছিল। খুলে ফেলা হয়েছে-এ রকম একটা দাগ।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে নয়নতারা ঘরে আসেন। দেশলাই ফেরৎ দেন।

শৈলবাবু : ঐ ছবিটা খুলে ফেল্লেন ?

নয়নতারা দেওয়ালের দিকে তাকান।

নয়নতারা : হুঁ, দেওয়ালে ড্যাম্প। নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। রাখা আছে ঐ তাকের ওপর—

শৈলবাবু সিগারেট ধরাতে থাকেন।

শৈলবাবু : মানিক দত্ত নিজেই তুলেছিলো। বোর্ণ এণ্ড সেফার্ড থেকে এনলার্জ করিয়ে আনা।

সদর দরজায় শব্দ হয়। কাজের মহিলা হারামণি ঢোকে।

নয়নতারা দরজার দিকে এগিয়ে যান।

নয়নতারা : দু দিন আসিস্ নি কেন, আমি ছিলাম না অমনি কামাই দিলি। রান্নাঘরে এঁটোর পাঁজা—

হারামণি দ্রুত পায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। বাসনের পাঁজা এনে উঠোনে নামায়।

হারামণি : কি করবো, মেয়ের শশুরবাড়ির লোক এসেছিলো। কাল তো এসে ফিরে গেছি। দরজায় তালা।

নয়নতারা : এ নিয়ে এ মাসে কদিন কামাই করলি? মাইনে নেওয়ার সময় তো কাটান দেওয়ার কথা বলিস্ না—

হারামণি উত্তর না দিয়ে ঘস ঘস করে বাসন মাজতে থাকে।

শৈলবাবু : একটা কাজের ব্যাপার ছিলো।

নয়নতারা তাকান—

শৈলবাবু : অফিস ক্লাব। ভালো কোম্পানি।

উঠোনে একটা বাসন পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়।

নয়নতারা : আঃ একটু আস্তে নাড়াচাড়া কর, তোদের একটু মায়াদয়া নেই—

শৈলবাবুর দিকে তাকান নয়নতারা—

নয়নতারা : কত দেবে?

শৈলবাবু : আটশোর কথা বলেছি। ঝামেলা অবিশ্যি বেশি নেই, দুটো অফিসের দালানে, একটা স্টেজে রিহার্সাল।

নয়নতারা : কি নাটক?

শৈলবাবু : মডার্ণ। ঐ যে মনোজ মিত্তিরের—অলকানন্দার পুত্রকন্যা। এ প্লে তো আপনার একবার করা—

নয়নতারা : হুঁ।

রান্নাঘর থেকে জল ফোটার শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা যায়। উঠোন থেকে হারামণি বলে ওঠে—ও মা, জল তো ফুটে উঠলো।

নয়নতারা রান্নাঘরের দিকে যেতে থাকেন—

নয়ন : হ্যাঁ, যাই।

নয়নতারা বেড়িয়ে যান। শৈলবাবু বসে থাকেন। উঠোনে বাসনমাজা জল ঢালার শব্দ শোনা যায়। রান্নাঘরে চা তৈরির টুং টাং শব্দ।

হঠাৎ নয়নতারা রান্নাঘর থেকে চা করতে করতে অলকানন্দা নাটকের সংলাপ

বলতে শুরু করেন—

: আমিও তাই চেয়েছিলাম। ওরা মানুষের মত মানুষ হবে। ছেলেমেয়েরা মাথা তুলে দাঁড়াবে। কিন্তু তোমার জামাইবাবুর এই হাল হল। ব্যবসাপত্র ছত্রাখান হয়ে গেল। তখন যে মানসীকে ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচি। আর লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটারও এমন বিয়ের সখ হল—

এ ঘরে শৈলবাবু প্রথমে বিস্মিত হন। তারপর বুঝতে পারেন নাটকের সংলাপ। মৃদু হাসেন শৈলবাবু। দু কাপ চা হাতে নয়নতারা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ান।

নয়নতারা : এর পর বাদলের ডায়ালগ—এখন আর কেঁদে কি হবে···

শৈলবাবু : সত্যি, মাদার কারেকটারের আপনার জুড়ি নেই।

নয়নতারা এক কাপ চা শৈলবাবুর হাতে দেন। উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন—

: হারামণি, রান্নাঘরে কেৎলীতে চা আছে। তোর গ্লাসে ঢেলে নে।

খাটের ধারে এসে দাঁড়ান নয়নতারা।

নয়নতারা : শেষের দিকে আবার আছে···আলো, হ্যাঁ আলো। কি বলছো তোমরা? একটু সিঁদুর পরবো তাও ফি অন্ধকারে আন্দাজে পরতে হবে। তোমাদের যাতে অসুবিধে না হয় এই আলোটা জেলে নিয়েছি—তাতেও?···

(কাট্)

দৃশ্য ১৩

(এই সঙ্গে দৃশ্যান্তর ঘটে যায়। একটা অফিসের সেকশন্। অফিসের টেবিল চেয়ারগুলো একটার পর একটা চাপিয়ে রির্হাসালের জায়গা করে দেওয়া। কয়েকজন নারী-পুরুষ বসে আছে। নয়নতারা অলকানন্দার নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছেন। অলকানন্দার চরিত্রের বাকী সংলাপটুকু তিনি এখানে শেষ করছেন।

: ···যাচ্ছি। বাইরে ছন্নছাড়ার মত বেরুবো নাকি। নিজের আর কি, ঝুপ করে গঙ্গায় ডুব দিয়ে এই সংসারের বাইরে চলে গেছি। যতই সিঁদুর পরি চুল বাঁধি চোখেও পড়বে না। দেখবেও না কেউ।

অফিসেরই একজন সম্ভবতঃ অফিসার যিনি পরিচালকও বটে, তিনি বলে ওঠেন—

: ঠিক, এইখানে কলিংবেল শোনা যাবে।

তারপর পরিচালক এগিয়ে আসেন—

: আপনাকে আর কি বলবো। লাস্ট ডায়ালগের কিউটা যদি আর একবার ধরিয়ে দেন। নতুন ছেলে তো—

অন্যদিকে তাকান পরিচালক—কি হে সুশান্ত কিউটা ধরো।

একটি যুবক এক পা এগিয়ে আসে।

যুবক : সত্যি দিদি, আসলে আপনার ডায়ালগ শুনতে শুনতে এত অ্যাবজর্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আর একবার বলবেন।

নয়নতারা মৃদু হেসে আবার বলতে শুরু করেন।

পরিচালক বসে থাকা মহিলাকে ইশারায় উঠে আসতে বলেন। মহিলা উঠে আসেন। ইতিমধ্যে ঐ যুবক তার সংলাপ বলে—

: ধুৎ এই জন্যে কারুর বাড়িতে শুতে ভাল্লাগে না। খুশিমত শুতে দেয়। খুশি মত তুলে দেয়।

উঠে আসা মহিলা সংলাপ বলে—

: আমার চাবি : আমার চাবিটা—

পরিচালক : চাবিটা ছুঁড়ে দিলেন উনি।

মহিলা : বা বা : রেগে একেবারে তুবরি। কি করবো বলো। ঐ শৌনিকটার জন্যেই এরকম হল। ব্যালে দেখে বেরুচ্ছি কোত্থেকে এসে আমার পথ জুড়ে দাঁড়ালো। গাড়িতে তুলে নিল জোর করে।

পরিচালক : ব্রিদটা ঠিক মত নিতে শিখুন। উনি বললেন, বুঝলেন কোথায় ব্রিদ হল? এই জন্যেই তো টেইল ড্রপ হচ্ছে···

(মিক্স)

দৃশ্য ১৪

কুমার-এর ক্যাসেটের দোকান। সন্ধেবেলা। ফটিক দোকানে বসে আছে। কুমারকে দেখা যায় দোকানের দিকে এগিয়ে আসছে। ওর হাতে কয়েকটা টানজিসটর-এর খালি ক্যাবিনেট।

ফটিক : তোর এত দেরি হল?

কুমার : আর বলিস কেন, গো স্ট্রিটে জ্যাম্···

ফটিক : তোর জন্যে ঐ রজত এসে আছে অনেকক্ষণ।

ফটিক উল্টো দিকের ফুটপাতে চায়ের দোকানের দিকে নির্দেশ করে। কুমার হাতের মালগুলো নামিয়ে রাখে। রাস্তা অতিক্রম করে ওপারে যায় কুমার।

চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে রজত উদ্বিগ্নভাবে বসে আছে। রজতের বয়স ২৬।২৭। ফিটফাট স্পোর্টিসম্যানদের মত ফীচার। ঘন ঘন সিগারেট টানছে সে।

রজত : তোর জন্যে বসে আছি অনেকক্ষণ।

এদিক-ওদিক তাকায় রজত।

রজত : বোস্। শোন সোহাগকে মনে আছে তো তোর? ওকে শ্যামবাজারের একটা ক্লিনিকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

কুমার জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে রজতের পাশে বসে।

রজত : মাইরী, একটা প্রোবলেম হয়ে গেছে। আরে বুঝলি না। মানে, মেয়েটা কনসিভ করে ফেলেছিলো। আজকাল তো সব লিগালাইজ—জানিস তো। তাই ক্লিয়ার করিয়ে আনলাম।

কুমার : তো কি?

রজত : মানে একটু রেস্ট নিলেই মেয়েটা ঠিক হয়ে যাবে। একটু উইক ফিল করছে।

রজত গলা নামায়—

: মাসীমা তো শুনলাম বাইরে। আজকের রাতটা তোর ওখানে একটু থাকতে দিবি মাইরী। জাস্ট আজকের রাতটা।

কুমার : তুই ঝামেলা বাধাবি আর ঝঞ্ঝাট পোহাবো আমি। নো। নেভার।

কুমারের হাত চেপে ধরে রজত—

রজত : প্লীজ। ফর ফ্রেণ্ডস্ সেক। ও শুধু ঘরে শুয়ে রেস্ট নেবে। আমি বাইরে বসে থাকবো। সকাল বেলাই ক্লিয়ার হয়ে যাবো।

কুমার চিন্তিত মুখে বসে থাকে।

কুমার : মা এসব একদম পছন্দ করে না। জানতে পারছে। তুই তো মাকে জানিস্—

রজত : মাসীমা কলকাতায় নেই বলেই তো বলছি। কাকপক্ষীও টের পাবে না। রাত করে ঢুকবো। ভোর হতে না হতে কেটে পড়বো।

কুমার এক মুহূর্ত ভাবে।

কুমার : ঠিক আছে। একটা কণ্ডিশান আছে।

রজত তাকায়—

কুমার : তোদের বাড়ির একতলায় একটা খালি খুপরী আছে। ওটা আমাকে একটু সুবিধে করে দিয়ে দিবি। এই দোকানটা শিফট্ করবো।

রজত : হুঁ। আমার বাপটাকে তো জানিস। এক নম্বরের মক্ষীচুষ পার্টি। আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে যাবে।

কুমার : প্রমিস্?

রজত : প্রমিস্।

(কাট্)

দৃশ্য ১৫

বিকেল বেলা। কোন মফঃস্বলে শহরের একটা স্কুল বাড়ি। স্কুল বাড়ির সামনে একটা বড় বাস দাঁড়িয়ে।

দৃশ্য ১৬

স্কুল বাড়ির ভেতরে একটা ঘর। ঘরের একধারে সারি সারি কিটব্যাগ স্যুটকেস পোঁটলা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা। মেয়েদের অস্থায়ী একটা সাজঘর। ঘরের অন্য-প্রান্তে অসংখ্য অভিনেত্রী নানান কাজে ব্যস্ত। আসন্ন অভিনয়ের প্রস্তুতি চলছে। কেউ জামাকাপড় পরছে, কেউ শেষ মুহূর্তের মেক আপ ঠিক করছে। কেউ পরচুলায় সেপটিপিন লাগাচ্ছে। ব্লাউজের হাতা সেলাই করে ছোট করছে কেউ। লোহার ইস্ত্রি গরম করে সতরঞ্চির ওপর শাড়ি ইস্ত্রি করছে। ইত্যাদি।

এরই মধ্যে নয়নতারাকে দেখা যায় একধারে বসে চুপচাপ ফুলস্কেপ কাগজে লেখা নিজের পার্ট বিড় বিড় করে পড়ছেন। শুধু ব্রা পরা একজন মহিলা ব্লাউজ সেলাই করতে করতে নয়নতারার উদ্দেশ্যে বলে ওঠে—

: দিদি। নিজে বেশ তৈরি হয়ে নিচ্ছো। আমার এই শালার ব্লাউজ কনুই ছড়িয়ে হাতা কব্জী অবধি ঝুলে পড়ছে—ফ্রিল লাগালে বেশ মেয়েদের জামা হয়ে যেত। ড্রেসার ব্যাটা পুঁটুলি ফেলে রেখে কেটে পড়েছে—

নয়নতারা : তুমি বলো না আমার সঙ্গে—

মহিলা মাথা নাড়ে। নয়নতারা হাতের কাগজ উল্টোতে থাকেন।

নয়নতারা : তোমার সঙ্গে আমার শুধু থার্ড সীন। এই যে—নাও বলো—

নয়নতারা 'বিন্দুর ছেলে' নাটক থেকে নিজের সংলাপ বলেন। সেলাই করতে করতেই ঐ ব্রা পরা মহিলা ঐ চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে নিজের সংলাপ বলে এবং দুজনে রিহার্সাল করতে থাকেন।

(মিক্স)

দৃশ্য ১৭

নয়নতারার বাসা বাড়ি। রাত্রিবেলা। কুমারের ঘর। কুমার ও রজত বসে আছে। বাইরে রাস্তায় ট্রাফিকের ক্ষীয়মান শব্দ শোনা যাচ্ছে। কলতলায় কেউ স্নান করছে, শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রজত : মাসীমা কবে ফিরবে রে ?

কুমার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলো।

কুমার : জানি না। আমাকে তো বলে যায় না কিছু।

রজত : নিজের ঘরে তালা মেরে যায় ?

কুমার : হুঁ। না দিলেও ওঘরে যাওয়া যেত না। মা এসবের গন্ধ নয়। আরও একটা ঝঞ্ঝাট্ আছে।

রজত তাকায়, কুমার ওপরের দিকে আঙুল দেখায়।

রজত : ঐ বুড্ডা ? তোর বাড়িঅলা ?

কুমার : বুড়ো একা থাকে। কোনও ফল্ট পেলেই তিলকে তাল করবে।

বাইরে কলতলার দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। একটি মেয়ে শায়া ব্লাউজের ওপর কাপড় জড়িয়ে উঠোন পেরিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। মেয়েটি—ফর্সা। চোখের তলায় এ্যাবর্সনের ক্লান্তি। মেয়েটিকে দেখে কুমার বাইরের দিকে চোখ সরিয়ে নেয়।

রজত : এখন একটু ভাল লাগছে শরীর ?

মেয়েটি উত্তর দেয় না—

রজত : একটু জল দিয়ে ব্রাণ্ডি খাবে নাকি ? ঘুমটাও ভাল হবে।

কুমার অস্বোয়াস্তি বোধ করে।

কুমার : আমি বাইরে আছি।

কুমার টেবিলের ওপর রাখা রজতের সিগারেট প্যাকেট নিয়ে বাইরে চলে যায়।

(কাট্)

দৃশ্য ১৮

বাইরের রোয়াকে কুমার একটা চেয়ারে বসে আছে। ভেতরের ঘরে রজত আর ঐ মেয়েটি কথা কাটাকাটি করছে। কুমার নিস্পৃহ ভাবে বসে সিগারেট টানে। বাথরুমের চালে টুপটাপ বৃষ্টি পড়ার শব্দ হয়। উঠোনে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়া শুরু হয়। ওপরের দিকে তাকায় কুমার। আকাশে মেঘ ঘনাচ্ছে। কুমার উঠোনের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির পড়ার ক্রমবর্ধমানের দান এর দিকে তাকিয়ে থাকে।

(মিক্স)

দৃশ্য ১৯ (ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্স)

নয়নতারার বাড়ির উঠোনে বৃষ্টি পড়ছে। সদর দরজায় কেউ কড়া নাড়ে। ক্রমশ দরজায় ধাক্কা দেওয়া শুরু হয়। জড়ানো গলায় বাইরে থেকে কেউ ডাকে—

—নয়ন। বাবু-বাবু কুমার·····

কুমারের সদর ঘরের দরজায় বালক কুমার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সভয়ে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। এবার ছুটে গিয়ে দরজার খিল খুলে দেয়।

ঈষৎ মদ্যপ অবস্থায় মানিক দত্ত ঢোকে। মানিক দত্তের পরনে আদির পাঞ্জাবী পাজামা। একদিকের পকেট ঝুলে রয়েছে। তাতে তেল সোক করার দাগ। বালক কুমার ভয়ে ভয়ে বাবার দিকে তাকায়। পেছন পেছন রোয়াকে উঠে আসে।

মানিক দত্ত : তোর মা ফেরেনি ?

কুমার মাথা নাড়ে।

কুমার : ও, আজ তো তেনার ডবল শো।

ঘরে ভেতর ঢুকে যায় মানিক দত্ত।

দৃশ্য ২০

নয়নতারার ঘর। মানিক দত্ত ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবী খুলে আলনায় টাঙায়।

মানিক দত্ত : তখন থেকে তুই একা আছিস ?

কুমার : মাসী ছিলো তো ? চলে গেল।

মানিক দত্ত খাটে গিয়ে বসে—

মানিক দত্ত : সে শালীও হাফ গেরস্থ।

মানিক দত্ত সিগারেট ধরায়। আঙুল দিয়ে ঝোলানো পাঞ্জাবী দেখায়।

মানিক দত্ত : তোর খিদে পায়নি ? ঐ জামার প্যাকেটে রুটি তরকারি আছে। বার কর—

কুমার : মাসী রান্না করলো তো। রান্নাঘরে ঢাকা আছে—

মানিক দত্ত হঠাৎ রেগে যায়—

মানিক দত্ত : হুঁ। তোমার ঐ মা মাসীর রান্না আমি আর খাচ্ছি না। স্লো পয়জনিং করতে পারে।

তোর বাপ, বুঝলি কুমার স্টেজের এ্যাকটর-এর মত মরবে। পতন ও মৃত্যু। ধুকপুক করে খাবি খেয়ে মরার মধ্যে মানিক দত্ত নেই।

মানিক দত্ত আপন মনে বিড় বিড় করতে থাকে। কুমার বাইরের রোয়াকে বেড়িয়ে আসে। উঠোনে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে, ঘরের ভেতর নেশার ঝোঁকে মানিক দত্ত কথা বলে যায়।

—তবে মরার আগে আবার স্টেজ খুলবো এবং নাইট দেখাবো। আমি ৫০০ নাইট করিনি—এই মানিক দত্ত ?

দৃশ্য ২১ (ফ্ল্যাশব্যাক এণ্ডস্)

বাইরের রোয়াকে টুপটাপ বৃষ্টির মধ্যে কুমার বসে আছে। পর্দা সরিয়ে রজত বাইরে বেড়িয়ে আসে।

রজত : বৃষ্টি বাড়লে বারান্দায় বসে থাকা মুশকিল হবে। তুই এরকম ঝুম মেরে বসে আছিস্ কেন রে ?

কুমার উত্তর দেয় না।

রজত : তোকে আমাদের ঐ ঘরটা ম্যানেজ করে দেবো, বললাম তো।

কুমার : সত্যি, তাহলে খুব ভাল হয়। ফুটপাতের দোকানের প্রচুর ঝামেলা। ইউনিয়নের চাঁদা পুলিশকে পয়সা। তাছাড়া তোর দোকান আমি এমনি নেব না। এটা হ্যাণ্ডওভার করলে ৪।৫ হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

রজত : ঠিক আছে। ঠিক আছে।

বারান্দায় রাখা একটা বাক্সের ওপর বসে পড়ে রজত।

কুমার : আচ্ছা রজত তোরা যে এসব করিস এর মধ্যে প্রেমের কোনও ব্যাপার নেই না রে ?

রজত মাথা নীচু করে।

রজত : অত ভেবে দেখিনি। বোধহয় নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে আবার বলে ওঠে—

—কিংবা থাকলেও ঠিক ফিল করা হয়ে ওঠে না।

কুমার : হুঁ। আমিও বুঝতে পারি না। আমার মা-বাবা তাদের মধ্যে ঠিক কি ছিলো। ভালোবেসে বিয়ে করলো ঘর বাঁধলো অথচ···

রজত : তোর মাকে দেখলে এখনও বোঝা যায়, কি দারুণ চেহারা ছিল—

কুমার : মার ঘরে একটা ছবি আছে। ঝিন্দের বন্দী নাটকে রাণীর পোশাকে—

রজত : একদিন দেখাস তো ?

কুমার : মা গানও গাইতে পারে। এখন বয়েস নেই। প্র্যাকটিস করে না, গান গাইবার রোলও পায় না।

রজত : তাই ? তুই এতসব জানলি কি করে ? তুই তো—

কুমার : শৈলবাবু। শৈলবাবু মায়ের ফ্রেণ্ড, ফিলজফার গাইড। স্টেজের পুরোনো লোক। মায়ের নাম দিয়েছিলো ছোটতারা।

দুজনে চুপ করে বসে থাকে।

রজত : মেয়েটা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছে তো।

কুমার কথাটা যেন শুনেও শোনে না।

কুমার : মায়ের গান আমি শুনেছি জানিস্। ছোটবেলা একজন লোক আসতো থিয়েটার-এর গান তোলাতে—কি যেন ব্রজেন আড্ডি নাম। এই বাড়ি সেদিন খুব জমে উঠতো—

দৃশ্য ২২ (ফ্ল্যাশব্যাক)

হারমোনিয়ামের আওয়াজ। নয়নতারা ঘরের ভেতর খাটে নয়নতারা বসে। একজন তাঁকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে নাটকের গান তোলাচ্ছেন। প্লেটে কয়েক খিলি পান। মানিক দত্ত চেয়ারে বসে গান শুনছে। মাঝে-মাঝে দু-একটা মন্তব্য করছে। বালক কুমার মানিক দত্তের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। (ফ্ল্যাশব্যাক শেষ)

(কাট্)

দৃশ্য ২৩

বেলা-১২টা থেকে ১টা। নয়নতারা বিবর্ণ একটা ছাতা মাথায় দিয়ে গলি দিয়ে ফিরছেন।

দৃশ্য ২৪

নয়নতারার বাসা। কুমার নিজের ঘরে শুয়ে একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। দরজায় শব্দ শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। শুধু শব্দের মধ্যে দিয়ে সে বুঝতে পারে নয়নতারা বাসায় ঢুকলেন। নিজের ঘরে চাবি খুলে ঢুকলেন। ঘর থেকে আবার বেরিয়ে বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধুচ্ছেন। কুমার ম্যাগাজিন পড়তে থাকে।

নয়নতারা : কুমার।

কুমার চমকে দরজার দিকে তাকায়।

নয়ন : এগুলো বাথরুমে পড়েছিল।

হাতের মুঠো করে আনা কয়েকটা জিনিস তিনি কুমারের বিছানার উপর ছুঁড়ে দেন। দুটো কানের রিং আর একটা চুল বাঁধার ফিতে বিছানার ওপর ছড়িয়ে পড়ে। কুমার কাঠ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। নয়নতারা নিজের ঘরের দিকে চলে যান।

(কাট্)

দৃশ্য ২৫

কুমারের ক্যাসেটের দোকান। ফটিক দোকান খুলে উঁচু কুলুঙ্গীতে রাখা মাটির কয়েকটা দেব-দেবীর মূর্তিতে ধূপধুনো দিয়ে উঁচু একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে।

দুটি তরুণী মেয়ে এসে দোকানে দাঁড়ায়।

একটি মেয়ে : কুমারদা নেই ?

ফটিক উত্তর দেয় না। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে থাকে। মেয়েটি আবার বলে ওঠে--
লতা মঙ্গেশকরের গানগুলো তুলে দেবে বলেছিলো—

ফটিক এবার বিরক্ত হয়ে সেদিকে ফেরে।

ফটিক : ওয়েট। ওয়েট।

মেয়েদুটি আবার মুখ চাওয়া-চায়ি করে হাসে। ফটিক পুজোআর্চা শেষ করে টুল থেকে নেমে আসে। কুমার এসে দাঁড়ায়।

ফটিক : ঐ যে তোর ক্লায়ান্ট।

কুমার মেয়েদুটিকে দেখে—

কুমার : ও। ঐ গানগুলো বিকেলে করে দেবখন।

মেয়েদুটি : ঠিক তো ?

কুমার : হুঁ।

মেয়ে দুটি চলে যায়।

কুমার : কি রে তোর পুজোআর্চা কমপ্লিট ?

শোন্ ফটিকদা, তোর নকুল মনে আছে ?

ফটিক : কে। ফড়েপুকুরের ঐ লুচ্চা নকুল ?

কুমার : হ্যাঁ, ও এক ভদ্রমহিলার টাকা মেরেছে।

ফটিক : কোন ভদ্রমহিলা ?

কুমার : ঐ যে সেই মেয়েটা এসেছিলো না ? ঐ যে—

ফটিক : ঐ যে সরলরেখা না কি যেন।

কুমার : হ্যাঁ, ওর মায়ের। চুঁচড়োয় থাকে।

ফটিক : শালা এখন শহর ছেড়ে মফঃস্বল ধরেছে। এক নম্বরে চোর চিটিংবাজ। তুই একবার নকুলকে পেঁদিয়েছিলি না ?

কুমার : হ্যাঁ, মায়ের সম্বন্ধে খারাপ কমেন্ট করেছিলো—

ফটিক ক্যাসেটে একটি ভক্তিমূলক গানের ক্যাসেট চাপিয়ে রেকর্ডার অন করে দেয়।

ফটিক : তাই মেয়েটা তোকে ধরেছে ? দেখো আবার বেশি ফেঁসে যেও না।

কুমার ফটিকের দিকে তাকায়—

ফটিক : রেখা সরল কি বক্র বুঝে নিও আগে।

কুমার : কি বলতে চাস্ বল্ তো ?

ফটিক : মেয়েটা আবার এসেছিলো। এই যে—

ফটিক ভেতরের র‍্যাকে ক্যাসেটের ফাঁক থেকে একটা কার্ড বার করে।

ফটিক : এটা দিয়ে গেছে। তোকে দেওয়ার জন্যে।

কুমার কার্ডটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে।

কুমার ? এ তো একটা ফাংশনের কার্ড। কি সব নাটক টাটক ও হবে।

ফটিক : বলে গেছে অবিশ্যি করে যেতে। খুব নাকি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। এখন, তুমি বোঝো।

ফটিক অর্থপূর্ণভাবে কুমারের দিকে তাকায়। কুমার মৃদু হাসে।

(কাট্)

দৃশ্য ২৬

নয়নতারার বাসা। রোয়াকের ওপর টেবিল এর ওপর নয়নতারার ভর্তি কিট্ ব্যাগ রাখা। নয়নতারা ঘরের দরজায় তালা লাগাচ্ছেন। কুমার এসে উঠোনে দাঁড়ায়। দরজায় চাবি দিতে দিতে নয়নতারা কথা বলেন।

নয়নতারা : আমি বেরুচ্ছি। সন্ধেবেলা শো আছে। আরক শো করে আজিই বাইরে চলে যাবো—কল শোয়ে—

কুমার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, নয়নতারা কিট্ব্যাগ কাঁধে নেন। আবার বলেন—
—তোমার খাবার ঢাকা আছে।

কুমার : ফিরবে কবে ?

নয়নতারা : ঠিক নেই। দু-তিনদিন পরে হয়তো। হারামণি যখন আসবে তখন বাড়িতে থাকবে।

দরজার দিকে এগিয়ে যান নয়নতারা। দরজার কাছে গিয়ে বলেন।

—বাড়িতে মেয়েটেয়ে আসা আমি পছন্দ করি না। এমনিতেই লোকে আমাদের বদনাম দেয়—

নয়নতারা চলে যান। বাইরে থেকে দরজা ঠেলে দেন।

(কাট্)

দৃশ্য ২৭

আকাডেমী অফ্ ফাইন আর্টস-এর চত্বর। রেখা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কুমার একটা বাস থেকে নামে। এগিয়ে আসে।

রেখা : ভাবছিলাম আসবেন কিনা।

কুমার : কেন, আসাটা খুব দরকার বললেন ?

রেখা : হুঁ।

রেখা কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে—

রেখা : আসলে আমার চেনা এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে এই দুটো কার্ড চেয়ে রেখেছিলাম।

কুমার জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

রেখা : চলুন না। একটা থিয়েটার দেখবো। এতক্ষণে বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে।

(কাট্)

দৃশ্য ২৮

আকাডেমীর মঞ্চ। অলকানন্দার পুত্রকন্যা নাটক শুরু হচ্ছে। পর্দা উঠে গেছে। নেপথ্যে অলকানন্দা-রূপী নয়নতারার গলা শোনা যাচ্ছে।

নেপথ্যে : কিরে তুই বাইরে বসে ?

লালা : আমি আর কাজ করবো না।

অলকা : কেন কি হল ?

লালা : দিনরাত ঘ্যাচ্ ঘাচ্ ভাল্লাগে না। তোমার ঐ বরটা ইত্যাদি—

এবার বাইরের দরজা ঠেলে নয়নতারা ঢোকেন। মঞ্চের ধারে সেই পরিচালক নায়ক-রূপী চেয়ারে বসে আছে। নয়নতারা সেদিকে এগিয়ে যায়।

নয়নতারা : লালা, ভেতরে আয় বাবা। কি হয়েছে তোমার ? ছেলেটা মুখ গোমরা করে বাইরে বসে-চলে গেলে বুঝবে মজা···

(কাট্)

দৃশ্য ২৯

অডিটোরিয়ামের ভেতরে অন্ধকারে কুমার ও রেখা পাশাপাশি বসে আছে। মঞ্চে নয়নতারাকে চেনা মাত্র কুমার রেখার দিকে তাকায়। রেখা মুখ টিপে হাসে।

দৃশ্য ৩০

মঞ্চে নয়নতারা অলকানন্দার অভিনয় করে চলেন।

(কাট্)

দৃশ্য ৩১

ইন্টারভ্যালের বিরতিতে কুমার ও রেখা ক্যানটিনে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছে।

কুমার : আমাকে কিন্তু এবার যেতে হবে।

রেখা : সে কি। আমি এত কষ্ট করে কার্ড জোগাড় করলাম, উনার অভিনয় দেখবেন না ?

কুমার : ফটিকদা দোকানে আছে। আমি গেলে ঝাঁপ বন্ধ হবে।

রেখা চুপ করে থাকে।

রেখা : আমি ভেবেছিলাম, শো হয়ে গেলে আপনি মাসীমা আমি একসঙ্গে ফিরবো। উনাকে তো শুধু ছবি-টবিতে দেখেছি কখনও আলাপই হয়নি—

কুমার : আমার মাকে আপনি চেনেন না। আলাপ হওয়ার মতন না তাছাড়া মা আজই শো করেই বাইরে শো করতে চলে যাবে।

রেখা : সে কি, বাড়ি ফিরবেন না ?

কুমার : না।

রেখা : জানেন শো দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিলো উনি নিজে ঠিক ঐ অলকানন্দার মতো। চিরকালের মা—

উত্তরে কুমার মৃদু হাসে। কোনও উত্তর দেয় না। বিরতি শেষ হওয়ার ঘণ্টা শোনা যায়।

রেখা : চলুন। আমিও ফিরে যাবো। একা একা এসব দেখতে ভালো লাগে না—

(কাট্)

দৃশ্য ৩২

রেখা ও কুমার সেণ্ট পল গীর্জার পাশের রাস্তা দিয়ে ফিরছে।

রেখা : আপনার মা জানতেও পারলেন না যে, আপনি আজ ওঁর অভিনয় দেখলেন।

কুমার : হ্যাঁ, অনেকদিন পর।

রেখা : কতদিন ?

কুমার : কে জানে, সেই ছেলেবেলার পর। সে সব খুব স্পষ্ট মনে পড়ে না।

দুজনে চুপচাপ হাঁটতে থাকে।

কুমার : নকুল আর ওখানে গিয়েছিলো ?

রেখা : না। আপনি ওকে কিছু বলেছেন ?

কুমার : নকুলদের অন্যভাবে বলতে হবে। সোজা কথা ওরা বোঝে না।

রেখা : যাক্‌গে। কি আর হবে। যা হবার তো হয়েই গেছে।

কুমার অন্যমনস্ক ভাবে বলে—

: হ্যাঁ, হয়েই গেছে।

ওরা দূর থেকে দূরে চলে যায়।

(মিক্স)

দৃশ্য ৩৩

সকাল বেলা। নয়নতারার বাসা। শৈলবাবু নয়নতারার কিট্‌ব্যাগ নিয়ে দরজা ঠেলে ঢোকেন। ওঁর পেছনে নয়নতারা। নয়নতারার চুল উসখো খুসকো। মুখ ফ্যাকাসে। ওঁদের সাড়া পেয়ে কুমার নিজের ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। শৈলবাবু কিট্‌ব্যাগটা বাড়িয়ে ধরেন।

শৈলবাবু : ধরো, তোমার মাকে নিয়ে খুব ঝামেলা গেল। হুট্ করে জ্বর এসে গেল। বাড়তে বাড়তে একেবারে একশো তিন। ওষুধ বিষুধও কিছু নেই যে দেবো। তাই ফিরিয়ে আনলাম—

কুমার কিট্‌ব্যাগ হাতে নেয়। নয়নতারা ঘরের দরজার চাবি খোলেন, ভিতরে ঢুকে যান। কুমার কিট্‌ব্যাগটা নিয়ে নয়নতারার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কি করবে বুঝতে পারে না। নয়নতারা ভিতর থেকে বলেন—

: শৈলবাবু যাবেন না। একটু চা খেয়ে যাবেন। অনেক ধকল গেল আপনার—

রোয়াকে দাঁড়িয়ে শৈলবাবু বলেন—

: থাক্। আপনি একটু শুয়ে থাকুন তো। ব্যস্ত হতে হবে না।

কুমার কিট্‌ব্যাগটা নয়নতারার ঘরের চৌকাঠের ওপারে নামিয়ে রাখে।

কুমার : শৈলবাবু আপনি আমার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি চা কিনে আসছি।

শৈলবাবু : না, না। ওসব রাখো তো এখন। চলো, তোমার ঘরে গিয়েই বসি।

দৃশ্য ৩৪

কুমারের ঘর। শৈলবাবু ও কুমার। শৈলবাবু চেয়ারে এসে বসেন।

শৈলবাবু : শোনো কুমার। তোমার মায়ের শরীরটা মোটে ভাল যাচ্ছে না। এই হুট্‌হাট করে জ্বর আসা কি ভাল ? শরীরের ওপর এই ধকল যায়—তুমি একটু ভালো ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত কর।

কুমার : মা কি আমার কথা শুনবে ?

শৈলবাবু : তাই বলছি যে, তোমার ঐ কমলামাসীকে একবার আসতে বলো। বিপদে-আপদে তোমাদের আর কে আছে যে বলবে—

কুমার : মাসী তো এখন যাত্রা পার্টিতে—

শৈলবাবু : হ্যাঁ। এ বছর মৃণ্ময়ী অপেরায় ঢুকলো। বিকেলের দিকে গদীতে ফোন করলে পাবে। ফোন নাম্বার আছে না কি তোমার কাছে ?

কুমার : মায়ের কাছে বোধহয় আছে।

শৈলবাবু : আমার কাছে আছে—

শৈলবাবু পকেট থেকে একটা মোটা পকেট ডায়েরি বার করে পাতা উল্টোতে থাকেন। কুমার সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

(মিক্স টু ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্স)

দৃশ্য ৩৫ (ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্স)

একটা থিয়েটারের মেক্‌আপ রুম। চেয়ারে বসে রেস বুকের পাতা ওল্টাচ্ছে মানিক দত্ত। বালক কুমার অন্য একটা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে। আয়নার সামনে যুবতী নয়নতারা শেষ মুহূর্তেই মেকআপ সারতে সারতে কথা বলছেন।

নয়নতারা : ছেলেটাকে নিয়ে এখানে আসতে তোমায় বারণ করেছি আমি।

মানিক দত্ত : রেখে আসবো কোথায়, বাড়িতে একা থাকবে।

নয়নতারা : আজ তো ডবল শো। ওকে আমি কোথায় রাখবো। তোমার তো রেসের মাঠে না গেলে নয়। তুমি যে কোথায় নেবে যাচ্ছো—

মানিক দত্ত : তুমি স্টারে জয়েন্ করবে বলে সলিল মিত্তিরকে বলেছো ?

নয়নতারা মানিক দত্তের দিকে ফিরে তাকান।

নয়নতারা : কেন তোমার তাতে কি আসে যায় ?

মানিক দত্ত : তা তো বলবেই। এখন মানিক দত্ত ফেকলু, যখন কাপ্তেন ছিলো এরই হাত ধরে স্টেজে ঢুকেছিলেন। এখন সব 'ছোটতারা' বলে ডাকে,

ধরাকে সরাজ্ঞান করছে।—

নয়নতারা : বাজে কথা বলবে না। তোমার কাপ্তেনি তো পনেরো আনাই মেকী।

নিজের দোষে সবকিছু ঘোচালে···মদ, জুয়া—

ওদের কথাবার্তার ফাঁকে কুমার চেয়ার থেকে নেমে পড়ে। দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি মারে।

: ঐ ছেলেটা না হলে, আমি তোমার স্বামীগিরি ঘুচিয়ে দিতাম।

মানিক দত্ত : কি করতে? ঐ নববাবুর সাথে ঘর বাঁধতে! তারও ছেলে বৌ আছে। তোমার সঙ্গে ঐ লট্‌ঘট্ পর্যন্ত। তার বেশি এগোবে না—

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই বালক কুমার বেরিয়ে যায়।

দৃশ্য ৩৬

ওদের কথাবার্তার ফাঁকে অজান্তে কুমার ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যাক স্টেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নানান ধরনের কাট আউট, ফার্নিচার থিয়েটারের কলাকুশলীদের মধ্যে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবাক চোখে সবকিছু তাকিয়ে দেখছে।

থিয়েটার শুরু হওয়ার বেল বেজে ওঠে। নয়নতারা উত্তেজিত মুখে মেকআপ রুম থেকে বেরিয়ে আসেন। কুমারকে নজরে পড়ে তাঁর।

নয়নতারা : ঘোরাঘুরি কোরো না। পায়ে পেরেক-টেরেক ফুটে যাবে।

এদিক ওদিক তাকান নয়নতারা। প্রম্পটার শৈলবাবুকে দেখা যায়। অসহায় ভাবে নয়নতারা তাঁকে ডাকেন।—শৈলবাবু।

শৈলবাবু : ঠিক আছে, আপনি স্টেজে যান। আমি ওকে দেখছি।

(মিক্স)

দৃশ্য ৩৭

নয়নতারা মঞ্চে অভিনয় করছেন। উইঙ্গ-এর পাশে দাঁড়িয়ে শৈলবাবু প্রম্পট করছেন।

কুমার ওঁর পেছনে উইঙ্গের পাশে রাখা একটা বাক্সের ওপর বসে অবাক হয়ে অভিনয় দেখছেন।

(মিক্স)

দৃশ্য ৩৮

ঐ বাক্সের ওপর কুমার ঘুমিয়ে পড়েছে। স্টেজে নাটকের শেষের দিকে দৃশ্য অভিনয় হচ্ছে।

(কাট্)

দৃশ্য ৩৯

গভীর রাত্রি। সার্কুলার রোড ধরে নয়নতারা ও নববাবু ট্যাক্সি ধরে ফিরছে। দুজনের মাঝখানে কুমার বসে ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছে। নববাবু নিজের মনে কথা বলছে।

নববাবু : থার্ড এ্যাক্ট ফার্স্ট সীনে ডায়ালগগুলো কেমন যেন হড়কে বেরিয়ে আসে। কন্ট্রোল থাকে না। সত্যেনবাবুকে বললাম, একটু পাল্টে লিখতে, তো সে ওর ইগোতেই গেল। ঐ কথাগুলোই নাকি ক্রীম অফ্ দি প্লে—

গাড়ির অন্যপ্রান্তে চুপচাপ বসে থাকা নয়নতারার দিকে তাকায় নববাবু।

: কি হল কি তোমার?

আজ স্টেজে মানিক দত্ত এসেছিল না?

নয়নতারা : হুঁ। স্টারে জয়েন করা নিয়ে অশান্তি করছে।

নববাবু : করবেই তো। ও তো ওদিকে রংমহলের সেসীদের হয়ে বিঠল ভাই-এর কাছ থেকে টাকা খেয়ে বসে আছে।

নয়নতারা : ওর ব্যাপার ও বুঝবে। আমি বলে দিয়েছি, আমি স্টারেই যাবো। কত বড় রোল, পাবলিসিটিও শুরু হবে পরের সপ্তাহ থেকে।

দুজনে চুপ করে থাকেন—

নয়নতারা : ওকে নিয়ে আমি ভাবনা চিন্তা ছেড়ে দিয়েছি। চিন্তা শুধু এটাকে নিয়ে—

ঘুমন্ত কুমারের দিকে তাকায় নববাবু—

নববাবু : বললাম, রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে দাও। হোস্টেলে থাকবে পড়াশোনা করবে। তুমি টাকা ফেলে দিয়ে খালাস—

নয়নতারা কোনও উত্তর দেন না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন—

(ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্স শেষ)

(কাট্)

দৃশ্য ৪০

নয়নতারার বাসা। কুমার বাইরে থেকে কড়া নাড়ে। কমলামাসী দরজা খুলে দেন।

কমলামাসী : এই যে তোর জন্যেই বসে আছি।

এত দেরি করে ফিরিস?

কুমার : মাসী কখন এলে? দোকান বন্ধ করে আসতে হয়তো—

দুজনে ভেতরের দিকে হাঁটে—কমলামাসী একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

কমলামাসী : তোর দোকানের কথা আর বলিস্ না। ফুটপাতে পোল খাটিয়ে

পালে হাওয়া লাগাচ্ছিস।

কুমার হেসে ফেলে—

কুমার : তুমি আমার দোকান দেখেছো ?

কমলামাসী : দেখিনি আবার, সব সময় ছুঁড়িগুলোর ভীড়।

কুমার : তোমার পায়ে কি হল মাসী ?

কমলামাসী : আর বলিস কেন ? বর্ধমানের বৈচিতে শো ছিল। মুখে ডায়ালগ নিয়ে ছুটে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে উঠছি, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম।

কুমার : সে কি ?

কমলা : শালারা তক্তা বসিয়েছে উঁচু নীচু। ঐ ভাঙা পা নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সীন করে দিলাম।

কুমার : বলো কি ?

কমলা : এ আর কি। একবার বুঝলি, বোর্ডের প্লে। স্টেজে ঢোকার মুখে প্যাঁক করে পায়ে পেরেক ঢুকে গেল। কোন শালা পেরেকগুলা তক্তা ফেলে রেখেছিলো।

কুমার বিস্মিত চোখে কমলামাসীর দিকে তাকায়—

কমলা : সেই পা নিয়ে স্টেজ চোষে এলাম। পরে সব দেখে সারা স্টেজে রক্তের ছড়া।

আমাদের কথা আর কে ভাবে বল্।

কুমার ও কমলামাসী কুমারের ঘরে ঢোকেন—

কমলামাসী : শোন্ ছেলে, আমি তো খবর পেয়েই ছুটে এলাম খোঁড়া পায়ে, তা তুই থাকতে নয়নের এমন হাল হল কেন ?

কুমার মাথা নীচু করে—

কুমার : তুমি তো জানো মাসী—মা আমার কথা শোনে না।

কমলা : তা ঠিক্। চিরকাল মেয়েটা এই জেদ করেই গেল। তা তুই কি ভাবলি ?

কুমার : আর. জি. কর-এ আমার এক বন্ধু কাজ করে। সেখানে আউটডোরে দেখাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কমলা : শৈলবাবু বলছিলো হাসপাতালে তেমন ভাল করে দেখেনা তাই কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিটে কোন এক ডাক্তার—

কুমার : বেশ তো। মা যাবে ?

কমলা : দেখি বলে। বলে, কোন্ হোমিওপ্যাথ দেখাবে। বড় জেদী মেয়ে। আমরা থিয়েটারের মাগী। এত জেদ কি ভাল ?

কুমার কোনও উত্তর দেয় না—

কুমার : মা কি ঘুমোচ্ছে ?

কমলা : ঘুমোবে ? কখন বেরিয়ে গেছে, কোথায় নাকি স্টেজ রিহার্সাল আছে। মানা করলাম, তা কি শুনবে—তুই খেয়ে নে। রান্নাঘরে খাবার ঢেকে রেখেছি।

(কাট্)

দৃশ্য ৪১

দুপুরবেলা। উত্তর কলকাতার একটা স্টেজে 'নটী বিনোদিনী' নাটকের স্টেজ রিহার্সাল হচ্ছে। মিউজিক হ্যাণ্ডস, লাইট ম্যান ইত্যাদিও রিহার্সাল-এর সামিল। নয়নতারা বিনোদিনীর মায়ের ভূমিকায় মহলা দিচ্ছেন। পরিচালক ও শৈলবাবু সামনের সীটে বসে মহলা পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। নয়নতারার মুভমেণ্টে ক্লান্তি আর দুর্বলতা। শৈলবাবু ও পরিচালক নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেন। পরিচালক উঠে স্টেজের সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

পরিচালক : দিদি, আজ আপনার এই পর্যন্ত থাক। কাল শুধু আপনাকে আর কেতকীকে দিয়ে রিহার্সাল করিয়ে নেবো।

নয়নতারা ম্লান মুখে স্টেজের একদিকে সরে যান। অপ্রস্তুত বোধ করেন। পরবর্তী দৃশ্যের মহলার প্রস্তুতি শুরু হয়।

(কাট্)

দৃশ্য ৪২

একটা ট্যাক্সি করে শৈলবাবু ও নয়নতারা ফিরছেন। কেউ কোনও কথা বলছেন না। কিছুক্ষণ পর শৈলবাবু বলেন : ব্লাড টেস্ট ফেস্ট কি বলছিলো ঐ ডাক্তার, ওগুলো করিয়ে নিন্।

নয়নতারা চুপ করে বসে থাকেন—

শৈলবাবু : এ নাটকের কাজ আপনি করবেন। তবে ওয়ান ওয়ালের ধকল তো কম নয়—

নয়নতারা কোন উত্তর দেন না, চুপ করে বসে থাকেন।

(কাট্)

দৃশ্য ৪৩

গভীর রাত্রি। নয়নতারার ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে আলো জলছে। কুমার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। নয়নতারা শুয়ে শুয়ে অস্ফুট একটা কাতরতার শব্দ করে ওঠেন। কুমার ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ায়। নয়নতারা গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছেন। মুখে রুগ্নতার ছাপ। কুমার খুব আস্তে ডাকে—মা। কোনও সাড়া পাওয়া যায়

না। পুরোনো ধরনের ফ্রিল দেওয়া বালিশে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছেন নয়নতারা। কুমার আলো নেভাতে গিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে—

(মিক্স)

দৃশ্য ৪৪ (ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্স)

ফ্রিল দেওয়া সাদা বালিশের ওপর ছড় ছড় করে প্রস্রাব এসে পড়ছে। একটু পিছিয়ে আসলে দেখা যায়—মানিক দত্ত আণ্ডারওয়্যার পরে বিছানায় দাঁড়িয়ে ছড় ছড় করে বালিশের ওপর প্রস্রাব করছে। নেশার ঘোরে অল্প অল্প দুলছে। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বালক কুমার সভয়ে এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের অন্যপ্রান্তে নয়নতারা ক্রুদ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে—

: জড়ানো গলায় মানিক দত্ত কথা বলছে—

: তোমরা শালা এই বিছানায় শুয়ে বেলফুল করেছো। আমি এখানে মুতে দিই। নয়নতারা হাতের কাছে একটা ধাতব এ্যাসট্রে তুলে নিয়ে মানিক দত্তের দিকে ছুঁড়ে মারেন। দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে সেটা ছিটকে পড়ে যায়। কুমার সভয়ে সরে যায়।

নয়নতারা : ছোটলোক জানোয়ার, এক পয়সার মুরোদ নেই—নেশা করে এসে—

মানিক দত্ত : ঐ বানচোত নববাবু আমার স্টেজ ম্যানেজারের চাকরি খেয়েছে, ওকে দেখে নেবো।

ভয়ার্ত কুমার দরজার ওপার থেকে উঁকি মারে। নয়নতারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। (ফ্ল্যাশ ব্যাক্ শেষ)

(কাট্)

দৃশ্য ৪৫

দুপুরবেলা। একটা গাড়ি বারান্দার তলায় কুমার ও ফটিক দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে ঝির ঝিরে বৃষ্টি পড়ছে।

ফটিক : আজ শালা ব্যবসায় বারোটা বেজে গেল।

কুমার অন্যমনস্ক ভাবে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে—

ফটিক : আজ মাসীমার সেই রিপোর্ট আনতে যাওয়ার কথা না?

কুমার : হুঁ। সন্ধেবেলা।

ফটিক : মনে করে যাস। মা বলে কথা।

কুমার : তুই বেশ আছিস্ ফটিকদা। বৌ বাচ্চা-মা-বাবা সবকিছু নেই। ঝাড়া হাত আর পা।

ফটিক হাসে—

ফটিক : শুধু হপ্তায় একদিন ড্রাই-ডে।

কুমার : আজ ড্রাই ডে করবি?

ফটিক হাসে—

ফটিক : এই দুপুরবেলা। চল্, ব্যাবসা তো আজ লাটেই উঠলো। কোথায় যাবি।

কুমার : তোর পেয়ারা বাগান।

দুজনে বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে রাস্তায় নেমে পড়ে। দ্রুত পায়ে ট্রাম লাইনের দিকে চলে যায়—

দৃশ্য ৪৬

নয়নতারার বাসা। উঠোনে হারামণি গজগজ করছে, আর বাসন মাজছে।

হারামণি : নিজে পারো তো আমায় দেয়া কেন। নিজের বাসনও নিজেই মাজতে পারো।

আমি তোমার কেনা বাঁদী যে, ঐ রক্ত লাগা শায়া শাড়ি কাচবো। আমার ঘেন্না পিত্তি নেই…

ভেতর থেকে নয়নতারা চেঁচিয়ে কথা বলেন—

নয়নতারা : না পোষায় ছেড়ে দে। অত কথা শোনাবি না। এখনও আমি মরিনি। দুটো বাসন মাজতে কত গতর লাগে—

হারামণি : তাই তো বলছি—নিজেই মেজে নিও কাল থেকে—

নয়নতারা এবার উত্তেজিত ভাবে বাইরে রোয়াকে বেরিয়ে আসেন—

নয়নতারা : ছাড় তুই, ছেড়ে দে। দুদিন তিনদিন কামাই করিস্, তখন আমি পয়সা কাটি? ছেড়ে দে আমি নিজেই মেজে নেবো।

নয়নতারা সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নামতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়েন। হারামণি হাঁউ হাঁউ করে ওঠে—

হারামণি : কি হল, ও মা কি হল কি, ছাখো কাণ্ড—

(কাট্)

দৃশ্য ৪৭

বিকেল বেলা। একটা দেশী মদের দোকানে কুমার ও ফটিক বসে আছে।

ফটিক : দে সিগারেট দে।

দুজনে দুটো সিগারেট ধরায়। ফটিক কুমারকে লক্ষ্য করে।

ফটিক : গুম মেরে গেলি? মাসীমার কথা ভাবছিস?

কুমার : হুঁ। শালা ডাক্তারের ফী আর টেস্ট করাতেই দেড়-দুশো টাকা বেরিয়ে

গেল। ভেবেছিলাম দোকানটা বড় করবো। রজত একটা ঘর দেবে বলেছিলো, হবে না।

ফটিক : ঘরটার পাজেশান্ তো নিয়ে রাখ। পরে দেখা যাবে।

কুমার : সেটা করতে গেলে তো এ দোকানটা বেচতে হবে। শেষকালে আমও যাবে ছালাও যাবে—

জানিস ফটিকদা, সেদিন বাথরুমে একটা ছোট রক্তের ডেলা পড়েছিলো। মার শরীর দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে—খুব খারাপ সিমটম—

ফটিক প্রায় দার্শনিকের মত কথা বলে—

ফটিক : তোর জন্ম দিতে তোর মায়ের কত রক্তপাত হয়েছিলো ভেবে দেখ। মেয়েমানুষের জীবনে অনেক কষ্ট—অনেক যন্ত্রণা।

যন্ত্রণা শুধু যন্ত্রণা ধ্রুব সখা।

যাতনা শুধুই যাতনা সুচির সাথী॥

কুমার : মেয়েমানুষের তুই কি জানিস্ ফটিকদা ?

ফটিক নিজের বুকে আঙুলের টোকা দেয়—

ফটিক : কি ভাবিস্। এ শালা অনেক পুরোনো পাপী।

ঘোলাটে চোখে ফটিক কুমারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দৃশ্য ৪৮

রাত্রিবেলা। কুমার সরু গলি দিয়ে কিঞ্চিৎ মাতাল অবস্থায় ফিরছে। একটা গলির মুখে এসে সে থমকে দাঁড়ায়।

রিক্সা থেকে চোয়াড়ে চেহারায় এক যুবক নামছে। তার হাতে মাটির ভাঁড় ঠোঙা—

কুমার ছেলেটির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

কুমার : এই যে নকুল কুমার।

ছেলেটি ঘুরে তাকায়।

কুমার : ভালোই আছ। রুটি, মাংস প্যাঁদাচ্ছো—

এখন বুঝি চুঁচড়োতে আর সুবিধে হচ্ছে না ?

নকুল চমকে ওঠে—

নকুল : কি বললে ?

কুমার : চুঁচড়োর মধু খাওয়া শেষ। অতগুলো টাকা হাতানো হয়ে গেছে। ওই মেয়েটাকে নিয়ে ফুর্তি করা হয়ে গেছে—

নকুল : তাতে তোমার কি ?

কুমার : বিধবার টাকা মারতে লজ্জা করে না।

নকুল ফুঁসে ওঠে—

: আমার ব্যাপার আমি বুঝবো—তুমি—

কুমার এবার নকুলের মুখে ঘুসি মারে—

: শালা লোফার, জোচ্চোর—

নকুলের হাতের মাটির ভাঁড় ছিটকে পড়ে ভেঙে যায়। কুমারের হাত ছাড়িয়ে নকুল ছুটে রাস্তার অন্যদিকে পালিয়ে যায়।

একটা রাস্তার কুকুর মাটির ভাঁড়ে এসে মুখ দেয়।

(কাট্)

দৃশ্য ৪৯

নয়নতারার বাসা। কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খোলেন কমলামাসী।

কমলা : কোথায় ছিলি, তোর মা আজ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলো।

কুমার কোনও কথা বলে না। মাসী ওর দিকে তাকান—

কমলা : কুমার, তুই মদ খেয়েছিস্ ?

কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

কমলা : তোর বাপ ছিলো নেশার রাজা। তোর আর কি হবে।

কুমারের পেছন পেছন ঘরে এসে ঢোকেন মাসী—

কমলা : নেশা দেখা আমাদের অভ্যেস আছে। তবে নেশা যদি মানুষকে খায় তাহলেই তার শেষ।

কুমার : আমার বাপের কি কিছু ছিল, যে শেষ হবে ?

কমলামাসী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—

কমলা : তোর মায়ের অনেক দোষ। তবু সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তোর বাপের পনেরো আনাই মেকী।

কুমার : বাবাই তো মাকে থিয়েটারে এনেছিল।

কমলা : যার যা কপালে লেখা। চল্ খেয়ে নিবি।

কুমার : মা কি এখন ঘুমোচ্ছে ?

কমলা : না, একটু তন্দ্রা মত এসেছে।

কুমার : মাসী, তুমি এলে—একটু ভাল লাগে।

কমলা : আমারই বা আর কে আছে বল। এখানে এলে তবু একটু সংসারের আঁচ গন্ধ পাই।

কুমার : তুমি তো এখানে এসে থাকলেই পারো।

কমলা : এক রামে রক্ষে নেই—নিজের পেটের মেয়ে তো সব পুঁজিপাটা হাতিয়ে এক শালা নব কার্তিকের সঙ্গে কেটে পড়লো। তোদের সংসারে আর যন্ত্রণা

বাড়িয়ে কি হবে।

কুমার চুপ করে থাকে—

কমলা : তবে সান্ত্বনা এটুকুই এখনও স্টেজ আঁকড়ে পড়ে আছি। হাত পাততে তো হয়না মানুষের কাছে।

তোর সেই ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ছিল না?

কুমার মাথা নীচু করে—

কুমার : আজ পারিনি মাসী। কাল অবিশ্যি যাবো।

কমলা : হ্যাঁ, যাস্। মাথা ঘুরে ফিট্ হয়ে যাওয়ার কথা বলবি। কি রোগ বাধালো কে জানে।

কুমারের কাছে সরে আসেন মাসী—

কমলা : আমার একটা কথা শুনবি ছেলে।

কুমার মুখ তুলে তাকায়—

কমলা : আমার কাছে কটা জমানো টাকা আছে। ঐ ব্যাঙের আধুলি। এটা তুই রাখবি?

মাসী কোমর থেকে একটা ন্যাকড়ায় জড়ানো বাণ্ডিল বার করেন। সেটা খুলে কয়েকটা ভাঁজ করা একশো টাকার নোট বিছানায় রাখেন।

কমলা : এতে আর কিই বা হবে। তবু—

কুমার : মাসী, তোমারও তো পায়ের চিকিৎসা দরকার।

কমলা : রাখ তোর পা। এই বয়েসে আর কিছু হবে না। ঐ খোঁড়া হয়েই যে কদিন চলে—

কুমার কোনও কথা বলতে পারে না। টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

দৃশ্য ৫০

কলকাতার একটা স্টেজে 'নটী বিনোদিনী' যাত্রাপালার অভিনয় হচ্ছে। প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্য। নয়নতারা বিনোদিনীর মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অভিনয় শেষ করে নয়নতারা ব্যাক স্টেজে চলে আসেন। শৈলবাবু সেখানে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

শৈলবাবু : এমনি তে ঠিকই আছে। শরীর কেমন বুঝছেন?

নয়ন : যতক্ষণ স্টেজে থাকি আর কিছু মনে থাকে না শৈলবাবু। মাথাটা শুধু ঝিমঝিম করছে।

শৈলবাবু : দুধ টুধ একটু খাবেন, আনিয়ে দেবো?

নয়নতারা হাসেন—

নয়ন : না। একটু কড়া করে চা খাব।

শৈলবাবু : দুটো সীন পরই তো আবার—

নয়ন : আজ কত সব বড় বড় মানুষেরা এসেছেন। সামনের সিটে দেবনারায়ণ-বাবুকে দেখলাম।

শৈলবাবু : হ্যাঁ। আরও আছেন। মন্মথবাবু, অজিত ঘোষ মশাই।

নয়ন : জানেন, এঁরা সব দেখছেন ভাবলে সমস্ত অভিনয়টাই নৈবেদ্য হিসেবে তুলে দিতে ইচ্ছে করে। শরীরের কথা কি আর মনে থাকে।

শৈলবাবু : আরও একজন গেস্ট আছে।

নয়ন : কে?

শৈলবাবু : কুমার। আপনার পুত্র।

নয়ন : সে কি, ওতো কখনও—

শৈলবাবু : কি জানি। অডিটোরিয়াম-এ ঢুকতে দেখলাম। সঙ্গে একটা মেয়েও ছিল।

নয়নতারা চুপ করে থাকেন—

শৈলবাবু : ভালোই তো। আপনাকে যখন সব ছোটতারা বলতো তখন তো ছোট। এখন এই টিমটিমে তারার আলোই দেখুক না।

নয়নতারা কোনও কথা বলেন না। মেকআপ ঘরের দিকে চলে যান।

দৃশ্য ৫১ (ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্স)

থিয়েটারের মেকআপ ঘর। দেওয়ালে টাঙানো মেকআপের আয়নার ভেতর দিয়ে দেখা যায়, ঘরের দরজা খুলে যুবতী নয়নতারা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। ওঁর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মেকআপ গলে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পর ঘরের কোণায় গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খান। বাইরে থেকে নববাবুর গলা শোনা যায়—নয়ন। নয়ন॥

সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেলে নববাবু ঢোকেন। ওঁর মুখে মেকআপ।

নববাবু ঘরে ঢুকে নয়নতারাকে লক্ষ্য করেন—

নববাবু : আর কি করতে পারবে?

নয়ন : করতেই হবে। শুরু যখন করেছি, শেষও করতে হবে।

নববাবু : আমি বারণ করেছিলাম, তোমায় খবর দিতে।

নয়ন : কেউ খবর দেয়নি। ওরা বলাবলি করছিলো, আমি শুনে ফেলেছি। যাকগে, ওর বেঁচে থাকা না থাকায় আমার আর কিছু এসে যায় না নববাবু। আপনি কি একটা নাটকের ডায়ালগ বলতেন না নববাবু—

নববাবু : সেকস্‌পীয়ারের···

কিন্তু মানিক দত্ত কাপুরুষ ছিলো না নয়ন। ও বলতো, মরলে নাটকের

হীরোর মতো মরবে।

নয়ন : হ্যাঁ, হাসপাতালে লিভার ফেটে—বীরের মতই বটে।

নববাবু : ওই কিন্তু তোমাকে স্টেজে এনেছিলো।

নয়ন : আপনারা সবাই এক কথা বলেন কেন। আমি তো আমার নিজের চেষ্টায় দাঁড়িয়েছি। ও যা করেছে তা তো কড়ায় গণ্ডায় শোধ করেছি—

দরজা খুলে স্টেজ ম্যানেজার উঁকি মারেন। নববাবুর দিকে তাকান।

ম্যানেজার : ঘণ্টা কি দেবো? আপনি যদি বলেন, মানে—

নয়নতারা : হ্যাঁ দিন। আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক আছি। স্টেজে উঠলে আরও ঠিক হয়ে যাবো।

ম্যানেজার : ভেবেছিলাম একটা এ্যানাউন্স করে শো বন্ধ রাখবো। মানিকবাবু তো স্টেজের লোকই ছিলেন। কিন্তু আজকালকার অডিয়ান্স জানেন তো, গণ্ডগোল করতে পারে।

নয়ন : তার কোনও দরকার নেই।

ম্যানেজার মাথা নেড়ে চলে যান। ইন্টারভ্যালের শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে।

নয়ন : নববাবু, আমার ছেলেটা সে বোধহয় বাড়িতে একা আছে।

নববাবু : শৈলবাবু ওকে নিয়ে এসেছে। এখানে আছে কোথাও, আমি দেখছি—

নববাবু বেরিয়ে যান, নয়নতারা চোখ বুজে নিশ্বাস নেন।

মঞ্চের পাশে উইন্সের পাশে দাঁড়িয়ে বালক কুমার প্রম্পটার শৈলবাবুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে মঞ্চের অভিনয় দেখছে। স্টেজে নববাবু ও নয়নতারা অভিনয় করছেন। (ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্স শেষ)

দৃশ্য ৫২

উত্তর কলকাতার এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের চেম্বার। অপেক্ষামান রোগীদের সঙ্গে নয়নতারা বেঞ্চে বসে আছেন।

(কাট্)

দৃশ্য ৫৩

কুমারের ক্যাসেটের দোকান। দোকানে একা কুমার বসে আছে। বাজারের বড় দুটো থলি হাতে একটি যুবক এসে দাঁড়ায়।

যুবক : কি রকম আছিস্?

কুমার চোখ তুলে তাকায়—

কুমার : ছোট্টকু? বাজার চল্লি?

ছোট্টকু : তোর হয়ে গেছে?

কুমার : আমার আবার বাজার।

ছোট্টকু : বেশ আছিস্ তোরা। দুটি মাত্র প্রাণী। আমাদের মত জয়েণ্ট ফ্যামিলি হলে বুঝতিস্। রাবণের গুষ্টি মাইরি। খানেঅলাদের ফৈজ্জতি কত—ফলাহার, জলাহার আমিষ নিরামিষ। শালা বাজার করতে করতে ইয়ে ঝুলে যায়।

কুমার হাসি মুখে তাকায়—

ছোট্টকু : হাসিস্ না। বৌকে বললাম, দুর্গাপুরের চাকরিটা নিয়ে নি। কোয়ার্টার দেবে। দুজনে দিব্যি থাকা যাবে। রাজী হল না। বললে ছেলেটাকে কে দেখবে। এখানে মা জ্যাঠাইমা দিদিমা সব আছে—

কুমার : তোর বউ কেমন আছে?

ছোট্টকু : খাচ্ছে দাচ্ছে মোটাচ্ছে। ভালো কথা, মাসীমাকে দেখলাম, যোগেন পাগলার দোকানে বসে আছে। ওঁর কি শরীর খারাপ?

কুমার : যোগেন পাগলা?

ছোট্টকু : ঐ বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের চেম্বার।

শালা ডেনজারাস হোমিও।

কুমার : হ্যাঁ, মার শরীর ভালো যাচ্ছে না।

ছোট্টকু : তাই বলে যোগেন পাগলা। ভালো ডাক্তার-ফাক্তার দেখা—বাট্ নেভার যোগেন! রিস্ক নিবি না কুমার।

কুমার কিছু না বলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে—

কুমার : কি জানিস্ ছোট্টকু। মা যে ঐ যোগেন ডাক্তারকে দেখাচ্ছে, আমি জানিই না।

ছোট্টকু : তা জেনে গেলে যখন তখন ঠেকাও। ভালো ডাক্তার দেখাতে হলে আমাকে বলিস্। আমার কিছু জানাশোনা আছে—চলিরে—

ছোট্টকু আবার দ্রুত একদিকে চলে যায়।

(কাট্)

দৃশ্য ৫৪

নয়নতারার বাসা বাড়ি। নয়নতারার ঘরে বসে শৈলবাবু। কয়েকটা খবরের কাগজ হাতে 'নটী বিনোদিনী' নাটকের ওপর লেখা সমালোচনা পড়ছেন। নয়নতারা খাটের ওপর বসে শুনছেন।

পড়া শেষ করে কাগজ নামান শৈলবাবু।

শৈলবাবু : মনে হচ্ছে এ সীজনে এরা ভালই ব্যবসা পাবে। এসব নাটকের তো মার নেই, সব সময়েই চালানো যেতে পারে—ইংরেজিতে যাকে বলে ক্লাসিক।

নয়নতারা : আপনারও এক সময় নাটক লেখার সখ ছিল শৈলবাবু।

শৈলবাবু চশমাটা চোখ থেকে খোলেন—

শৈলবাবু : ঐ আর কি। গরীবের ঘোড়া রোগ। ছিলাম প্রম্পটার। এখন দালালি করে খাই। আপনাদের দৌলতে—

নয়নতারা : কি যে বলেন, বরং আপনার অনুগ্রহে আমরা এখনও বেঁচে বর্তে আছি। তা না হলে কবে ফৌত হয়ে যেতাম। রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতে হোত—

শৈলবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েন—

শৈলবাবু : সেটা আপনাদের নয়, আমাদের লজ্জার ব্যাপার হত। আমরা নাটুকে জাত বলে গর্ব করি—

ভাবুন তো, তারাসুন্দরী, বিনোদিনী, সুকুমারী, কৃষ্ণভামিনী এদের শেষকালে কি দুর্দশা হয়েছিলো।

সবার নামে স্টেজ হল, অথচ যে বিনোদিনী সর্বস্ব দিয়ে দিলে তার নামে একটা স্টেজ করার কথা ভাবলে না কেউ।

দুজনেই চুপ করে থাকেন—

শৈলবাবু : ঐ ডাক্তার রক্ত টক্ত পরীক্ষা করে কি বলল ?

নয়নতারা : এখন বায়াপ্‌সি না কি যেন করতে বলেছে।

শৈলবাবু : যা করতে বলছে করিয়ে নিন্। কমলাদিদির পায়ে সেই চোটটা লাগলো, এখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারে না। আজ ওনার ওখানে একবার যাবো। আজ উঠি।

শৈলবাবু উঠে দাঁড়ান। টেবিলের ওপর খবরের কাগজে মোড়া একটা শিশি নজরে পড়ে নয়নতারার।

নয়নতারা : ওটা কি ফেলে যাচ্ছেন ?

শৈলবাবু লজ্জিত মুখ করেন—

শৈলবাবু : ফেলে যাচ্ছি না। রেখে যাচ্ছি। এক শিশি হরলিক্স। দুবেলা গরম জলে গুলে একটু খাবেন। চা খাওয়া কদিন কমান।

নয়নতারা হরলিক্সের শিশির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

(কাট্)

দৃশ্য ৫৫

বিকেলবেলা।

রেখা : আপনি বাড়িতে বসলেন না। মা খুব দুঃখ পাবেন।

কুমার : কে জানে, আমাকেও হয়ত নকুলের মত কেউ ভাবতে পারেন।

রেখা : মেয়েরা মানুষ চেনে।

কুমার : তোমার বোন-চেনে ?

রেখা : ওর বয়েস কম। চেনার বয়স হয়নি।

দুজনে চুপ করে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে—

রেখা : আপনি কি নকুলকে ধরে ছিলেন ?

কুমার তাকায় : ও কি এসেছিল নাকি ?

রেখা : না, আমার বোনের সাথে দেখা করেছে। বলেছে কিছু টাকা ফেরৎ দিয়ে যাবে।

কুমার কোনও উত্তর দেয় না।

রেখা : আপনারও খুব টাকার দরকার তাই না ?

কুমার : মা তো কিছু বলে না। একা একা হাসপাতালে যায়, ওষুধ নিয়ে আসে। গীর্জার ঘড়িতে সন্ধ্যা ৬টায় ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়—

কুমার : মা বোধ হয় আর বাঁচবে না।

রেখা চমকে তাকায়—

কুমার : মাকে বায়াপ্‌সি করতে বলেছে। এর মানে খুব খারাপ।

রেখা : বাঁচবেন। আপনার মায়ের মতো মেয়েরা মরে না। শত দুঃখ কষ্টেও ঠিক বেঁচে থাকে।

কুমার বিস্মিত ভাবে রেখার দিকে তাকায়—

দৃশ্য ৫৬

নয়নতারার বাসা বাড়ি। নয়নতারা উঠোনে বসে বাসন মাজছেন। দরজা ঠেলে কমলামাসী ঢোকেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসেন।

কমলা : এ কি-রে নয়ন। এই শরীর নিয়ে তুই—

নয়ন : হারামণি কদিন আসছে না। কি করবো বলো—

কমলা : তাই বলে তুই—সর্ সর্ সর দিকিনি—

নয়ন : ছাড়ো দিদি। ধোয়া হয়ে গেছে। কাপড় চোপড় পড়ে আছে একগাদা, দুজনে মিলে বরং ধুয়ে নেবোখন।

কমলামাসী গোঁড়াতে গোঁড়াতে অগত্যা সিঁড়ির ওপর বসে আছেন—

কমলা : একটু, জিরিয়ে নিই, । বেশীক্ষণ আর দাঁড়াতেও পারি না—

নয়ন : তখন তোমায় বললাম ক'দিন শুয়ে একটু বিশ্রাম নাও, এখন বোঝো।

কমলা : বিশ্রাম কি আর আমাদের পোষায়। যাত্রাপালায় এখন যাচ্ছিনে, দু-দুটো অফিস ক্লাবের শো। একটা বোর্ডে কদিন বদলির কাজ। দুটো মাস তো এই করেই চলল—

বাসনে জল ঢেলে নয়ন উঠে দাঁড়ান।
নয়ন : ঘরে চলো দিদি।

দৃশ্য ৫৭

নয়নতারার ঘরের ভেতর নয়নতারা ও কমলামাসী—
কমলা : হ্যাঁ রে, খবরের কাগজে তোদের পালা নিয়ে ভালো লিখেছে শুনলাম। তোর কথাও খুব লিখেছে।
নয়ন : এখন আর ভালো মন্দ।
কমলা : কেন, বয়েসকালে তোর নামডাক হয়নি? কপালে সয়নি তো কি করবি বল্।
কমলামাসী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—
কমলা : তাই ভাবি। তোর ঐ মানিক দত্ত ছিলো পনেরো আনাই মেকী। সে উঠলো আর হাউই বাজীর মত ফোত হয়ে গেল। মাঝখান থেকে তোর জীবনটা বরবাদ করে দিলে—
নয়ন : থাক্ দিদি, ওসব আর বলে কি হবে। চা খাবে?
কমলা : বড় দুঃখে বলি বুঝলি। যেমন-আমার জীবনটা তেমনি তোর। ছেলেটা থেকেও নেই। একা একা হাসপাতালে ধন্না দিয়ে বেড়াচ্ছিস্। এখন আবার কি রোগ বাধালি কে জানে।
নয়নতারা রান্নাঘরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান—
নয়ন : ছেলেবেলায় সেই আঙুরদিদির গাওয়া সেই গানটার মতো অবস্থা—
নয়নতারা গুনগুন্ করে গান গেয়ে ওঠেন—
গান : কাঁদিস না ফাগুন গেলে—
.....

দৃশ্য ৫৮ (ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্স)

নয়নতারার ঘরে গ্রামোফোনে ঐ একই গান বাজছে। নয়নতারা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। নয়নতারার পরনে সাদামাঠা শাড়ি-ব্লাউজ, হাত খালি।
দরজার কাছে বালক কুমার এসে দাঁড়ায়—
কুমার : মা, ঐ লোকটা আসছে।
বাইরে থেকে নবনবাবুর গলা শোনা যায়—
: নয়ন, আছো নাকি?
নয়নতারা : ঐ লোকটা কি ছিঃ ছিঃ! নবনবাবু বলতে পারো না?
কুমার সরে যায়, নবনবাবু দরজায় এসে দাঁড়ায়।

নবনবাবু : বসতে বলবে না?
নয়ন : আসুন।
নবনবাবু ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেন। নয়নতারাকে লক্ষ্য করেন—
নবনবাবু : তোমার এই বৈধব্য এখনও চালিয়ে যাচ্ছো?
নয়ন : বিধবা মানুষ কি সধবার মেকআপে থাকবে?
নবনবাবু : অভিনেত্রীর আবার বৈধব্য কি নয়ন। সে উর্বশী। বৈধব্য নেই, সতীত্ব নেই, সংসার নেই। মাতৃত্ব নেই—
নয়নতারা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন—
নবনবাবু : গিরিশচন্দ্রের সেই বিখ্যাত কমেন্টটা মনে নেই—সতীত্ব একটা কুসংস্কার। অভিনেতা যদি অভিনয় ছেড়ে দেয় তাহলেই সে কুলটা—অসতী।
নয়নতারা ঘুরে তাকান—
নয়নতারা : আমি তো স্টেজ ছাড়িনি নবনবাবু। স্টেজ ছাড়লে খাব কি?
নবনবাবু : এখন তুমি নয়নতারা। যখন বয়স হবে, দেখবে তুমি চোখের বালি। তাই বলছি চলো, দুজনে মিলে নতুন স্টেজ খুলি। মানিকতলার কাছে নতুন একটা স্টেজ খালি পড়ে আছে।
নাটকও তৈরি, 'সিন্দুর ছেলে'।
নয়ন : স্টেজের মালিক হওয়ার লোভ আর আমার নেই নবনবাবু। এই ছেলে আর আমি এই তো সংসার—আমার এই মাস মাইনেই ভালো—
নবনবাবু চুপ করে থাকেন। গানটা শেষ হয়ে যায়। খস্ খস্ শব্দ হয়। নয়নতারা গ্রামোফোন অফ্ করেন
নবনবাবু। ছেলেটাকে হোস্টেলে দেওয়ার কথা বললাম, তা তুমি শুনলে না। আমাকে ও সহ্য করতে পারে না। মানিক দত্তের রক্ত শরীরে—আস্ত সাপের বাচ্চা।
দরজার কাছে সরে আসে কুমার। ক্রুদ্ধ চোখে নবনবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে—
(ফ্ল্যাশব্যাক শেষ)
(কাট্)

দৃশ্য ৫৯

রাত্রিবেলা। কুমারের ক্যাসেটের দোকান-এর ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে। ফটিক ও কুমার দুজনে নিঃশব্দে দোকান বন্ধ করছে।
ঝাঁপ বন্ধ করার পর ফটিক বলে ওঠে—
: বাড়ি যাবি?
কুমার মাথা নাড়ে—

ফটিক : মাসীমাকে এখন কিছু বলিস্ না।

কুমার : কদ্দিন আর না বলে থাকব। ভেবেছিলাম দোকানটা বিক্রি করে দেবো। তার আর দরকার হবে না।

ফটিক : কি করে জানলি ?

কুমার মাথা নাড়ে—

কুমার : ইউট্রাস কাকে বলে রে ফটিকদা ?

ফটিক কুমারের মুখের দিকে তাকায়—

ফটিক : জরায়ু। ছোট অন্ধকার একটা কুঠুরী। যেখানে তুই তোর জন্মের আগে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে ছিলি।

কুমার : ডাক্তার যা বলল—খুব দেরি হয়ে গেছে।

ফটিক চুপ করে থাকে—কুমার হঠাৎ রুদ্ধ গলায় বলে ওঠে।

কুমার : মা বোধ হয় বাঁচবে না ফটিকদা।

(কাট্)

দৃশ্য ৬০

নির্জন রাস্তা দিয়ে কুমার একা ফিরছে। একটা গলির বাঁকে দূর থেকে কুমার লক্ষ্য করে, নকুল দাঁড়িয়ে আছে। কুমার আর একটু এগোয়। অনুভব করে আরও কতকগুলো ছেলে যেন চারিদিক থেকে ওকে ঘিরে আসছে। কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল বোধ করে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে পায়ের চটিটা নিঃশব্দে খুলে ফ্যালে এবং হঠাৎ খুব দ্রুত দৌড়তে শুরু করে।

(কাট্)

নয়নতারার বাসা। উঠোনের চৌবাচ্চায় হাত-পা ধুয়ে নয়নতারা—রোয়াকে উঠে আসছিলেন। দড়াম করে দরজা খোলার শব্দে চমকে ফিরে তাকান। ঘর্মাক্ত উত্তেজিত কুমার দৌড়ে উঠোনে ঢুকে নয়নতারাকে দেখে থমকে যায়।

নয়নতারা ক্লান্ত স্বরে বলেন—

: কি করে বেড়াচ্ছো তুমি ? আমার এই অবস্থা ?

কুমার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর কিছু না বলে নয়নতারা নিজের ঘরে ঢুকে যান।

নিজের ঘরে খাটের ওপর শুয়ে আছেন নয়নতারা। কুমার দরজায় এসে দাঁড়ায়—

কুমার : কদিন একটু বিশ্রাম নিলে তো পারো।

নয়নতারা চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন—

: কাল দিদির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যেতে হবে।

কুমার : ও।

আস্তে-আস্তে সরে যায় কুমার।

দৃশ্য ৬১

সকালবেলা। একটা রিক্সা করে কমলামাসী ও নয়নতারা রাজা রাজকৃষ্ণ কিষেণ স্ট্রিট (থিয়েটারের গলি) দিয়ে চলেছেন। দুধারে উত্তর কলকাতার নাট্যমঞ্চগুলি সরে যাচ্ছে। কমলামাসী কথা বলছেন।

কমলামাসী : তুই তো কথা শুনিস্ না। ভবতারিণী দর্শন করে চন্নামৃত খেয়ে—তাছাড়া ঠাকুর আমাদের থিয়েটারের দেবতা। ইত্যাদি।

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের সামনে এসে হঠাৎ নয়নতারা বলে ওঠেন—

: একটু থামাবে দিদি।

কমলামাসী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

কমলামাসী : শরীর খারাপ লাগছে না কি তোর। এ্যাই একটু রোককে রোককে বাবা।

রিক্সা থামে, নয়নতারা নামেন—

নয়ন : তুমি একটু বসবে দিদি। আমি একটু আসছি।

কমলামাসী বিস্মিত বোধ করেন। নয়নতারা রিক্সা থেকে নেমে রঙ্গমঞ্চের ভেতরে ঢুকে যান। দারোয়ানের সঙ্গে কি যেন কথা বলেন। কমলামাসী অগত্যা। রিক্সা থেকে নেমে ফুটপাতের ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। তারপর ফুটপাতের চায়ের দোকানে গিয়ে এক ভাঁড় চা দিতে বলেন। রিক্সা চালক উবু হয়ে বসে বৈনী বার করে হাতে ডলতে থাকে—

দৃশ্য ৬২

রঙ্গমঞ্চের ভেতরে। আধো অন্ধকার ফাঁকা মঞ্চের ওপর নয়নতারা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসেন। মঞ্চের একধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। ফাঁকা শূন্য রঙ্গমঞ্চ। অডিটোরিয়ামের একটি খোলা দরজায় কমলামাসী এসে দাঁড়ান। আধো অন্ধকারে মঞ্চের উপর নয়নতারাকে দেখতে পান। বিস্মিত বোধ করেন কমলামাসী।

কমলা : কি রে নয়ন। রিক্সা বসিয়ে রেখে এসেছি—যাবি না ? চল্—আবার বেলাবেলি ফিরতে হবে তো।

নয়নতারা স্টেজের থেকে কমলামাসীর দিকে তাকান। কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাব।

নয়ন : মনে আছে দিদি। সেই কতদিন আগে এইখানে প্রথম স্টেজে উঠে ছিলাম। জানো দিদি। রট লাইটের আলোগুলো যখন জলে উঠলো পা কাঁপতে লাগলো ঠক্ ঠক্ করে।

কমলামাসী অবাক হয়ে নয়নতারার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কমলামাসী : বড়বাবু এই স্টেজ সারিয়ে ছিলো। নাম দিয়েছিল, শ্রীরঙ্গম। আমিও কম কাজ করেছি এই স্টেজে—নে এখন চল্।

নয়নতারা : না দিদি, তোমার ঐ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে আমি আর কি দেখবো। এই আমাদের মন্দির—বুঝলে দিদি।

তুমি তো জানো। সে বড় সুখের সময় ছিল। সে তখন স্টেজ ম্যানেজার। নাটক ছিলো রবি ঠাকুরের চিরকুমার সভা। নববাবুকেও সেই প্রথম দেখলাম।

নীরবালার পার্টে গান গাইতে গলা কেঁপে উঠেছিলো আমার।

(ওয়েভ আউট)

দৃশ্য ৬৩ (ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্স)

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের চিরকুমার সভা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। যুবতী নয়নতারা নীরবালার ভূমিকায় স্টেজে ঘুরে ঘুরে গান গাইছেন। নববাবু ও আছেন। [উইন্স-এর পাশে মানিক দত্ত দাঁড়িয়ে নয়নতারার দিকে তাকিয়ে আছে। মানিক দত্তের পরনে চুনোট করা পাজামা-পাঞ্জাবী] (ফ্ল্যাশব্যাক শেষ হয়)

দৃশ্য ৬৪

নয়নতারার বাসাবাড়ি। নয়নতারা নিজের ঘরের ভেতর দেওয়ালে টাঙানো সেই সাজঘরের আয়নায় নিজের মুখ দেখছেন। মুখের ক্লান্ত বলিরেখা। চোখের তলায় কালি ইত্যাদি।

ঘরের একমাত্র জানলাটা খুলে দেন নয়নতারা। ঘরের ভেতর সকালবেলার রোদ এসে পড়ে। খাটের ওপর রাখা ফুলস্কেপ কাগজের দিস্তে। 'নটী বিনোদিনী' নাটকের হাতে লেখা স্ক্রীপ্ট। জানলা দিয়ে আসা দমকা হাওয়ায় সেই স্ক্রীপটের পাতা ফড় ফড় করে ওড়ে। নয়নতারা সেদিকে তাকিয়ে থাকেন।

দৃশ্য ৬৫

উত্তর কলকাতার গলি দিয়ে কুমার ও শৈলবাবু আসছে—

শৈলবাবু : না জানালে যদি একটা দিন ভালো থাকে, থাকুক না। তবে কেমোথেরাপী না কি বলছিলে, সেটা খুব কষ্টের।

কুমার : হ্যাঁ। তাছাড়া ডাক্তারবাবু বলছিলো কেমো নেওয়ার মত মায়ের শরীরে আর ক্ষমতা নেই।

শৈলবাবু : আমি অবশ্য নানান জায়গা থেকে কিছু টাকা-পয়সা জোগাড়ের চেষ্টায় আছি। সরকারের কাছেও একটা চিঠি লিখতে হবে। অভিনেত্রী সংঘ। শিল্পী সংসদ—এরাও আছে। জানালে কি কিছু কিছু দেবে না।

কথা বলতে বলতে ওঁরা নয়নতারার বাসার কাছে এসে যান।

শৈলবাবু : চ্যারিটির ব্যাপারটাও খুব গোপন রাখতে হবে। নয়নদিদি জানলে আবার বেঁকে বসবে।

দৃশ্য ৬৬

নয়নতারার বাসার উঠোনে ঢোকে দুজনে। নয়নতারার ঘর থেকে শোনা যায়—নয়নতারা 'বিনোদিনী' নাটকের পার্ট মুখস্ত করছেন। শৈলবাবু ও কুমার উঠোনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাই শুনতে থাকেন।

দৃশ্য ৬৭

নয়নতারার ঘর। নয়নতারা চুপ করে খাটে বসে আছেন। শৈলবাবু ঢোকেন।

নয়নতারা : নাটকের খবর কি শৈলবাবু?

শৈলবাবু : সীজন তো এখনও শুরু হয়নি। আপনি তৈরি হতে থাকুন। শরীর যদি ভালো থাকে করবেন বৈকি।

নয়ন : কাজটা ভাল ছিল। অনেকদিন এরকম পাইনি।

শৈলবাবু লক্ষ্য করেন দেওয়ালে সেই ফাঁকা জায়গাটায় খুলে ফেলা ছবিটা আবার টাঙানো হচ্ছে। নয়নতারার থিয়েটারের পোষাক পরা একটা ছবি।

শৈলবাবু : ছবিটা আবার টাঙিয়েছেন। বাঃ।

সেদিকে তাকান নয়নতারা—

নয়ন : হ্যাঁ। শরীরের গতিক আমিও ঠিক বুঝছি না। যদ্দিন আছি চোখের সামনেই থাক ছবিটা।

চুপ করে থাকেন নয়নতারা। তারপর ধীরে ধীরে বলেন—

: মনে আছে শৈলবাবু। মনে হচ্ছে, এই সেদিনের ঘটনা। অত বড় পার্ট। হঠাৎ স্টেজে ঢোকার আগে সে কি অবস্থা। একটা ডায়লগও মনে পড়ছে না।

শৈলবাবু : মনে থাকবে না। 'টাকার রং কালো' নাটক। মানিক দত্ত স্টেজ ম্যানেজার। আপনি করছিলেন লতু-লতিকার রোল।

(মিক্স)

দৃশ্য ৬৮ (ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্স)

মঞ্চের সাইড স্টেজে যুবতী নয়নতারা মেকআপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। উত্তেজিত। মানিক দত্ত এগিয়ে আসে।

মানিক দত্ত : কি হল, ঘামছো কেন ? মেকআপ গলে যাবে যে—

নয়নতারা : কিছু মনে পড়ছে না, একটাও ডায়লগ মনে পড়ছে না। এ কি হল বলো তো ?

মানিক দত্ত নয়নতারার পিঠে হাল্কা চাপড় দেয়—

মানিক : ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। স্টেজে উঠলে দেখবে সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

নয়নতারা : না, না। কিছু মনে আসছে না আসরে। অডিয়ান্স গালাগালি দেবে আমাকে। ছিঃ ছিঃ, হ্যাঁ গো কি করবো ?

নাটকের থার্ড বেল বেজে ওঠে। খুলে যেতে থাকে মৃদু শব্দ তুলে। উইঙ্গ-এর পাশে যুবক প্রম্পটার শৈলবাবু গিয়ে দাঁড়ান। পেছন ফিরে নয়নতারার দিকে তাকান।

নয়নতারার বিহ্বল চোখমুখ দেখে, আশ্বাসের হাসি হাসেন।

মানিক দত্ত : যাও, এগোও তোমার এন্ট্রি।

আচ্ছন্নের মত এগিয়ে যান নয়নতারা। উইঙ্গ-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শৈলবাবু ওঁর সংলাপের প্রথম লাইন কানের কাছে মুখ দিয়ে ধরিয়ে দেন।

স্টেজে ঢোকেন নয়ন। মুহূর্তে স্বাচ্ছন্দ হয়ে ওঠেন। সংলাপ বলতে শুরু করেন। সংশয় কেটে যেতে থাকে, ক্রমশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে থাকেন।

শৈলবাবু ও মানিক দত্ত মুখ চাওয়া-চায়ি করেন। স্বস্তির হাসি হাসেন।

(ফ্ল্যাশব্যাক শেষ হয়)

(মিক্স)

দৃশ্য ৬৯

নয়নতারার বাসা। নয়নতারা বিছানায় শুয়ে। দরজায় কমলামাসী এসে দাঁড়ান।

কমলা : নয়নতারা !

নয়নতারা দরজার দিকে ফিরে তাকায়, চোখের চারিদিকে কালো বৃত্ত। মুখের আদল ভেঙে গেছে।

নয়ন : এটা কোন মাস দিদি ?

কমলা ঘরে ঢোকেন—

কমলা : কেন রে, আশ্বিন পড়ে গেছে।

নয়ন : ওরা তো কিছু জানালো না। শৈলবাবু বলে গেল, সীজন শুরু হলে জানাবে। কতদিন হয়ে গেল—

কমলা : শৈলবাবু নিশ্চয়ই যোগাযোগ রেখেছে। তোর শরীর ঠিক হোক।

নয়ন : সংসারে যে কি হচ্ছে তাও বুঝতে পারি না। কাল বিকেলে কারা সব

এসেছিলো, কথা বলছিলো।

কমলা : ঐ গ্রুপ থিয়েটারের সব ছেলেমেয়েরা তোর খোঁজ নিতে এসেছিলো। তুই ঘুমুচ্ছিলি তাই ডাকিনি।

নয়ন : ডাকলে না ? কতদিন কাউকে দেখিনি। ছেলেটাই কি করে বেড়াচ্ছে কে জানে—

কমলা : ও বেচারা অনেক করছে। কোথায় কোথায় ছুটে বেড়াচ্ছে উদও।

নয়নতারা অন্যদিকে মুখ ফেরান—

জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। সেইদিকে তাকিয়ে থাকেন নয়নতারা।

নয়ন : ছাখো দিদি, ঠিক পুজোর মত রোদ।

জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়া রোদের ওপরে পুজোর আগমনীর ঢাক বেজে ওঠে।

দৃশ্য ৭০

আবহে ডাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে। আগমনীর বাজনা। কুমারটুলি অঞ্চলে প্রতিমার চোখ আঁকা হচ্ছে। প্রতিমাকে জরির সাজ ইত্যাদি আভরণে সজ্জিত করা হচ্ছে।

দৃশ্য ৭১

প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার তুমুল হট্টরোলের মধ্যে দিয়ে বিষণ্ণ চিন্তান্বিত কুমার গলি দিয়ে হেঁটে আসছে।

দৃশ্য ৭২

নয়নতারার বাসা। নয়নতারার ঘরের দরজার কাছে শৈলবাবু দাঁড়িয়ে। কমলামাসী খাটের মাথার কাছে। নয়নতারা শুয়ে আছেন—অক্সিজেন সিলিণ্ডার এবং ড্রিপ্ করে রক্ত দেওয়া হচ্ছে।

নয়নতারা মৃতবৎ শুয়ে আছেন। ওঁরা সেদিকে তাকিয়ে আছেন। বাইরের দরজায় শব্দ হয়। কুমার প্রায় নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ঢোকে।

কুমারের ঘর। কুমার, শৈলবাবু, কমলামাসী।

শৈলবাবু : এসব ব্যবস্থা কখন হল কুমার ?

কুমার : কাল রাত্তির থেকে। শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়লো।

কমলা : তুই কি করে যে কি করলি, এত সব খরচের ব্যাপার—

শৈলবাবু : কত জায়গায় হাঁটাহাঁটি করলাম। কিছু টাকা যে পাওয়া যাবে তা নয়, তবে কবে পাওয়া যাবে সেটাই বলা মুশকিল।

কুমার : ব্যবস্থা একটা হয়েছে। আপাততঃ এভাবেই চলুক—

কমলামাসী চোখের জল মোছেন—

কমলা : নয়নের দিকে তো আর তাকানো যায় না। অমন মানুষ কি হয়ে গেল এ ক'দিনে—

দৃশ্য ৭৩

সার্বজনীন পূজামণ্ডপে সন্ধ্যারতি হচ্ছে। ঢাকের বাজনার তালে তালে পঞ্চপ্রদীপ—

(ফেড্-আউট)

দৃশ্য ৭৪ (কুমারের স্বপ্ন দৃশ্য)

নয়নতারার বাসার বাইরের রোয়াকে। নয়নতারার ঘরের খাট ও অন্যান্য আসবাবপত্র ডাঁই করে রাখা। বাক্স প্যাঁটরা, গ্রামোফোন সব একটার পর একটা রাখা।

ঘরের ভেতর বাঁশের ভাড়া বাঁধা। কতগুলো মিস্ত্রি চুনের বালতিতে চুন রং গুলছে।

রেখাকে দেখা যায় গাছকোমর বাঁধা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। মিস্ত্রীদের কাজের তদারকি করছে। দরজায় কুমার এসে দাঁড়ায়।

রেখা : এ ঘরটার রং হাল্কা নীল হলেই ভালো হয়—

কুমার : হুঁ।

রেখা : আর ঐ ঘরটা বসার ঘর হবে। হলুদ রং।

দেওয়ালের দিকে তাকায় রেখা—

রেখা : ঐ আয়নাটা খুলে ফেলতে হবে। ওটা ঐ ঘরে লাগাবো।

কুমার দেওয়ালের দিকে তাকায়—দেওয়ালে সেই পুরোনো সাজঘরের আয়নাটা ঝুলছে।

রেখা : এই, ছাখো-ছাখো—

কুমার চমকে তাকায়। চুন গোলা রঙের বালতিতে গোলা নীল রঙের চুন ক্রমশ লাল হয়ে যাচ্ছে।

ওরা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে আওয়াজ হয়। দেওয়ালে টাঙানো সাজঘরের আয়না মাটিতে ভেঙে পড়ে। (স্বপ্ন দৃশ্য শেষ)

(কাট্)

দৃশ্য ৭৫

গভীর রাত্রি। আয়না ভাঙা শব্দে কুমারের স্বপ্নভঙ্গ হয়। সে বিছানায় উঠে বসে। ওর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাইরে কোথায় পূজামণ্ডপের মাইক ক্লান্ত স্বরে

বাজছে।

কুমার উঠে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের আলো জ্বালাতে যায়। আলো একটু জ্বলে উঠেই নিভে যায়। কুমার বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়ায়। নয়নতারার ঘরে আলো জ্বলছে।

ঘরের ভেতর থেকে যেন নয়নতারার অস্ফুট একটা আওয়াজ শোনা যায়।

কুমার ধীরে ধীরে নয়নতারার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

দৃশ্য ৭৬

খাটের ওপর নয়নতারা শুয়ে আছেন। চোখ অল্প খোলা। অক্সিজেনের রক্তবাহী নল ইত্যাদি সব খুলে ফেলা। সেগুলো খাটের পাশে ঝুলছে। অস্ফুট গলায় নয়নতারা গোঙানির মতন আওয়াজ করছেন।

কুমার নয়নতারার পাশে এসে দাঁড়ায়।

নয়নতারার বালিশের পাশে একটা পুরোনো ময়লা থাম। কয়েকটা ফটো বেরিয়ে আছে। এক টুকরো ন্যাকড়া একটা চিরুনি পড়ে আছে।

নয়নতারা আরও বড় করে চোখ খোলেন। কুমার ঝুঁকে পড়ে—কি বলছেন শোনার চেষ্টা করে।

নয়নতারা : বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ?

কুমার : না তো ঢাক বাজছে, আজ তো ভাসান।

নয়নতারা : ও।

চুপ করে কি যেন শোনার চেষ্টা করেন নয়নতারা। কি যেন বলারও চেষ্টা করেন—

কুমার : কী মা ? ছবিগুলো দেখবে ?

নয়ন : না।

আবার চুপ করে থাকেন নয়নতারা। তারপর বলেন—

নয়ন : শোনো।

কুমার আরও ঝুঁকে আসে। নয়নতারা কুমারের হাত ধরতে চান। কুমার হাত বাড়িয়ে নয়নতারার হাত চেপে ধরে হাতে হাত বুলোয়।

কুমার : মা—

নয়ন। এটা আশ্বিন মাস। তুই জন্মেছিলি—

কুমার তাকিয়ে থাকে।

নয়ন : বাবু। আমি আর বাঁচবো না।

কুমার : ওসব বলতে নেই মা।

নয়ন : বাবু। তুমি আমার সব দোষ ধরো না। শোনো, ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে

যারা আসে না, তাদের বড় দুঃখ। —তোর আমার। তুমি না ভালোবেসে কাউকে এনো না—

নয়নতারার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। গাল ভিজে যায়। কণ্ঠার হাড় থর্ থর্ করে কাঁপে। কুমার আরও নীচু হয়ে নয়নতারার ভেজা মুখে নিজের গাল ঠেকায়। এক মুহূর্ত নিস্পন্দ হয়ে থাকে। বাইরে পূজামণ্ডপের মাইকের গান শেষ হয়ে গিয়ে ঘস ঘস করে রেকর্ডের শব্দ শোনা যায় দূরে। নয়নতারা কুমারের প্রায় কানের কাছে অস্ফুট গলায় বলেন—আমি চলে যাচ্ছি বাবু, আমায় ক্ষমা করিস্—

(মিক্স)

দৃশ্য ৭৭

সকালবেলা। উঠোনে রোদ এসে পড়েছে। সদর দরজায় কড়া নাড়ার আস্তে শব্দ হয়। কুমার গিয়ে দরজা খুলে দেয়। রেখা দাঁড়িয়ে আছে।

কুমার : এস।

রেখা কুমারের পেছন পেছন উঠে আসে। রেখার হাতে কলাপাতায় মোড়া একটা ছোট ফুলের প্যাকেট।

রেখা : আমি আজ সকালে কাগজে দেখলাম।

কুমার : হ্যাঁ। সোমবার মা চলে গেল।

রেখা : ওঁর এতো নাম আর কাগজে এত ছোট করে দিয়েছে।

কুমার : দিয়েছে এই যথেষ্ট।

ওরা নয়নতারার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। নয়নতারার ফাঁকা ঘরে টান্ টান্ করে বিছানায় একটা চাদর পাতা।

রেখা : আমি একটু ঐ বিছানায় বসবো ?

কুমার মাথা নাড়ে। মৃদু হাসে। দরজার কাছ থেকে সরে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

দৃশ্য ৭৮

কুমার নিজের ঘরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে একটা বাড়ির কার্নিসে একটা চড়ুই পাখী লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। কুমার সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

রেখা দরজায় এসে দাঁড়ায়।

রেখা : আপনি অশৌচ করছেন না ?

কুমার : না। আমি ওসব মানি না।

রেখা কোনও কথা বলে না—

কুমার : আমি নকুলকে একদিন ধরেছিলাম।

রেখা চমকে কুমারের দিকে তাকায়—

কুমার : ও আমাকে একদিন মারতে এসেছিলো, আমি পালিয়ে এসেছি।

রেখা : আপনি ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। ছেড়ে দিন। আপনার দোকান বন্ধ আছে ?

কুমার : না। ওটা বিক্রি হয়ে গেছে।

রেখা চুপ করে থাকে—

রেখা : আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে ?

কুমার : কষ্ট কেমন করে বুঝলে ?

রেখা : বোঝা যায়।

কুমার চুপ করে থাকে—

কুমার : বসবে না ?

রেখা : না। আর একদিন আসবো।

কুমার : কবে ?

রেখা : কাল। হয়ত কালই আসবো।

কুমার : হ্যাঁ। এসো।

রেখা দরজার কাছ থেকে সরে যায়। সদর দরজায় ওর চলে যাওয়ার শব্দ শোনে কুমার। কুমার বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দৃশ্য ৭৯

নয়নতারার ঘর। কুমার দরজায় এসে দাঁড়ায়। নয়নতারার বিছানার দিকে চোখ পড়ে। টান্ টান্ করে পাতা বিছানার চাদরের ওপর অনেকগুলো শিউলি ফুল ছড়ানো।

টেবিলের ওপর একটা ধূপ জ্বলছে। ধোঁয়াটা ঘরের মধ্যে মলিন ছায়ার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিউলি ফুল ছড়ানো ঐ বিছানার দিকে কুমার তাকিয়ে থাকে। আর ঐ বিছানা সমুদ্রের মতো কুমারের চোখে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠতে থাকে। নরনারীর সেই ছবিটার সামনে ধূপের ধোঁয়া মলিন ছায়ার মত তরঙ্গায়িত হয়। হারমোনিয়ামের থিয়েটারের একটা থীম মিউজিকের সঙ্গে এণ্ড টাইটেল রোল আপ্ করে।

(শেষ টাইটেল : বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আগত অনাগত মুহূর্তগুলোর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।)

স মা প্ত

অপ্রকাশিত চিঠিপত্র
সুভাষচন্দ্র বসু–জেকব মালিক

GANPATI GREENFIELDS PVT. LIMITED

Unpublished Letter of Netaji Subhas to Jacob Malik, Soviet Ambassador to Japan

A Note

This is an unpublished letter supposed to have been written by Netaji Subhas in 1944 to the Soviet Ambassador in Tokyo, which was retrieved recently by Smt. Purabi Roy and colleagues, Research Workers from Asiatic Society, Calcutta, on Netaji from the K.G. B. Files at Moscow.

The KGB file letter was in Russian, (not the original in English as written by Subhas), and the present version is a translation into English from the Russian Copy.

Here lies the rub.

During and at the end of the global war, Intelligence Depts of various countries were at each others throats, with all sorts of information-Disinformation-Counter Information-Bluff-Lies which were never dependable.

While publishing this letter as a Document on Netaji, we wish to warm readers that the same may be a fabrication of Intelligence Depts. Its authenticity is doubtful.

—Editor

Arzi Hukumat Azad Hind
Imperial Hotel, Tokyo

Monday, 20th November, 1944

His Excellency The Soviet Ambassador,
Tokyo.

Your Excellency,

At present I am in Tokyo. I would like to use this opportune moment to pay a visit to your Excellency. I am seeking help of the Soviet Government through you to fulfill the task of our struggle to free India.

I cannot deny the fact that at that moment we are closely associated with the Axis power for a common struggle against the Anglo-American bloc. I am glad to inform you that the Axis power is now having a clear idea about the main problems of India and they have accorded

recognition to the AZAD HIND STATE (FREE INDIA), for which we are thankful to them. Besides, Japan's relations with the Soviet Union are strictly neutral; even the German Government can understand fully well and evaluate the fact that we Indians are only fighting against U. K. and the U. S. A. The German Government has also understood and appreciated the fact that we are not interested in going against Soviet Russia. Certainly, the activities of my organization in Europe have generated an exclusive impression that we are only against the Anglo-American bloc and not against Soviet Russia. This was the understanding for co-operation between the Axis power and our organization in Europe. In this connection, we have a clear policy and approval from the German Government as well as the fascist Italian Government.

I know that now there is an alliance between the Soviet Union and the U. K. and the U. S. A. But I feel and I have clear perception about the prevailing international situation that if the Soviet Union extends its help to our freedom struggle, it will certainly not stand in your way. I am very much thankful to your Government and I do remember the help which was extended by the Soviet Government after I had left India in 1941. I conveyed my thanks to His Excellency Minister for Foreign Affairs, Molotov, in my letter I wrote from Berlin. I trust His Excellency certainly received it.

I have always been encouraged by the fact that Lenin in his life time always, from the core of his heart, extended support to the countries which were struggling against colonial rule. So far as I understand, the Soviet attitude towards the problem of the oppressed nations like India has not changed after his death.

As to my party, Forward Bloc, I can say that when the Soviet foreign policy had been condemned by almost all the political parties of India in 1939-40, ours was the only party which had openly supported the Soviet foreign policy in relation to Germany and Finland. Besides, we constitute the left-wing movement in India with a progressive programme to solve our socio-economic problems. Further, our party is the only party in India which had been relentlessly struggling in alliance with a few other revolutionary groups against British Imperialism.

My earnest desire is to pay a visit to your Excellency and find out how your Government can help us in achieving success of our struggle for freedom. The nature of help which the Soviet Government can extend to us depends on the decision of the Soviet Government in

relation to the present situation of war. I would also like to emphasize that the Soviet Government after India's liberation would have to recognize the AZAD HIND GOVERNMENT without strings.

With profound regard for you, I assure your Excellency that our relationship will last forever. I now await an early reply from you.

—*Subhas Chandra Bose*

Courtesy The Asiatic Society, Calcutta.

Professor Purabi Roy, who visited Russia recently as a member of a team on behalf of the Asiatic Society, traced the Russian translation of Subhas's letter in the Russian archives. The above version is a re-translation from Russian.

We are indebted to Professor Amitabha Chandra for a copy of this letter.

We are also grateful to Prof. Sunitikumar Ghosh, a well-known Marxist Scholar who's research work on Netaji is perhaps the best in dislodging the mask of so called the then national leaders.

—Editor

'Desha Nayak' Subhas—
'I welcome you to be the leader of this country'

Rabindranath Tagore

As Bengal's poet I invite you on Bengal's behalf to accept the leadership of our country. God the Preserver, says the Gita, incarnates Himself whenever need arises to protect the meek and chastise the wicked. Enmeshed in the evils of misfortune, out of the very throes of the body politic is the leader born. Trodden down under the heel of foreign domination, her energies dissipated by internal divisions, Bengal's destiny is today darkened by ever deepening clouds.

Divided against ourselves we are weak at home while the adverse forces mobilise outside Bengal's frontiers. Our economy, our method of work, our moral tone are woefully inadequate. Our politics is like a boat in which the oars do not keep time with the helm. When the mind is ridden by an evil fate it acts like virus in a worn-out body. That is how we become divided against ourselves, we throw out our well-wishers, make strangers of friends, insult those who are worthy of respect, and, in this way weaken our own ranks from the rear.

Just at the moment when it devolves upon each one of us to raise by dint of our own worth the lofty pinnacle of our national glory and place it high before the eyes of the whole world, some malicious self-seekers there are, who in their suicidal stupidity dig holes of calumny into the very foundation of the structure. Maligning one another, they serve only to strengthen the insolence of the enemy.

When there is a wound from outside, the festering sore rouses all the venom that lie dormant inside the body and precipitates a sepsis. Worn out by this conspiracy of between the forces of disease inside and outside the body, our mind becomes inert and cannot fully exert itself for its immunity. At such times of crisis what we need most is the protecting right arm of self-reliant strong men, who can, with impunity, overside the obstacle of an adverse fate that may lie on the road of our triumphant march.

Subhaschandra, I have watched you from afar when you first began your penance for the country. In that dawn of your *sadhana*, in the

uncertain twilight, I was assailed by misgivings about you. I have felt hesitant to place my full faith in you. Your blunders, your weaknesses have caused me pain. Today you are revealed in the clear light of the midday sun— there is no room for doubt to darken the sky. In our lifetime you have absorbed many an experience. Your adherence to duty is a positive proof of your vitality and strength. Incarceration banishment, incurable disease— all these have sorely tested this strength. They were powerless to overcome you. Rather have broadened your mind and you have emerged out of these trials with a vision that reaches beyond the bounds of the country and encompasses— the extensive grounds of world history. You have made allies out of your troubles and obstacles have proved to be so many steps in the ladder of your success. That you could do so, was owing to your refusal to accept defeat. We, in Bengal, need to emulate this strength of character more than anything else.

For various reasons Bengal has been denied of many opportunities by her own people and by those who are strangers to the land. We desire that by her own courage and initiative Bengal should forge blessings out of this course of fate : Let her determination not to accept apparent defeat, lead Bengal to her triumph.

As I took around, I see the hands of a cruel fate working in every walk of life in Bengal. In the face of this unkind destiny, we should bravely affirm that we have within our own character that ingredient wherewith to build our fort of resistance. We can save ourselves if only we can break open the lock and deliver this source of strength that lies within. Astride the ferocious shark of evil times we shall have to cross the sea of nightmare. It is with the hope that you will uphold our courages that I now call upon you to lead us in the path of this dare-devil adventure. Howsoever difficult be the goal, if we but persevere in our united effort, we shall reach the end.

It is here that the crux of the problem lies. But why should we use the conditional if, why should we give way to misgivings? Unite we must if the nation is to survive. It is up to you to rouse the determination, throughout the length and breadth of the country, that Bengal will not die humiliated by fate, that Bengal will raise its proud head above the buffetings of misfortune. You are the spirit of tireless youth, you have in your nature that unflinching courage which can uphold hope in the face of an impending crisis. In the faith that you will implant in the soil of Bengal that banner of death-triumphing hope, that flag of fearless freedom, I welcome you to be the leader of the country.

Let Bengal's millions speak in one voice, in firm and clear accents that the seat of leadership is ready for you. May you resolve the spirit of mutual mistrust in the Bengalee, may his diffidence be over. May your example put meanness and niggardly conduct to ignominy and shame. Let Bengal, through upholding and maintaining her self-respect in victory and again in defeat, uphold and maintain the prestige of her accredited leader.

The Bengalee is a logician born. He delights in hair-splitting arguments. Right from the commencement of a project to its very end, he finds a peculiar pleasure in sitting in opposition and refuting the other man's viewpoint in the pride of his sterile intellect. He is more interested in picking holes and finding faults than in taking a comprehensive view of things. He forgets that his controversies lead nowhere, that they are the unproductive luxuriance of an idle mind. The need of the day is not arguments but a spontaneous will to do things. Let the composite will of the nation that appoints you to be the leader, mould you to the great responsibility that devolves upon such leadership. May the whole nation find its self-expression in your person.

I have seen during the Bengal partition movement how that will expressed itself in its resistance to ward off the impending blow of the scimitar which sought to sever the body politic of Bengal. Bengal rose like one man against the rightly power of the Crown. Her people did not then sit idle and deliberate in the fashion of wiseacres as to whether it was possible to oppose and defeat (circumvent) the design of the foreign power. What she did then was to will with all her heart.

In the years that followed I have seen that very desire burning strong and bright in the heart of the younger generation, they were born with the fire. But alas! the fire that should have lit the lamps and given us light was the fire used to burn and destroy. They paid dearly for the mistake. They themselves were consumed by the flames and after the conflagration was over, there remained no light to guide the benighted. But misguided though it was, the heroism that they showed even in the tragic futility of their blunder, was something which I did not see anywhere in India at the time. The series of sacrifices that they made, the way they braved misfortunes one after another, the precious lives that they lay down at the altar of the country— these have all been burnt into the ashes of futility. But, they have, nevertheless, despite the immediate results, proved for all time to come that invincible will-power of Bengal.

The agents of law and order might well try to darken these chapters of history punctuated by the heart-rending blunders of the restless youth. But, try as they may, they can never black out the radiance inherent in the spirit of youth.

True, we have seen many signs of weakness of our country. Our hope lies deep in the recesses of her being where her sources of secret strength awaits the future hour. It is up to you to see that this hope materialises and comes to fruition all that is best in Bengalee character— his pleasant and affectionate nature, his imagination, his penetrating vision, his talent in creative arts, the power he has of absorbing the gifts of an alien culture— all these should no longer be allowed to remain abstractions, but should be harnessed for actual work. It is for you to create a new springtime of sprouting hopes. You are to deliver the country from all that is worn out and old, all that is steeped in darkness.

You may say that the work of such magnitude is not for one man to undertake single-handed. That is true. It is also a fact that this work cannot be done by men working in separate units. Nothing will be impossible to achieve if the whole country could come together drawn by the centripetal force of a towering personality. Those who are real and natural leaders of the country, never stand by themselves. They belong to all men of all times. They stand on the crest of the present and are the very first to bow in obeisance to the first purple rays that usher the dawning future. Keeping that in mind I invite you and through you the whole nation to give a lead to the country.

Let no one misapprehend that in my provincial pride I want to separate Bengal from the rest of India or that I want to place anybody on a seat of rivalry with that Mahatma who has brought in a new age in the realm of politics and has thus made India's name famous in the comity of nations. My appeal is being made today because I want Bengal fully and substantially to co-operate with India and because I want this valuable co-operation to bear real fruit. I do not wish that a powerless and weak Bengal should lag behind empty-handed while the other provinces bring their own offerings to the Motherland. Through your *sadhana* let Bengal's self-dedication be true and noble, let her lamps of offering shine with her own true light.

Many years ago while addressing another meeting I had the occasion to convey my message of welcome to the leader of Bengal, yet to be. After so many years I take the occasion to welcome him in the very person. I am no longer capable, nor do I have the strength necessary

to co-operate, body and soul, with the leader in doing actual field work. As one of the very last duties left to me I may only invoke the will of the country and may pray that will might actuate and strengthen your will. And then I shall bless you and take your leave to go, knowing full well that you have made your country's sorrows your own and that the deliverance of the country comes apace carrying along with it your ultimate reward and recognition.

Background Historical note on this important article suppressed during the life-time of Tagore—Gandhi—Nehru.

This is the original English version of Tagore, written in January 1939 and not just a translation of the Bengali speech at 'Amra-Kunj' Santiniketan on 21.1.1939 felicitating Subhas.

The Bengali version was later included in his Bengali book of Essays 'Kalantar' (8th Edn. 1993) with title 'Desha Nayak'.

The above article is reproduced from *SUNDAY OBSERVER*, Bombay, issue dated 13.8.1995, which published the article with following COMMENTS.

"Fifty-six years ago Rabindranath Tagore hailed Subhas Chandra Bose, who was expelled as president of the Congress party, as Desha Nayak. That speech has never received its due in history, probably after Gurudev was persuaded to move away from Netaji by the Gandhi-Nehru combine. To mark the 48th anniversary of Independence, we publish that revealing speech, retrieved by Shalil Ghosh.

On January 21, 1939, Shantiniketan played host to a function wherein Subhas Chandra Bose was felicitated, lauded in a stirring speech by Rabindranath Tagore and given the title Desha Nayak.

Tagore, further, informed Bose that on Febuary 4, his dance drama Chandalika was to be staged at Calcutta and that he planned a public felicitation for Bose on that occasion.

On February 27, Tagore addressed a missive to Bose— this one informing the latter that while Chandalika would be performed on schedule, Tagore himself was cancelling his proposed Calcutta trip on grounds of ill health and that, therefore, the planned felicitation would also not take place.

Interestingly, Tagore did attend the first performance of his play. Only the planned felicitation did not materialise.

Why the volte face?

Why was it that Tagore's speech— arguably one of his best ever— was kept out of circulation until after his death?

Flashback : Bose had, shortly before the events related above, defeated Pattabhi Sitaramaiah in an election for the post of president of the Indian National Congress for the year 1939-1940. And Sitaramaiah had been hand-picked to oppose Bose, then bidding for his second term in office, by no less than Mohandas Karamchand Gandhi.

Thus, Bose's victory was seen as Gandhi's defeat. Bose was soon expelled from the Congress for 'anti-party activities'.

To put matters in perspective, we refer then to a visit made by Sudhir Ghosh, a well-known emissary of Gandhi, to Shantiniketan. Also to a visit paid by Jawaharlal Nehru to the same venue, on January 28, 1939.

Some historians believe that neither Gandhi nor Nehru were comfortable with the thought that someone of Tagore's stature was hailing Bose as Desha Nayak. And that Tagore, who was informed through emissaries about the Nehru-Gandhi mindset, finally succumbed to the pressure and called off the felicitation."

History's Legend—
Mahanayak Subhas Chandra

By Shalil Ghosh

Netaji Subhas is the most tragic figure of a world Statesman who gave his all at the prime age of 48 only, to end white Imperialism and Colonialism from this earth. His brave and untiring deeds on an international arena completely ignored by his ungrateful people. Efforts were made all the time to erase his contribution to our freedom from the pages of our history by certain people in power with selfish motives.

But our people, our 'Aam-Janata' and posterity did not allow such mischief to go on. Netaji today stands in full glory in the hearts of every Indian.

But there is no Netaji Subhas "Wave" or "Deification" anywhere in India today. Whatever little we find it is a mild and idiotic attempt by some so-called leaders of political parties, to build up their own image and be in the limelight somehow by using his name, through some sorts of futile controversies, when they can blame the Govt. in power, shirking their own responsibilities, with gimmicks.

At this moment Netaji Subhas is the only Indian Statesman & Leader of India, who is adored by the common man all over India at all levels and strata breaking the barriers of State, Language, Religion, Caste, etc. This a very unique adulation for him and historian should try to find out—Why?

A very interesting point about Netaji's unique "Leadership", not to be found anywhere and a matter of serious research for "Historians and Scholars" as to how, without any "background political authority" as such, he could be recognised as a statesman, a leader who shook the "Imperialists and Colonialists" and acknowledged as our country's Representative by the heads of various Govts. of Europe and Asia, in the Thirties and Forties.

It appears that persons close to him have presented more as "Chief Executive of Calcutta Corporation" than as a Statesman of international stature.

We Indian add some adjective to our great people, such as "Desha Bandhu", "Deshapran", "Lokmanya", "Gurudev", "Mahatma", "Babasaheb", "Kakasaheb". We have such fine tradition in every state to respect and love our Greats.

These are not "Deification"—"Icon" "Servility" or even "Sycophancy", which these persons do not understand. There is no "Hysteria" anywhere at all in India about Netaji today.

'Netaji' was used for the first time in Germany (1941-43), when Subhas was organising Indian Prisoners of War of the British Indian Army into "Azad Hind Fouz". The Indian soldiers who were inspired by Subhas, instead of referring to him by his name started using 'Netaji'.— It was Rabindranath in 1939 gave the epithet "Desha-Nayaka" for Subhas. Netaji never believed in any 'Personality Cult". This is the history.

It appears some people, especially there in Forward Bloc, Calcutta are interested in keeping the controversy regarding Subhas Bose by quoting reports from foreign sources such as KGB— CIA— British Intelligence etc. Two enquiry Commissions as well as versions given by Habibur Rahman and the Japanese Government are not accepted by them. If some of us do not accept these versions they may take initiative and prove that they are right in what they say.

Or else, there are several versions of his death or his still living. (Some say British Intelligence managed the accident. Some says Japs were responsible. Some say he was seen in Russia— etc. etc. etc. etc. etc.). Let us believe all.

Netaji cannot be confined to INA, Netaji Research Bureau Cal, Forward Block, his family members or even Congress Party or even any Govt. in Power. He belongs to all. It is better we accept now that Netaji Subhas has been turned by destiny and history into a liberator of the world from imperialism & colonialism of the West.

A Hero from the Pages of our History

To me, Netaji Subhas was the incarnation of Shivaji Maharaj in the 20th Century and the greatest 'Hero' of our time. Shivaji Maharaj freed us from the rule of the Mughal Emperors. Netaji Subhas with his global struggle and fight for only 25 years, (between 1920 and 1945), out of that too 10 years in jail or externed from India in exile, seriously ill, was a factor to bring the end of the British Empire, not only in India, but all over the world. For this he sacrificed everything in life at the prime age of 48.

Britishers with their ruthlessness could very easily suppress our various Independence movements inside India right from the Sepoy Mutiny 1857 to the Terrorist Movements at the earlier part of this Century, the non-co-operation Movement of the Thirties, or even the 'Quit India' movement of 1942 with the help of Indian Police and the Indian Army, loyal to the British Raj of those days and their "Indian Under-dogs."

Netaji, through his "Indian National Army" movement during the second world war (between 1939-45), could rouse the sentiments of this 'Mercenary Indian Army' against the British Raj and made them conscious and changed their loyalty to our Country and the Indian people. And this is what made the British to go. But there are still some people who dare write a letter to the 'Times of India', that the brave fighters of Indian Freedom, the I.N.A. soldiers (Ex-British Army), joined Subhas out of cowardice to avoid torture as "Prisoners of War" under the brutal Japanese.

There are plenty of documentary evidences from British sources that they could no longer depend on the loyalty of the Indian Army any more. It would be impossible for them to rule such a vast country and it was time to quit and submit to the necessity of changing times.

Indian Army was not only utilised by the British to safeguard their Indian interests, but also engaged them in other subjugated countries to rule them as and when required.

The "Strategy" of the Britishers while quitting India was like— they thought "Yes— we shall give Independence to India. But before we go, we shall teach such a lesson to those old decrepit Indian leaders and its treacherous people, that they will suffer for endless time the ill consequences of such freedom by making the country weak for all times to come." And we Indian willingly fell victim to this 'British Strategy'. This made us permanently weak and a laughing stock before the comity of the nations for all times to come.

Netaji was always against the Britishers and the "Two Nation Theory". Through his broadcasts from Germany and South-east Asia, he always warned about creating differences between Indians who were living harmoniously over the centuries.

Netaji's global struggle for the Independence of India, right from his student days in England (1920) to his death (1945) has been belittled in Independent India, even suppressed for various political and selfish motives and reasons by British Imperialists, our Govts. in power and the Indian supporters of the Raj.

The erstwhile British Imperialists, have changed their attitude towards Subhas and are rewriting their previous "TRAITOR" image to a "Noble Selfless Fighter for Freedom", and paying respects to him. However many of old Indian supporters of the British Raj are still at their Anti-Netaji stance.

As a student of history, I am sure that they will lose in this game again, if they do not change.

When Netaji's Indian National Army ill-equipped and under great adverse circumstances, was advancing through the jungle-terrains of Arakan towards the eastern most borders of India— Nehru uttered in a mock-heroic way "If Subhas comes with his army to India with Japanese help, I shall come on the field to fight his army". What an announcement by him to fight his own Freedom fighters while trying to make some adjustments and understanding with Imperialist Rulers. With Legal luminaries like Bhulabhai Desai & others, Jawaharlal, a briefless barrister, wore the Black Advocate's gown to defend the three I. N. A. Heroes at Red Fort, after whole India went into a turmoil about the brave deeds of I. N. A.

"Jaihind" the secular greeting for Indians of all faith, introduced by Netaji and his assistant Abid Hussain in 1941 in Germany was turned into a political slogan by Jawaharlal Nehru without any understanding behind the great unifying patriotic idea. We Indians of different faith have our own greetings, Netaji wanted a greeting which could be uttered by any Indian of any faith. Nehru turned it into a shouting competition at the end of his political speeches before a maidan crowd.

Similarly, Netaji was the first Indian leader who addressed Mahatmaji as the "Father of the Nation" through his broadcasts from South-East Asia. Gandhiji reciprocated in admiration for his activities and told "Subhas was a Prince of Patriots", although these two great leaders had different views about the methods of our Independence struggle. Both Sacrificed their lives for the country.

But, alas, even today one secret circular, still in force, issued by the Government of India during Nehru's regime that Netaji's portraits, pictures should never be displayed in any Government offices and Defence Establishments. This is a return we pay to a great Freedom Fighter, who sacrificed everything in life to let the various countries of the world to be free from Imperialists bondage and Colonial exploitation.

The people in political power in our Government made all efforts to eradicate the name and contribution of Netaji from our history,

including the "Indian Supporters of the British" and the Communists of India. But he was broad-minded, with no rancour to his adversaries, when he named I. N. A. Brigades as 'Gandhi', and 'Nehru' and 'Azad'.

At one time, what an anti-propaganda was made against Netaji, as a 'Fascist', 'Quisling', 'TOJO'S Dog', just because he wanted help from the "ENEMIES OF OUR ENEMY", that is Germany-Italy-Japan. Today, the Fascist Leaders of the three countries are hated all over the world, but Netaji is still loved and respected everywhere, for his honesty of purpose, patriotism, dedication and his genuine love for common people of India and the World. Why?

Now, B. B. C. has made a Documentary on Netaji's Life, where they have answered this question for carrying out a "Prayaschitta" (Atonement) for all the lies spread earlier by B. B. C. about him. It was broadcast on 13.8.95, a different favourable image of Netaji, in their London Channel II.

At the end, I would like to mention four unique leadership qualities of Netaji Subhas, not found in others.

First. He never believed in manipulative politics and maneuvering tactics in his political activities like other leaders of the day. He never wanted to maneuver any deals. He was straightforward, even to the extent of being naive.

Secondly, he was perhaps the only leader of India, who was 100% non-compromising to have anything to do with British Imperialism, when others were soft, wanted to curry favours, especially the Congressmen with dual and selfish motives.

Hence, Subhas was always ostracised and incarcerated by the British Govt. They could never tolerate his courage to kick the 'HEAVEN BORN'S JOB" of those days, the I. C. S. and insult the Raj.

Third. Netaji was the only leader who sincerely believed that if Indian leaders could inculcate "Love for one's Own country" in our people, we could rise above all other allegiances for Religions, Faith, Castes, Creeds, Sects, Languages, etc. etc.

He proved this in his I. N. A. & Azad Hind Govt. experiments— but— alas— we failed him in Independent India in this 'Love for our own Country', especially the fundamentalists of Muslim, Hindu-Sikh-Christians and other communities.

Lastly. Another very important point about the towering personality of Netaji has been overlooked by our Historians till now.

How a personality in his individual capacity without any infrastructural

support from his countrymen or even from his political party at home, was recognised as the Representative of his country and was treated as such by the Heads of various Governments of Europe and Asia? During the thirties till his death, in Europe and Asia, he went on with his propaganda for support of Indian Independence Movement with various countries, who treated Netaji in the same manner as if he was the real spokesman for his country and representing the same. We find no other leader in World History, as we find Netaji in this particular role without any background support from his countrymen.

I. N. A. Inspired R. I. N. Revolt (18.2.1946 to 23.2.1946) in Bombay

We shall start this short note on RIN Revolt with two significant quotations on Netaji Subhas and his symbolic experiment with INA Movement. The reason for this will be evident in due course.

First, I shall quote what Mr. Ian Stephens, a British Editor of the British-owned Calcutta English Daily "The Statesman" said in 1945 about Netaji :

"If Subhas is dropped on the Calcutta Maidan Today, whole British Empire will collapse Immediately."

The second quotation is actually from Acharya J. B. Kripalani at one time very powerful General Secretary of Congress and a strong adversary of Subhas.

When Subhas came to preside over the Congress Session for the second time in 1939, very seriously ill, on a stretcher, Kripalanijee remarked, "He is doing Natak with Fake Illness."

The same Kripalanijee, when out of the Congress much later with serious differences with Pandit Nehru, uttered about Subhas :

"What Congress could not achieve in 50 years, Netaji Subhas achieved in five years."

I think these two quotations on Netaji with historic RIN Revolt are the best and correct assessment of Netaji, suppressed all the time by our Historians and people in power and the 'Indian Underdogs of the British Raj'.

The Greatest achievement of Netaji, we should never forget that he was instrumental to change the loyalty of "British Indian Army" from the British Raj to their "Motherland".

And that is historically evident from his Azad Hind Fauz in Germany, Indian National Army in South-East Asia and Defence Personnel of those days like our Balai Chandra Dutt & Kailash Narain

Tickoo and others of R. I. N., Air Force Personnel of Jabalpur, Army Personnel at Patna and many other Defence Establishments all over India.

It is very strange to find in posterity, when Subhas changed the loyalty of the Defence Forces (even including the Gurkhas of Indian Army) to Our Motherland, our leaders of those days tried their best to maintain their loyalty to the British Raj.

We can cite examples galore from various statements of our top Leaders of those days, how they co-operated with the Raj as their close agents.

All these events were very successfully suppressed from the general public, 'AAM-JANATA' and our History by the Raj and later by our own Govts. in power.

Why? A big question.

As a serious student of the history of Indian Freedom Movement during the last 200 years and as a keen first hand observer from the side line of the R. I. N. Revolt, here is the analysis as observed by me.

If this Naval Movement got some support (even just verbal) from our the-then National Leaders like Mahatma Gandhi, Mohd. Ali Jinnah, Pandit Nehru, Sardar Vallavbhai, even the so-called fire-brand Aruna Asaf Ali, we would have got our Independence one year earlier in 1946 only.

Britishers were ready to Quit immediately as they were afraid of loss of life of white people in India. At the end of the prolonged war they had no strength to fight any more on their own.

What to give verbal support, our Leaders denigrated the participants in most mock-heroic manner and morally ruined their brave spirit. Instead of some good words for their courage in support of the general freedom struggle, they adversely commented all the time in a very demoralising manner, in the name of discipline, as if they had any discipline over their tongues.

Britishers got a lease of life for over another one year to carry out their greatest mischief with the help of the Indian Underdogs for the British Raj to implement their imperialist strategy to weaken our country for all time to come and give Independence by dividing our country, which is the root cause of all present day evils we face.

Some of you may remember the original year for Independence was settled for 1948. But Mountbatten was so afraid to stay here longer that he advanced the date to 15.8.1947.

Later, Lord Mountbatten became 'Pandit Mountbatten' to Indians

at Delhi, as we all know. Nehru made him to stay longer after Independence— and that is another story, another reason.

And what an Independence! Millions died in bloodshed, communal riots, between all communities during 1946-47 and till now. And we call it Independence through Non-violent Movement. What a hypocracy!

If Naval Revolt had got some support form our National Leaders, the whole lot of Wavells, Auchinlecks, Rattrays would have ran out of India lock-stock and barrel immediately.

We willingly co-operated with the Britishers in their nefarious game of the Raj, and got "Dominion Status" at that time.

After the R. I. N. Revolt, Britishers got afraid of their own creation the "British Indian Army". They could no longer depend on their loyalty. How they used their "Indian Army" in their various Colonial Domains to suppress any freedom movement is a matter for Historians to study.

At the peak period "British Indian Army" was 25 lakhs strong, the biggest volunteer army in the world without any conscription.

A loud protest by Balaichandra Dutt, i. e. BC (as he is known to his friends) with "Quit India" "Jai Hind" on the walls of HMIS TALWAR, put him into solitary cell under arrest.

So nervous was the Raj.

This Loud protest within 10/15 days turned into big revolt and then Mutiny, which later turned into mass civilian upsurge in Bombay, with strikes and curfew. Our leader felt— "Freedom-fighting is our affair— why you inexperienced novices of Defence Dept. meddle in this affair of ours. You better surrender unconditionally right now."

This has never happened anywhere in the world.

Of course, by that time, clever British Imperialists had a tacit understanding with Nehru about their game-plan and we willingly submitted.

Nehru felt— "What a bother these RIN fellows revolting. When we get power, what will be our position if we support I. N. A. or RIN now?"

I think it is high time now we discuss and analyse these events in a frank manner with correct historical perspective.

I met Balai & Tickoo in the ship Talwar. Balai was happy-go lucky, damn-care, dare-devil of a young man full of idealism and enthusiasm.

He was selected for "Combined Operations" Division of the South East Asia Command under Lord Mountbatten, the-then Chief. This was very tough Division, meant for toughest jobs, sabotage, espionage,

surveillance in enemy territories. They were dropped through speedboats from some ships in a lone coast line, with some Ration Tins and Medicines etc. After completion of the job, they were brought back to the ship.

Such jobs suited BC to the Tee. But while in this job he came to know also about the activities of Subhas in South-East Asia which fired his imagination to do something for his motherland.

He returned to "Talwar" and the rest is History.

Tickoo, a handsome young lad of 18 fit to be a hero in our Movie Industry was a misfit in Navy. He actually joined Movie Industry later.

But Tickoo showed exemplary courage on 17th/18th Feb. 1946, when B. C. Dutt was in solitary confinement took over the helm of the revolt with a few colleagues.

His appeal to Castle Barrack Ratings, all very excited, not to tamper with the Magazine— huge concentration of naval ammunition, armaments, saved Bombay from ultimate devastation, even greater than the April 1944 Dock Explosion.

Our Leaders with the British Raj celebrated in a mock-heroic way their victory and surrender of RIN Ratings on 23.2.1946, one of the glorious and saddest chapter of our History.

And now we have evidences from the British Intelligence Files, how these imperialists changed their mind and opinion about Netaji in the early days of the year 1945.

British authorities wanted to make some understanding and compromise with Netaji and wanted him to be involved in the transfer of power.

They felt Congress and Muslim League are not dependable and reliable enough and the British image will be spoilt for all times to come in History and posterity, after Independence through partition, as they are experiencing now.

Britishers hatched a plan in Bombay with the help of their intelligence dept. to contact Netaji at Singapore through a Parsi Gentleman who knew Subhas well.

But it was too late. Netaji could not be contacted. He eventually lost his life on 18.8.1945.

This is another story. More in detail some other time.

Writer is the convener of Netaji Centenary Celebration Committee, Maharashtra and was wireless operator in R. I. N. till 1946. We gratefully acknowledge his help. —Editor

With Best Compliments From

GANPATI GREENFIELDS PVT. LIMITED

6/7A, A. J. C. BOSE ROAD

CALCUTTA - 700 017

BIVAV Reg. No 30017/76
Price : Rs 20.00 Special Winter issue 67th issue
Vol. 18 No 4 October—December 1996
Published in Feb. 1997
INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO ISSN 0970-1885

চিরন্তন সাহিত্যের সেরা প্রকাশনায় সংসদ

বঙ্কিম রচনাবলী-১ (সমগ্র উপন্যাস)	৭০.০০
বঙ্কিম রচনাবলী-১ (সমগ্র প্রবন্ধ ও রচনা)	৮০.০০
বঙ্কিম রচনাবলী-৩ (সমগ্র ইংরেজি রচনা)	৫০.০০
মধুসূদন রচনাবলী	১২৫.০০
রমেশ রচনাবলী	৫০.০০
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী-১	৮৫.০০
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী-২	১৫০.০০
দিনবন্ধু রচনাবলী	৫০. ০০
গিরিশ রচনাবলী-১	৭৫.০০
গিরিশ রচনাবলী-২	৭৫.০০
গিরিশ রচনাবলী-৩	৮০.০০
গিরিশ রচনাবলী-৪	১৩০.০০
গিরিশ রচনাবলী-৫	৫০.০০
সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ	১২৫.০০
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ-১	১০০.০০
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ-২	৮০.০০
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ-৩	১০০.০০

□ সাহিত্য সংসদ □

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড □ কলকাতা ৭০০ ০০৯